Registered No. 65

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫৫ ভাগ ১৭শ সংখ্যা।	১লা পৌষ, শুক্রবার ১৩৩৯, ১৮৫৪ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ১০৩ 16th December, 1932.	প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে প্রেমস্বরূপ পিতা, পথশ্রমে শ্রান্ত ক্লান্ত, জীবন-সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত, নানারূপে বিধ্বস্ত ও পরাজিত, বিবিধ দুঃখ ক্লেশে জর্জ্জরিত, অবসন্ন আমাদিগকে আনন্দ শান্তি বিশ্রাম, আশা উৎসাহ বল দিবার জন্য, তুমি তোমার অসীম প্রেম ও স্নেহে নিত্যই কাছে ডাকিতেছ। কিন্তু আমরা অনেক সময়ই, তোমার সেই স্নেহমধুর আহ্বান শুনি না, সেদিকে কর্ণপাত না করিয়া আপনার ভাবে, আপনার পথেই চলি, বৃথা কেবল দুঃখ ক্লেশ ব্যর্থতাই আনয়ন করি। তথাপি তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ কর না, অসীম ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত নানারূপে নানাভাবে আহ্বান করিতে থাক, তোমার নিকট ফিরাইয়া আনিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা কর—মাঝে মাঝে উৎসবাদির আয়োজন কর। বৎসরান্তে তোমার সেই উৎসবের আহ্বান নানা কোলাহলের মধ্যেও আমাদের হৃদয়-দ্বারে আসিয়া পৌছিয়াছে, প্রাণে নূতন আশার সঞ্চার করিতেছে। হে হৃদয়দর্শী দেবতা, তুমি জান, আমরা যে সকলেই তোমার সে আহ্বান খুব সুস্পষ্টরূপে শুনিয়া তাহার জন্য সমগ্র মন প্রাণের সহিত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছি, তাহা ত কিছুতেই বলিতে পারি না,—অতি ক্ষীণ-ভাবেই কেহ কেহ একটু শুনিতে আরম্ভ করিয়াছি; এখন পর্য্যন্ত তাহার জন্য সেরূপ ব্যাকুল হইয়াও উঠি নাই, যথোচিত আয়োজনেও প্রবৃত্ত হই নাই। অনেকে এখনও একপ্রকার বধির ও উদাসীনই রহিয়াছি। হে করুণাময় পিতা, তুমি কৃপা করিয়া সকলকে তোমার সে মধুর আহ্বান ভাল করিয়া শুনিবার জন্য উৎকর্ণ করিয়া তোল, অপর সমস্ত অসার কোলাহল হইতে আমাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত কর। তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের সকল জীবনে ও সমাজে সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউক।

চয়ন

আসুন, আমরা যেন আর এই পৃথিবীতে (পার্থিব রাজ্যে) অবস্থিতি করিতে না থাকি; কেননা, যিনি সেরূপ ইচ্ছা করেন, তাহার পক্ষে এই মুহূর্ত্তেই পৃথিবীতে না থাকা সম্ভবপর। যেহেতু, পৃথিবীতে থাকা আর না থাকা আপনার ইচ্ছা (পছন্দ) ও নৈতিক প্রকৃতির ফল। যথা, ঈশ্বর স্বর্গে বাস করেন বলিয়া বলা হয়। কেন? তিনি স্থানে আবদ্ধ (ঈশ্বর না করুন) আছেন, অথবা পৃথিবীকে তাঁহার বর্ত্তমানতা হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছেন বলিয়া নয়।...কাজেই, আমরাও যদি ঈশ্বরের নিকট বাস করি, তবে আমরা স্বর্গেই অবস্থিতি করি। কারণ, আমি যখন স্বর্গের প্রভুকে দর্শন করি, যখন আমি নিজেই স্বর্গ হইয়া যাই, তখন আমি স্বর্গের কোন্ তোয়াক্কা রাখি?... তবে, আসুন, আমরা আমাদের আত্মাকে স্বর্গে পরিণত করি।

স্বর্গ স্বভাবতঃ উজ্জ্বল; কেন না ঝড়ের মধ্যেও উহা কালো হয় না—যেহেতু উহা নিজে আপনার রূপ পরিবর্ত্তন করে না, পরন্তু মেঘসকল একত্রিত হয় এবং উহাকে ঢাকিয়া ফেলে। স্বর্গের সূর্য্য আছে, আমাদেরও পুণ্য-সূর্য্য আছেন। আমি বলিয়াছি যে, আমরা স্বর্গ হইয়া যাইতে পারি। এখন আমি দেখিতেছি যে, আমাদের পক্ষে স্বর্গ অপেক্ষাও ভাল হওয়া সম্ভবপর। কি প্রকারে? যখন আমরা সূর্য্যের প্রভুকে আমাদের মধ্যে পাই।

স্বর্গ আগাগোড়া শুভ্র এবং কোন প্রকার কলঙ্ক শূন্য। উহা ঝড় তুফানে বা রাত্রিতে কোন সময়েই পরিবর্ত্তিত হয় না; তাহা হইলে আমরাও যেন বিপদ পরীক্ষাতে অথবা পাপের প্রলোভনে সেরূপ প্রভাবান্বিত না হই; কিন্তু আমরা যেন পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক থাকি।

স্বর্গ ঊর্দ্ধে ও পৃথিবী হইতে অনেক দূরে অবস্থিত। আসুন,

আমরাও আমাদের জন্য ইহা সম্পন্ন করিয়া লই। আসুন, আমরা আমাদিগকে পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আনি এবং সেই উচ্চ স্থানে স্থাপিত করি, এবং পৃথিবী হইতে দূরে লইয়া যাই।

স্বর্গ ঝড় বৃষ্টির ঊর্দ্ধে,—তাহারা কেহই সেস্থানে যাইতে পারে না। আমরাও ইচ্ছা করিলে, এই অবস্থায় উপনীত হইতে পারি। যদিও ইহা পরিবর্ত্তিত হইতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তথাপি ইহা সেরূপ প্রভাবান্বিত হয় না। সুতরাং আমরাও পরিবর্ত্তনের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতেছি প্রতীয়মান হইলেও, যেন বস্তুতঃ সেরূপ না হই। কারণ, সাধারণ লোকেরা ঝড়ের সময়ে যেমন স্বর্গের শোভা জানিতে পারে না, উহা পরিবর্ত্তিত হইতেছে বলিয়া মনে করে, কিন্তু জ্ঞানী লোকেরা জানেন যে উহা কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় নাই, আমাদের সম্বন্ধে আমাদের শোকতাপের মধ্যে তেমনিই ঘটে। অধিকাংশ লোক মনে করে, পরিবর্ত্তনশীল অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও পরিবর্ত্তিত হইয়াছি এবং শোক তাপ আমাদের অন্তরের গূঢ় স্থান স্পর্শ করিয়াছে, কিন্তু দার্শনিক পণ্ডিতগণ জানেন যে উহা আমাদিগকে স্পর্শ করে নাই।

—সেণ্ট ক্রীসোষ্টম

সম্পাদকীয়।

উৎসবের আহ্বান—সংসার-পথে চলিতে চলিতে আমরা অনেক সময় শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ি, জীবন-সংগ্রামের মধ্যে পাপ প্রলোভনে ও বাধা বিঘ্নে ক্ষত বিক্ষত ও পরাজিত হইয়া, বিবিধ দুঃখ ক্লেশে শোকে তাপে জর্জ্জরিত হইয়া, অবসন্ন ও হতাশ হইয়া পড়ি,—সকল দিক যেন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যায়, কোনও দিকে যেন ক্ষীণ আলোক-রেখাও দেখিতে পাই না, পথ যেন আর চলিতে পারি না, কোনও আশা উৎসাহ বলই যেন পাই না, এরূপ অবস্থাও মাঝে মাঝে উপস্থিত হয়। কিন্তু ইহাও আমরা বহু বার দেখিতে পাইয়াছি যে, কখনও এরূপ অবস্থা চিরস্থায়ী হয় না,—ইহার মধ্যেই তাহার প্রতিকারেরও ব্যবস্থা রহিয়াছে। প্রকৃতি-রাজ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, যখন বায়ুপ্রবাহ এক প্রকার রুদ্ধ হইয়া যায়, সমস্ত জগত প্রখর তাপে উত্তপ্ত হইয়া উঠে, অসহনীয় ক্লেশে প্রাণ যেন ওষ্ঠাগত হয়, তখনই স্বাভাবিক নিয়মে প্রবল ঝটিকা ও সুশীতল বারিধারা আসিয়া সে অবস্থা দূর করিয়া, সকলকে স্নিগ্ধ সুন্দর জীবন্ত ও উৎফুল্ল করিয়া তোলে। কখনও ইহার ব্যত্যয় ঘটে না। অভাবের মধ্যেই বিশ্ববিধাতা অভাবপূরণেরও ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। আমাদের শরীর যখন শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন তাঁহার ব্যবস্থাতেই নিদ্রা আসিয়া উহাকে পুনরায় সুস্থ সবল ও সজীব করিয়া উঠায়, নূতন করিয়া গড়িয়া দেয়। আমাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনেও প্রেমময় বিধাতার এই মঙ্গল বিধিই সুনিশ্চিত ভাবে কার্য্য করিতেছে, দেখিতে পাওয়া যায়।

বিশ্ববিধাতা যেমন ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা প্রভৃতি আকারে আমাদের প্রতিদিনের শারীরিক অভাব ও ক্ষতি পূরণের জন্য আহ্বান ও ব্যবস্থা আমাদের প্রকৃতির মধ্যেই রাখিয়া দিয়াছেন, তেমন বিশেষ বিশেষ অবস্থায় শরীর মন ও আত্মার জন্য বিশেষ ব্যবস্থাও তিনিই করিয়া থাকেন। শরীর অপেক্ষা বহুগুণে অধিকতর মূল্যবান অবিনাশী আত্মার কল্যাণ ও উন্নতি বিষয়ে যে তিনি কখনও উদাসীন থাকিতে পারেন না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়—বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। আমরা যখন তাঁহার প্রদত্ত এই স্বাভাবিক প্রকৃতির আহ্বান অগ্রাহ্য করিয়া চলি, ও তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘন করি, তখন যে তিনি আমাদিগকে দীর্ঘকাল বিনা বাধায় সে-পথে চলিতে দেন, তাহা নহে; বরং, আমাদিগকে সে-পথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত করিবার জন্য তাঁহার অপার প্রেম ও করুণার কার্য্য তাহার সঙ্গে সঙ্গেই চলিতে থাকে। আমাদের উদাসীনতা ও অবহেলা তাঁহার প্রেম ও সহিষ্ণুতাকে হ্রাস না করিয়া বর্দ্ধিতই করিতে থাকে, এবং অবশেষে তাঁহার জয় ও আমাদের পরাজয়ই ঘটিয়া থাকে। এরূপ ব্যবস্থা না থাকিলে, আমাদের অনেকের পক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার, নূতন আশা উৎসাহ বল ও নবজীবন লাভ করিয়া আবার জীবনপথে অগ্রসর হইবার, কোনও সম্ভাবনাই থাকিত না,—আমাদিগকে ক্রমাগত মৃত্যুর দিকে ধাবিত হইয়া মহা বিনাশই প্রাপ্ত হইতে হইত। তাঁহার প্রেমের মধুর আহ্বান প্রত্যেকেরই জন্য প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রতি পদক্ষেপেই রহিয়াছে। যাহারা যত আগে তাহা শুনিয়া চলে, তাহারা তত দ্রুত ও সহজে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সমর্থ হয়, আর যাহারা যত দীর্ঘকাল তাহা অগ্রাহ্য করে, তাহাদিগকে তত গৌণে ও দুঃখ ক্লেশের মধ্য দিয়া ফিরিতে হয়, এইমাত্র পার্থক্য। কিন্তু এক সময়ে না এক সময়ে সকলকেই ফিরিতে হইবে। তাঁহার প্রেম ও করুণার আহ্বান ও ব্যবস্থা সকলের জন্য সমভাবেই রহিয়াছে—কেহই তাহা হইতে বিন্দু পরিমাণেও বঞ্চিত নহে।

আমাদিগকে নূতন আশা উৎসাহ বল ও নবজীবন প্রদানের জন্যই উৎসবের বিশেষ ব্যবস্থা। যাঁহারা নিত্য নূতন জীবন লাভ করিয়া অবিরাম গতিতে জীবনপথে অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহাদের জন্যও ইহার প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু আমাদের ন্যায় উদাসীন দুর্ব্বল বিপথগামী যাহারা, তাহাদের জন্য ইহার আবশ্যকতা এত অধিক যে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ইহা যে আমাদের জীবনে কি অশেষ কল্যাণসাধন করিয়াছে, তাহা আমরা সকলেই বিশেষভাবে অবগত আছি। তাই বৎসরান্তে প্রিয়তম মাঘোৎসবের আগমনে সকলের প্রাণই অল্পাধিক পরিমাণে নাচিয়া উঠে। পূর্ব্বে সকল হৃদয়ে যেমন প্রবল সাড়ার পরিচয় পাওয়া যাইত, এখন যে তাহা আর তেমন ভাবে লক্ষিত হয় না, তাহা আমাদিগকে লজ্জা ও দুঃখের সহিত স্বীকার করিতেই হইবে। তবুও পৌষের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই যে মাঘোৎসবের আহ্বান আসিয়া অনেক হৃদয়কে কিছু না কিছু পরিমাণে আকুল করিয়া তোলে—

উৎসবের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত হইবার আকাঙ্ক্ষা তাহাদের প্রাণে জাগায়—তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। যত ক্ষীণভাবেই হউক, সে আহ্বান আমাদের নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

কিন্তু সে-আহ্বানধ্বনি যে ব্যাকুল ভাবে সমগ্র মন প্রাণ দিয়া উৎসবের জন্য প্রস্তুত হইতে উদ্বুদ্ধ করিবার পক্ষে যথেষ্ট প্রবল শক্তিতে আমাদের সকলের হৃদয়াভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। আমরা অনেকেই নানা অসার কোলাহলে এখনও এমন ব্যস্ত যে, সে-আহ্বান ভাল করিয়া আমরা শুনিতে পাইতেছি না। যদি সেই ভাবে শুনিতে পাইতাম, তবে নিশ্চয়ই সর্ব্বোপরি তাহার দিকেই ধাবিত হইতাম। সে-আহ্বান ভাল করিয়া শুনিলে কখনই নিশ্চিন্ত প্রাণে বসিয়া থাকা যায় না। স্নেহময়ী জননীর মধুর আহ্বান প্রাণ মনকে মুগ্ধ না করিয়া, প্রবল ভাবে আকৃষ্ট না করিয়া পারে না। কাজেই উৎসব যথার্থভাবে সম্ভোগ করিতে হইলে, তাহা হইতে নবজীবন লাভ করিতে হইলে, যাহাতে আমরা সে-আহ্বান ভাল করিয়া শুনিতে পারি, আমাদিগকে সর্ব্বাগ্রে সে চেষ্টাই করিতে হইবে।

তিনি যে ক্ষীণ স্বরে ডাকিতেছেন, অথবা কাহাকে কাহাকে ডাকিতেছেন, আর অপর অনেককে বাদ দিতেছেন, এমন কথা ত কিছুতেই বলা যায় না। অনেকে ত তাহা শুনিয়া ব্যাকুলভাবেই ছুটিয়াছেন! আমরা যে বাহিরের অপর বহু কোলাহল ইহা অপেক্ষা প্রবল ভাবে শুনিতে পাইতেছি, তাহার কারণ খুঁজিতে গেলে দেখিতে পাইব যে, সে-সকল দিকে আমাদের চিত্ত অধিক পরিমাণে ধাবিত হয় বলিয়াই এরূপ ঘটে। আমরা যদি মনকে সে-সকল হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া, অন্তরের মধ্যে সেই আহ্বানধ্বনি শুনিবার জন্য একটু উৎকর্ণ হই, মনোযোগী হই, তবে যে আমরাও তাহা ক্রমে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতররূপে শুনিতে সমর্থ হইব, সে বিষয়ে কি কোনও সন্দেহ আছে? আমাদের জন্য যে তাঁহার আহ্বান বিশেষরূপে ক্ষীণ ভাবে আসিতেছে, এমন কথা ত কিছুতেই বলা যায় না। তাঁহার স্নেহের আহ্বান যে সকল সন্তানের জন্য সমভাবেই আসিয়া থাকে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা যদি কেহ তাহা তত স্পষ্টরূপে শুনিতে না পাই, তবে তাহা আমাদের নিজের দোষেই ঘটে।

সুতরাং, আমরা যদি এখনও সে আহ্বান না শুনিয়া থাকি, অথবা তত স্পষ্টরূপে শুনিতে না পারি, তবে সর্ব্বাগ্রে আমাদিগকে নিজ নিজ ত্রুটি সংশোধনের জন্যই সচেষ্ট হইতে হইবে। এই হেতু আমাদিগের মধ্যে অন্তরের ও বাহিরের যে-সকল প্রতিবন্ধকতা আছে, তাহা দূর করিতে হইবে। আমরা কি লইয়া ব্যস্ত আছি, কিসে মজিয়া রহিয়াছি, তাহা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে, এবং সে-সকল বিষয় হইতে মনকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য বিশেষভাবে যত্নশীল হইতে হইবে। স্নেহময়ী জননী যে সতত অন্তরে বাহিরে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া আমাদিগকে নিয়তই মধুর স্বরে ডাকিতেছেন, তাহা মনে রাখিয়া, এবং বহুবার জীবনে তাহার যে পরিচয় পাইয়াছি সে-কথা স্মরণ করিয়া, পুনরায় তাহা প্রত্যক্ষভাবে শ্রবণ ও অনুভব করিবার জন্য, বিশেষ আগ্রহের সহিত উৎকর্ণ হইয়া থাকিতে হইবে। অপরে যে শুনিতে পাইতেছেন তাহা দেখিয়া, অধিকতর উৎসাহিত ও আশান্বিত হইতে হইবে, —তাঁহাদের সঙ্গ করিয়া উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। আমরা অপর সকল হইতে দূরে থাকিয়া যাহা করিতে পারি না, তাহা যে এরূপ সম্মিলন ও সহায়তা কত সহজ করিয়া দেয়, সে-কথা আমরা সকলেই বিশেষরূপে অবগত আছি। জীবনে বহু সময় তাহার অনেক প্রমাণও পাইয়াছি। সুতরাং সমবেত চেষ্টার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। অপর সকল হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে, আমরা যে কত দুর্ব্বল হইয়া পড়ি, তাহা সকলেই সর্ব্বদা দেখিতে পাইতেছি।

সর্ব্বোপরি, অসহায়ের সহায়, দুর্ব্বলের বল যিনি, সেই চির করুণাময় পিতার অপার কৃপার তুল্য দ্বিতীয় সম্বল আর কিছু নাই। আমাদের সমস্ত চেষ্টা যত্ন ব্যর্থ হইলেও তাঁহার করুণা আমাদিগকে পরিত্যাগ করে না। বরং অনন্যগতি হইয়া যখন আমরা তাঁহার শরণাপন্ন হই, তখন তাঁহার করুণা-ধারা আরও প্রচুর পরিমাণেই বর্ষিত হয়, সকল ব্যর্থতার মধ্যেই তিনি পূর্ণ সফলতা আনিয়া দেন। তাই আকুল প্রার্থনার তুল্য আর কোনও উপায়ই নাই। আমরা চেষ্টা যত্ন যাহাই করি না কেন, তাহাতে যতটাই সফলতা লাভ করি না কেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে সর্ব্বদাই তাঁহার কৃপার ভিখারী হইয়া প্রার্থনা করিতে হইবে। তাঁহার কৃপা ভিন্ন কোনও চেষ্টাই ফলবতী হইতে পারে না, অপর কোনও প্রকারেই আমরা যথেষ্ট বল ও শক্তি লাভ করিতে পারি না। তিনি যেমন নিয়ত কাছে ডাকিতেছেন, তেমনি সর্ব্বদা আমাদের হৃদয় মনকে প্রস্তুত করিবার জন্যও নিযুক্ত আছেন। তিনি যে দূর হইতে ডাকিয়াই ক্ষান্ত থাকেন, তাহা নহে; আমরা যাহাতে সে আহ্বান শুনিতে পারি, আমরা যাহাতে মোহাভিভূত হইয়া না থাকি, তাহার জন্যও অন্তরে বাহিরে অবিরাম তাঁহার কার্য্য চলিতেছে। আমরা তাঁহার শরণাপন্ন হইলে, তাহা যে আমাদের জীবনে অধিকতর কার্য্যকারী হইতে পারে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এই জন্যই প্রার্থনা একান্ত আবশ্যক। প্রার্থনা না করিলে যে তিনি তাঁহার কার্য্য করিবেন না, এমন নহে,—তাঁহার কার্য্য আমাদের জীবনে অনেক গৌণে ফল প্রসব করিবে, এই মাত্র। কিন্তু তাই বলিয়া কোনও কল্যাণকামী ব্যক্তি সেই দিনের প্রতীক্ষায় প্রার্থনা পরিত্যাগ করিয়া উদাসীন ভাবে বসিয়া থাকিতে পারে না—থাকিলে, তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল বা শাস্তি হইতেও কেহ রক্ষা পাইতে পারে না।

অতএব আমরা যাহাতে উৎসবের আহ্বান সকলেই ভাল করিয়া শুনিতে পাই, তাহার জন্য আমাদিগকে ব্যক্তিগত ও সমবেত ভাবে বিশেষ রূপে প্রার্থনা আত্মচিন্তা আলোচনা প্রভৃতি সাধনে নিযুক্ত হইতে হইবে। করুণাময় পিতা আমাদিগের সকলের প্রাণে সে আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা প্রবল ভাবে জাগ্রত করুন। তাঁহার ইচ্ছাই সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউক।

উপাসনায় ঐক্য সাধন—বিগত আশ্বিন সংখ্যার "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে" শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর "উপাসনায় ঐক্যসাধন" নামক তাঁহার একটি প্রবন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়া, তাহার প্রতি আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন :—"উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই, আমরা ইতিপূর্ব্বে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছি যে, ব্রাহ্ম সাধারণের মধ্যে উপাসনার পদ্ধতি সম্বন্ধে ঐক্য সংস্থাপিত হইলে ব্রাহ্মসমাজের তিন শাখাই মিলনের পথে অনেক দূর অগ্রসর হইতে পারিবে, এবং সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের বল ও শক্তি বহু পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে, তাহা আমাদের এখনও সুদৃঢ় আছে। আমাদের মনে হয়, ব্রাহ্মসমাজের তিন শাখা হইতে সমসংখ্যক প্রতিনিধি লইয়া একটি আলোচনাসভা গঠিত করিয়া, এই বিষয়ে খোলা মনে মুক্তপ্রাণে আলোচনা করিয়া, একটি আদর্শ উপাসনাপদ্ধতি দাঁড় করাইলে ভাল হয়। আমাদের মতে সভাটি পূর্ব্ব হইতে সংগঠিত করিয়া আগামী উৎসবের পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়া এই বিষয়টি স্থির করিলে, এবং যে প্রকার প্রণালী স্থির হইবে তদনুসারে আগামী মাঘোৎসবের উপাসনাকার্য্য নির্ব্বাহ করিলে কি প্রকার সুমঙ্গল কার্য্য সংসাধিত হইবে, তাহা ভাবিলেও আনন্দে মন প্রাণ উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়ে। এই প্রবন্ধের উত্তরে অপর দুই শাখা হইতে যথাযুক্ত সাড়া পাইলে আমরা এই বিষয়ে অগ্রসর হইতে পারি।"

এ বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে আমরা যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলাম, এখনও তাহারই পুনরুল্লেখ করিতেছি। উপাসনায় ঐক্য সাধিত হইলে যে মিলনের পথে অনেক দূর অগ্রসর হইতে পারা যায়, এবং মিলনের দ্বারা যে সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের বল ও শক্তি বহু পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবার কথা, সে বিষয়ে মতভেদের কোনও কারণ দেখা যায় না। কিন্তু উপাসনায় ঐক্যসাধন যে কোনও বিশেষ প্রণালীরই উপর নির্ভর করে, অথবা উপাসনাপদ্ধতিতে কোনও প্রকার পার্থক্য থাকিলে ঘটিতে পারে না, তাহা আমাদের মনে হয় না। পদ্ধতির পার্থক্য সত্ত্বেও ভাবের মিল থাকিলে, উপাসনা সত্য ও স্বাভাবিক হইলে, সকলের প্রাণকে যে স্পর্শ করে ও একই স্থানে লইয়া যায়, তাহা অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হইয়াছে, সেখানেও গুরুতর অমিল উৎপন্ন হইতে যে দেখা না যায়, এমনও নহে। সুতরাং উপাসনাপদ্ধতির ঐক্যসাধনের উপর যে বিশেষ কিছু নির্ভর করিতেছে, তাহা মনে হয় না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ-প্রবর্ত্তিত উপাসনাপদ্ধতি সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, 'উহা একটি আদর্শ পদ্ধতি মাত্র ; উহা পরিবর্ত্তনসহ নহে, এরূপ মত মহর্ষি কখনও প্রকাশ করেন নাই ; তাঁহার জীবদ্দশাতেই তাঁহার পুত্রগণ কর্ত্তৃক হ্রাস বৃদ্ধি সহকারে উহা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে মহর্ষি কোনই আপত্তি করিয়াছেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় নাই।' সুতরাং সকল প্রণালীর মধ্যেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও তজ্জনিত পার্থক্যের স্থান থাকিবে ; তাহা হইতে যে কোনও প্রকার গুরুতর বিঘ্ন অনিবার্য্যরূপেই উৎপন্ন হইবে, এমন কথা বলা যায় না। সঙ্কীর্ণতা ও অনুদারতা এবং প্রণালীর একান্ত দাসত্বই সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক। তথাপি প্রস্তাবিত আলোচনার কোনই প্রয়োজন নাই, আমরা এরূপ কথা বলিতেছি না। উহার দ্বারা অনেক উপকারও সাধিত হইতে পারে। সুতরাং আমরা আলোচনাসভা গঠনের প্রস্তাব অনুমোদন করি, এবং তৎপ্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আশা করি, অনেকেই এবিষয়ে সংযোগিতা করিতে অগ্রসর হইবেন। মিলন সাধনের কোনও প্রকার চেষ্টাই উপেক্ষণীয় নহে। কোথায় কি প্রকার পরিবর্ত্তন আবশ্যক, প্রবন্ধে তাহার কোনও উল্লেখ নাই। সেরূপ কোনও নির্দ্দিষ্ট প্রস্তাব উপস্থিত হইলে, সকলেই সে বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিয়া আলোচনার সহায়তা করিতে পারিতেন। সম্ভবতঃ প্রতিনিধিদিগের আলোচনার পর তাহা সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করা হইবে।

ব্রহ্মপূজায় ব্রাহ্মসমাজের সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ বিরোধ

আমরা ব্রাহ্মসমাজের ক্রোড়ে, ব্রাহ্ম পিতা মাতার গৃহে, তাঁহাদের স্নেহ যত্ন শিক্ষা ও আদরে প্রতিপালিত হইয়াছি। আমাদের অনেকেরই পিতা মাতা, তাঁহাদের ধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দু পিতামাতার গৃহে, তাঁহাদের স্নেহ যত্ন শিক্ষা ও আদরে প্রতিপালিত হইয়া, ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্যালোকদর্শনে আত্মহারা হইয়া, আপনাদের পূর্ব্বতন সংস্কার পরিহার করিয়া, "ব্রহ্মের আনুগত্যই ধর্ম্ম," এই মহা সত্যে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক গৃহ পরিবার সমাজ গঠন করিয়াছিলেন। বিশ্বাস ও ব্রহ্মভক্তির সুমহৎ কল্যাণ-ছবি কল্পনাচক্ষে সত্যবৎ দর্শন করিয়া, তাহার বলে জগতের শোক তাপ, হিংসা বিদ্বেষ, সকলপ্রকার নীচতা ও ভেদবুদ্ধি দূর করিয়া, জগতের সকলের কল্যাণসাধন করিয়া, সংসারেই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা—মর্ত্ত্যে স্বর্গধাম, অশান্তির মধ্যে শান্তিধাম—স্থাপন করিবেন, এই আশায় তাঁহারা উৎসাহ ও মত্ততা লাভ করিয়া, সংসারের সকল দুঃখ দারিদ্র্য, রোগ শোক অম্লানবদনে সহ্য করিয়াছেন। তাঁহাদের হৃদয়ের গভীরতম আশা আকাঙ্ক্ষা যে সত্য, অকৃত্রিম, তাহা তাঁহাদের জীবনের সকল কার্য্য ও চিন্তা ও বাক্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত—তাহা গোপন থাকিত না, থাকে নাই।

সেই জীবন্ত সত্য-উদ্ভাসিত আদর্শসাধনে প্রমত্তহৃদয় পিতামাতার ক্রোড়ে প্রতিপালিত, আদরের সন্তান সন্ততি আমরা, আমাদের জীবনে সেই সত্যের অনুপ্রেরণা এরূপ মৃদু ও নিষ্ফল কেন? তাঁহাদের রক্ত মাংস, অস্থি মজ্জা, স্নেহ ভালবাসা, ত্যাগ সহিষ্ণুতার দ্বারা তিলে তিলে গঠিত আমাদের যে দেহ মন, তাহা তাঁহাদের আদর্শের বিরোধী কেন? ইহার কারণ অনুসন্ধানই সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। এই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, প্রথমেই স্বাধীনতারক্ষার দিকে, সর্ব্ববিষয়ে অধীনতা পরিহার করিবার দিকে, তাঁহাদের একান্ত আগ্রহ ও চেষ্টা বক্ষ আমাদের নয়নপথে পতিত হয়। এক পরব্রহ্মের, স্রষ্টা পাতা

প্রতিপালক রক্ষক পরমেশ্বরের, অধীনতা ছাড়া আর সর্ব্বপ্রকার অধীনতাই জীবনের পক্ষে মহা অনিষ্টকর, ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়া, তাঁহারা পুত্রকন্যা প্রভৃতির স্বাধীনতার পথ খোলা রাখিতে সর্ব্বপ্রকারে যত্ন পাইয়াছেন। ইহাতে তাঁহাদের পুত্রকন্যাদের হৃদয়ে কোনও সংস্কারবন্ধন তেমন জড়াইতে পারে নাই। তাই সন্তানগণ সর্ব্বসংস্কারবিমুক্ত হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। অন্যে ইহাদিগকে চালাইতে পারিবে, এরূপ বুদ্ধিহীন জড় অন্ধ ইহারা নহে। সকল দিক দিয়াই ইহারা সমস্ত অধীনতার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। যে অধীনতার উপর তাঁহাদের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত ছিল, যাহা ব্যতীত প্রকৃত স্বাধীনতা কিছুতেই লাভ করা যায় না, সেই পরব্রহ্মের অধীনতাও ইহারা ঝাড়িয়া ফেলিয়াছে। কাজেই দেখিতে পাওয়া যায়, ইহারা সর্ব্বপ্রকারেই নিরঙ্কুশ হইয়া উঠিয়াছে। এই হেতু সকলপ্রকার বাহিরের অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়াও, ইহারা প্রকৃত স্বাধীনতা,—পিতামাতাদের অভীপ্সিত স্বাধীনতা,—হইতে অনেক দূরেই রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইহারা অন্তরের স্বাধীনতার পরিবর্ত্তে স্বেচ্ছাচারিতার দাসত্ব হইয়া পড়িয়াছে, ভিতরে অধিকতর ীনতার পাশেই আবদ্ধ হইয়াছে।

সময়ের পরিবর্ত্তনে বা ক্রমবিকাশের প্রণালী অনুসারে বুদ্ধির উৎকর্ষ্য এযুগে যেমন ঘটিয়াছে, বিশেষ ভাবে ব্রাহ্মসমাজে যেরূপ দেখা যাইতেছে, তেমন আর কখনও হইয়াছে বলিয়া জানা নাই। ব্রাহ্ম সন্তানগণ পিতামাতার ধর্ম্মভাবের মূলদেশে প্রবেশ না করিয়া, বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়া আদর্শের উচ্চতা কিছুটা অনুমান করিয়া লইয়াছে, এবং তাঁহারা যে সে আদর্শে পৌঁছিতে পারেন নাই, তাহাও বেশ বুঝিয়াছে। ইহা হইতে নানা কল্পনা জল্পনা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছে—যাঁহারা আত্মহারা হইয়া ব্রহ্মেতে আত্মসমর্পণ করেন, তাঁহারাও যখন সর্ব্ববিষয়ে ব্রহ্মের অনুগত হইতে পারেন নাই, তাঁহাদের জীবনের কোন কোন বাক্য কার্য্য চিন্তা ও ব্যবহারে যখন সময় সময় তাহা প্রকাশ পাইয়া থাকে, ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য যাঁহারা প্রাণ দিয়াছেন, তাঁহারাও যখন ঠিক ব্রাহ্ম হইতে পারেন নাই, তখন, ব্রাহ্মজীবন চেষ্টা যত্নের দ্বারা অর্জ্জন করা যায় না, তাহা ভাগ্যক্রমেই ঘটে; সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্মসাধনচেষ্টা অনর্থক প্রয়াস, তাহা অপেক্ষা ধর্ম্মের যে সহজ স্বাভাবিক গতি—নিজ ইচ্ছা অভিরুচি মত চলিলে বর্ত্তমান যুগে যে শরীর মনের বিকাশ সহজেই হইতেছে দেখা যায়, যাহাতে কোন কঠোরতা বা কষ্টকর কিছু নাই, অথচ সর্ব্বদিকেই উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি, সর্ব্বত্রই স্বাধীনতা ও আনন্দ—তাহাই অবলম্বনীয়। ধর্ম্ম মনুষ্যের কল্পনা বা জেদ,—এই নির্দ্ধারণ করিয়াই ইহারা চলিতেছে। ইহাদের চক্ষে পিতা পিতামহদের ধর্ম্মজীবনে যে ত্রুটি দুর্ব্বলতা অনিবার্য্যরূপে লক্ষিত হয়, তাহাই উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। ঘোরতর বাধা বিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিয়া, মহান্ প্রয়াসের দ্বারা তাঁহারা যে সাফল্যটুকু লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা মোটেই তাহারা গণনার মধ্যে আনে না। সুতরাং তাঁহাদের জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি পোষণ, অথবা তাঁহাদের জীবনের আদর্শ অনুকরণের চেষ্টা বা সাধন, ইহাদের পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

মানুষ যাহা অপ্রয়োজনীয় মনে করে, যাহা মূল্যবান মনে না করে, তাহার জন্য চেষ্টা বা কষ্ট স্বীকার করিতে পারে না। ইহা মনোজগতের সাধারণ নিয়ম। এইরূপে পিতা পিতামহদের জীবনের অমূল্য ধর্ম্মসম্পদ পুত্র পৌত্র পৌত্রী, দুহিতা দৌহিত্র দৌহিত্রী প্রভৃতির নিকট নিতান্তই সাধারণ, অতি সামান্য বস্তু বলিয়া অবহেলিত হইতেছে। মানুষের যে বিষয়ে সাক্ষাৎ জ্ঞান নাই, সে বিষয়ের প্রতি শ্রদ্ধা অনুরাগ জন্মিতে পারে না। একই গৃহে, একই আহারে, প্রেম স্নেহ যত্নে বর্দ্ধিত হইয়াও, পিতা পুত্রে, মাতা কন্যাতে মিল নাই। ইহার কারণ লক্ষ্য ও আদর্শের ভিন্নতা। কেহই পরস্পরের আদর্শকে, চলা ফেরা, কথাবার্ত্তা, আমোদ প্রমোদ, বা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যকে শ্রদ্ধার চক্ষে, সমচক্ষে, দেখিতে পারিতেছে না। নিজের চক্ষে নিজের মতই প্রবল। সুতরাং সঙ্গ, এক রক্ত প্রভৃতির সুযোগে এক মন, এক প্রাণ গঠিত হইতেছে না। বাহিরে জোড়া তালি দিয়া থাকিলেও, দ্বন্দ্ব বা অমিল বাড়িয়াই চলিতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম, পরব্রহ্মানুপ্রাণিত যে সংসারধর্ম্ম, পারিবারিক ধর্ম্ম—ধর্ম্মসমাজ—গঠিত করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহা কিছুতেই সম্ভবপর হইতেছে না।

ধনীর গৃহে গৃহের, তাহার আসবাব পত্রের এবং বাহিরের কর্ম্মশৃঙ্খলার শোভা সৌন্দর্য্য আছে, কিন্তু পরিবারের মধ্যে হৃদয়ের প্রীতির দ্বারা যে মিলন, পবিত্রতা, সৌন্দর্য্য তাহা বেশী দেখা যায় না। এক হৃদয় এক প্রাণ দ্বারা পরিবার সমাজ গৃহের যে অপরাজেয় শক্তি, যাহা পরিবার সমাজ দেশ জাতি এবং জগতের সকল অকল্যাণনাশে ও কল্যাণসাধনে অপরাজেয়, তাহার বিন্দুমাত্র চিহ্নও দেখা যাইতেছে না। যেটুকু কাজ, যেটুকু শক্তির স্ফুরণ দেখা যায়, তাহা গতানুগতিকতারই প্রভাব প্রকাশিত করে। দরিদ্রের গৃহে অভাব অনটন পীড়া প্রভৃতি আছে সত্য। কিন্তু দারিদ্র্য যে ব্রহ্মবিশ্বাস দ্বারা অসীম সহিষ্ণুতা লাভ করিয়া, পরিবার সমাজ দেশ ও জগতের সকল প্রকার অকল্যাণ দূর করিতে ও কল্যাণসাধন করিতে একান্ত তৎপর, দারিদ্র্যের সেই রোগ-শোক-দুঃখ-তাপদহনকারী অত্যুজ্জ্বল গৌরবময় বিশ্বাস নির্ভর আত্মসমর্পণ ও আত্মোৎসর্গ কোথায়?

ঈশ্বরভক্ত সাধু ব্রহ্মপ্রেমে উদ্দীপ্ত ত্যাগী ও বিশ্বাসী লোক সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই আছে। যে-কেহ আর সকল অপেক্ষা ব্রহ্মকে মূল্যবান মনে করে, তাঁহারই জন্য ব্যাকুল হয়, সে-ই তাঁহাকে লাভ করে। জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে তাঁহার অনুরাগী জন তাঁহাকে লাভ করিয়া পূর্ণমনোরথ হয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম তাঁহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান মনে করিয়া, তাঁহারই জন্য ব্যাকুল হইয়া, সংসারধর্ম্ম পালন করিতে, ছোট বড় সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে, বলেন। ব্রাহ্ম, ব্রহ্মানুগত হইয়া পরিবার ও সমাজ রক্ষণ ও পালন করিবেন—ব্রহ্মের যাহা ইচ্ছা তাহাই কায়মনোপ্রাণে পালন করিবেন, সংসার ও ধর্ম্ম এক করিবেন। এই আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য, এই

ব্রহ্ম-ইচ্ছার জয়সাধনের জন্যই, এই ধর্ম্ম দীন হীন বঙ্গদেশে আগত। ব্রহ্মানুগত জীবন লাভ করিতে পিতা পিতামহদের জীবন্ত ধর্ম্মানুশীলনই শ্রেয়, না, তাঁহাদের সন্তান সন্ততিদের নিত্য বর্দ্ধনশীল নিজ নিজ ইচ্ছা রুচি আবেগ উদ্ভাসিত, নিজ জ্ঞান বুদ্ধি অভ্যাসানুপ্রাণিত সহজ প্রবৃত্তির অনুশীলনই শ্রেয়, তাহা এই দ্বিতীয় শতাব্দীতে বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। পিতা পিতামহদের জীবন্ত ধর্ম্মানুশীলনের ও অনুসরণের পথে ব্রহ্মপূজা সহজ স্বাভাবিক এবং একান্তই প্রয়োজনীয়। আর, সন্তান সন্ততিদের কর্ম্মময় জীবনপথানুসরণে আত্মবুদ্ধি, স্ব-ইচ্ছা, স্বীয় জ্ঞান শক্তির প্রতি অত্যধিক নির্ভর বিশ্বাস আবশ্যক—আত্মপূজা অবশ্যম্ভাবী। কোন্ পথ মনুষ্যজীবনে স্রষ্টা পাতার অভিপ্রায়সাধনে, উন্নতি ও সৌন্দর্য্য সাধনে একান্ত আবশ্যক, তাহা প্রত্যেক ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকার নিজে বাছিয়া লওয়া উচিত।

মঙ্গলময়ের মঙ্গল নিয়মে পিতা পিতামহাদি পূর্ব্ব পুরুষগণ চক্ষুর অন্তরালে প্রস্থান করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। তাঁহাদের সন্তান সন্ততি, পুত্র পৌত্র, দৌহিত্র দৌহিত্রীতে স্থান পূর্ণ হইতেছে। ব্রাহ্মসমাজ বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশীয়দের দ্বারাই চালিত হইবে। ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মপূজার সাক্ষাৎ এবং পরোক্ষ বাধা এই পিতা পুত্রের মহা অমিলের দ্বারাই সঞ্চারিত হইতেছে। ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মের স্থান না থাকিলে, ব্রাহ্ম মণ্ডলীর ভক্তি ও অনুরাগে ব্রহ্মপূজা প্রতিষ্ঠিত না হইলে, দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ না করিলে, ইহা কি ব্রাহ্মধর্ম্ম বা ব্রাহ্মসমাজ নামের উপযুক্ত হইবে? জগতের স্রষ্টাকে বাদ দিয়া সৃষ্টির উন্নতি ও কল্যাণসাধনের যে মহা উৎসাহ, যে বিশ্বব্যাপী উৎকট উল্লাস, চেষ্টা সংগ্রাম ও উদ্দীপনা আরম্ভ হইয়াছে, বর্ত্তমান যুগের মহা মহা মনস্বী দেশহিতৈষী জগৎকল্যাণ-প্রয়াসী ব্যক্তিগণের ধারণা ও প্রচার দ্বারা,—'স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস ও অনুরাগ দ্বারাই জগতের অকল্যাণ হইয়াছে ও হইতেছে,'—এই যে দুর্ম্মুখ বাক্যসকল উদগীরিত হইতেছে, এ-দেশের ও-দেশের এই মহা অনিষ্টকর উষ্ণ ভাবপ্রবাহ হইতে সমস্ত দেশ ও জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য আত্মদান করিতে, সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ ভাবে গলিত দূষিত অগ্নিপ্রবাহ হইতে দেশকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আপনাকে সমর্পণ করিতে, ব্রাহ্মসমাজ—ব্রাহ্মধর্ম্মই—দায়ী। কারণ, ব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎযোগেই যে ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ, এই তত্ত্ব, এই পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম, ব্রাহ্মগণ জীবনে অনুসরণের জন্যই প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই বিশ্বব্যাপী মহাসংগ্রামের প্রতিবাদ করিতে, মঙ্গলময়ের মঙ্গলপ্রদ-ইচ্ছাবিরোধী পক্ষকে নিজ জীবনদ্বারা, আত্মদানদ্বারা পরম কল্যাণকর পথ দেখাইতে, ব্রাহ্মগণই ব্রহ্মকর্ত্তৃক আহূত। এই বিশ্বব্যাপী ব্রহ্মবিরোধের সহিত সংগ্রাম করিতে ব্রহ্ম-বিশ্বাসী ছাড়া কে সমর্থ হইবে? পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে যে-সকল বিশ্বাসী ব্রহ্মপুত্রগণ পিতার কল্যাণপ্রদ বাণী আমাদের সকলকে শুনাইতে আত্মাহুতি দিয়াছেন, তাঁহারা আর বাহিরের কর্ণে সে বাণী শুনাইবেন না; যাঁহাদের বাহিরের রসনা হস্ত পদ শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয় আছে, এখন তাঁহারাই তাহা শুনাইবেন,—সকল দ্বন্দ্ব, সকল স্বার্থ, সকল বিদ্বেষ অপ্রেমের বিনাশসাধন করিতে তাঁহারাই ব্রহ্মপ্রেমে আত্মসমর্পণ করিবেন।

এই আহ্বান ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশধরগণ কি শুনিতেছেন? না, তাঁহারাও বিশ্বব্যাপী আত্মপূজা, আত্ম-কর্ত্তৃত্বের আহ্বানে আপনাদিগকে ছাড়িয়া দিবেন? মাঘোৎসবের প্রস্তুতির জন্য পৌষ মাসে উষাকীর্ত্তন হয়। এই উষাকীর্ত্তনের দলের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের দৈন্য যেন মূর্ত্তিমন্ত হইয়া নগরের দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া থাকে। যে সমাজে সুগায়ক সুস্থ সতেজ যুবকের অভাব নাই, সেখানে মুষ্টিমেয় কয়েকটি লোকের দ্বারা উষাকীর্ত্তন বাহির হইতে দেখিলে চক্ষের জল সম্বরণ করা যায় না। সুন্দর পবিত্র স্বাস্থ্যপ্রদ কল্যাণকর উষাকালে ব্রহ্মনামানু-কীর্ত্তনের মত সুন্দর কার্য্য আর কিছু নাই। ইহাতে প্রাণ যেমন প্রফুল্ল হয়, দেহও তেমনি স্ফূর্ত্তিযুক্ত হয়; সকলের হৃদয়ে ব্রহ্মানুরাগও তেমনি সংক্রামিত হয়। ব্রহ্মানুরাগ বৃদ্ধির এবং ব্রহ্মানুরাগে হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিত হইয়া কলিকাতা নগর-বাসীর কল্যাণসাধন করিবার এমন সুষ্ঠু উপায়ও আর নাই। কলিকাতার কোলাহলপূর্ণ নগরীতে ব্রহ্মপ্রেমানুকীর্ত্তনে আপনার হৃদয়কে তাঁহার সহিত মিলিত করিতে উষাকাল এক সুমহৎ সুযোগ। আবার, সেই মিলনে নিজ সমাজ ও সকল সমাজের সহিত মিলনের এমন সুবর্ণ-সুযোগ আর দ্বিতীয় নাই। যে ব্রহ্মপ্রেমের মহাবন্যায় জগতের সকলের অসারতা, নীচতা স্বার্থ বিদ্বেষ বিদূরিত হইবে, সে মহাবন্যার উৎপাদনের জন্যই পৌষের উষাকীর্ত্তন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বহু বৎসর ইহার যে দৈন্য দেখিয়া অশ্রুজলে ভাসিয়াছি, আশা করি সকলের অনুরাগ ও উৎসাহে এবার তাহা হইবে না—এবার এই পৌষ মাস হইতেই জগৎব্যাপী ব্রহ্মবিরোধের সহিত সংগ্রামার্থ আপনার শক্তিকে উৎসর্গ করিয়া, ব্রহ্মের বিজয় নিশান প্রতি হৃদয়ে, প্রতি গৃহ পরিবারে, প্রতি জাতি দেশ সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিতে, সকলে প্রস্তুত হইব। সে আশা ত বহুকাল পূর্ণ হইতেছে না। ভবিষ্যতের পানেই আশার সহিত চাহিয়া আছি।

"নিরমল প্রেম প্রচার' দেশ-বিদেশে,
সকল গৃহে, সকল পরিবারে।
জগত পুর-বাসী যত নরনারী,
সবে মিলে গাবে তোমার অনুপম গুণ,
বহিয়ে প্রেমের স্রোত প্রতি সংসার হইতে (প্রতি হৃদয় হইতে)
প্রেম-সমুদ্র তুমি, কবে মিলিবে তোমায় হে।"

মানবিক নানা আদর্শের বিকাশ।

সমবেত মহিলাবর্গ এবং ভদ্রমহোদয়গণ,

ব্রাহ্মসমাজের একটি মূল উদ্দেশ্য মিলিত ভাবে ধর্ম্মসাধন। তার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা-বিস্তার, সমাজ-সংস্কার প্রভৃতিও আছে। রাজনীতি বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের কোনও মিলিত মত নাই।

পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসম্মিলনীতে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ—কুমিল্লা, ৬ই অক্টোবর, ১৯৩২।

ব্যক্তিগত ভাবে যার যা মত থাকে ব্রাহ্মসমাজ তাতে বাধাও দেন না; অতএব আমি যা বল্‌ব, তাতে যদি পরোক্ষ ভাবে কিছু রাজনৈতিক মত এসে পড়ে, তবে জান্‌বেন তা আমার নিজের মত; সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের মত নয়। অবশ্য ধর্ম্মসমাজ হিসাবে আমরা সকলেই চাই শান্তি, ন্যায়-প্রতিষ্ঠা। সকল ধর্ম্মসমাজই তাই চান। যিশু খ্রীষ্টকে বলা হয়েছে—'Prince of Peace,' 'Islam' শব্দের অর্থই হচ্চে শান্তি। দুঃখের বিষয় ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশসকল সব সময় কাজে পালন করা হয় না।

প্রথমেই বলি, যুদ্ধ সম্বন্ধে মানুষের বর্ত্তমান মত প্রাচীন কালের ন্যায় নাই। যুদ্ধ জিনিষটা ইতিহাসে ও কাব্যে খুব প্রশংসিত হয়েছে। যুদ্ধের সঙ্গে শৌর্য্য বীর্য্য জড়িত থাকাতে, তার প্রতি মানব-মনের একটা আকর্ষণও আছে। কিন্তু যুদ্ধে মনুষ্য-বধ ত আছেই; তার সঙ্গে প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা, নারীদের উপর অত্যাচার প্রভৃতি অনেক প্রকার পাপকার্য্য আছে। তা সত্ত্বেও ঐতিহাসিকেরা যুদ্ধের প্রশংসা করে' এসেছেন। পূর্ব্বে রাজারা নিজেদের বীরত্ব দেখাবার জন্য দিগ্বিজয়ে বাহির হ'তেন। কেবল এদেশে নয়, মুসলমানদের ও ইউরোপীয়দের মধ্যেও এ ভাব ছিল। সুপ্রসিদ্ধ আলেক্‌জাণ্ডার এই ভাবেই দিগ্বিজয়ে বাহির হয়েছিলেন। এটাকে লোকে দোষের বিষয় মনে কর্‌ত না। বীরত্ব দেখান ছাড়া, লাভের জন্যও যুদ্ধ হ'ত। স্বার্থরক্ষার জন্যও যুদ্ধ হয়েছে। বর্ত্তমান যুগে Idealist-রা বলেন, যুদ্ধ একেবারে তুলে দেওয়া প্রয়োজন, এবং তা সম্ভব। নিজেদের স্বাধীনতা অর্জ্জন বা রক্ষার জন্যও, যুদ্ধ না ক'রে কিরূপে উদ্দেশ্য সাধন কর্‌তে পারা যায়, তার উপায় অনেকে চিন্তা কর্‌চেন।

এ যুগে যারা যুদ্ধ করে, তারাও তার একটা কৈফিয়ৎ দিবার চেষ্টা করে। German War-কে বলা হয়েছিল—'a war to end war,' অথবা 'a war to make the world safe for democracy.' কেউ যদি বলে, 'আগুন নিবাবার জন্য আগুন জ্বেলেছিলাম,' বা 'জলপ্লাবন থামাবার জন্যই জল ঢেলেছিলাম,' এ সব কথাও যেন সেইরূপ। যা হোক্‌, তাঁদের কথার বেশী সমালোচনা কর্‌ব না। কিন্তু দেখা যাচ্চে, তাঁরা যুদ্ধকে মন্দ কার্য্য বলে' অনুভব কর্‌চেন; এবং কোনও না কোনও যুক্তি-দ্বারা মন্দ ভাবগুলি ঢাক্‌তে চাচ্চেন। যুদ্ধ সম্বন্ধে বর্ত্তমান যুগে মানুষের মনোভাবের যে পরিবর্ত্তন হয়েছে, এটাই তার প্রমাণ।

আজ কাল জাতিসকলের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হ'লে, সালিসীদ্বারা তার মীমাংসার চেষ্টা করা হয়। ছোট ছোট রাজ্যের বিবাদ নিষ্পত্তি এইরূপে হয়েছে; কিন্তু বড় বড় জাতি-সকলের বিবাদনিষ্পত্তি এখনও সম্ভব হয় নি। League of Nations জাপানকে যুদ্ধ হ'তে নিবৃত্ত কর্‌তে পারেন নি। League of Nationsএর পূর্ব্বেও সালিসী দ্বারা জাতীয় বিবাদ-নিষ্পত্তির চেষ্টা Hague সহরে হয়েছিল। অন্য অন্য চেষ্টাও হয়েছে। একবার যুদ্ধকে আন্তর্জ্জাতিক বে-আইনী কাজ ব'লে গণ্য কর্‌বার (out-lawry of War) একটা প্রস্তাব হয়েছিল। যুদ্ধ মাত্রকেই বে-আইনী ব'লে ঘোষণা করা—এই ভাব জগতে এগিয়েছে; যদিও কাজে ততটা হয় নি।

রাজা রামমোহন রায় ১৮৩১ সালে যখন বিলাতে গিয়েছিলেন, তখন ফ্রান্স দেশ দেখ্‌তে ইচ্ছা করে' ঐ দেশের এক মন্ত্রীর কাছে যে চিঠিপত্র লিখেছিলেন, তা'তে তিনি যুদ্ধ রহিত করে' সালিসীদ্বারা বিবাদ মীমাংসা করা উচিত, এই মত প্রকাশ করেছিলেন।

সম্প্রতি যুদ্ধ সম্পর্কে কোনও কোনও অন্যায় কার্য্য রহিত কর্‌বার প্রস্তাব হচ্চে; যেমন, এরোপ্লেন থেকে বোমা ছোঁড়া, বিষাক্ত গ্যাস্‌ দ্বারা রোগ উৎপন্ন করা ইত্যাদি। সালিসীর দ্বারা বিবাদ মীমাংসার জন্য International Court of Justice নামে আদালতও স্থাপিত হয়েছে। League of Nations এর জন্য টাকা দেওয়া সম্বন্ধে ভারতবর্ষ ষষ্ঠ স্থানীয়; যদিও ঐ আদালতে একজন ভারতীয় জজ নিয়োগের দাবী কর্‌বার ক্ষমতা আমাদের হাতে নেই।

দ্বিতীয়তঃ, দাসত্ব-প্রথার বিরুদ্ধেও মত জাগ্‌চে। দাসের ব্যবসা সভ্য জগৎ হ'তে উঠে গিয়েছে। কিন্তু কতক লোক জ্ঞান উপার্জ্জন কর্‌বেন, উন্নতি কর্‌বেন, অপর লোকেরা চির জীবন নিম্ন কাজে নিযুক্ত থাকবে—এই ভাব যায় নি। সকল ধর্ম্মই মানবাত্মার মহত্ব স্বীকার করে। মানবাত্মার চেয়ে মহৎ জিনিস সৃষ্ট জগতে আর নেই—এ কথা দাসত্ব-প্রথার বিলোপের দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে।

Rhys Davis বৌদ্ধ ভারতের ইতিহাসে বলেছেন, দাসত্ব-প্রথা তখন ভারতে ছিল না; বেতন-ভোগী শ্রমিকও গ্রামে ছিল না। কিন্তু একেবারেই দাসত্ব-প্রথা ছিল না, এমন বলা যায় না। অবশ্য, আফ্রিকা হ'তে মানুষ চুরী ক'রে নিয়ে আমেরিকায় বিক্রী করার মত কেনা-বেচা এ দেশে ছিল না। কিন্তু দাস রাখার নিয়ম হয়ত ছিল।

নেপাল হ'তে কিছু কাল হ'ল দাসত্ব-প্রথা উঠে গিয়েছে। ১৯২৬ সালে Geneva-তে ভারত গবর্ণমেণ্টের অন্যতম প্রতিনিধি Sir William Vincent বলেছিলেন, League of Nations এর প্রভাবেই নেপাল হ'তে দাসত্ব-প্রথা উঠে গিয়েছে। এ কথার প্রতিবাদ আমি আমার কাগজে করেছিলাম; তিনি তাঁর কথা পরে প্রত্যাহার কর্‌তে বাধ্য হয়েছিলেন।

নেপালের সীমান্তে, বেহারের উত্তরে ও রাজপুতানায় (বে-আইনী হ'লেও) এখনও দাস রাখার প্রথা কিছু কিছু আছে। দাসত্ব-প্রথা গিয়েও যায় না। 'দাসত্ব' নাম না দিয়ে 'Indentured labour' বা অন্য কিছু নাম দিয়ে এই প্রথা এখনও চালান হচ্চে। যে-সব প্রথাতে মানবাত্মার স্বাধীনতা নষ্ট হয়, তা নানা স্থানে এখনও রয়েছে।

William Loyd Garrison উনিশ বৎসর বয়সে দাসত্ব-প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েছিলেন। তিনি প্রাণবধের ভয়েও ভীত হলেন না। Theodore Parker, Abraham Lincoln প্রভৃতিও এই প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। ঈশ্বরে বিশ্বাস ও মহৎ কার্য্যে বিশ্বাসের বলে তাঁরা কৃতকার্য্য হয়েছিলেন।

প্রাচীন কালে গ্রীস দেশে দাসত্ব-প্রথা ছিল। সে দেশের অনেক পণ্ডিত লোক ক্রীতদাস ছিলেন। যখন খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রচার প্রথম আরম্ভ হয়, তখন রোমের সম্রাটেরা খ্রীষ্টীয়ানদের উপর নানা অত্যাচার করতেন। খ্রীষ্টীয়ান নারীদিগকে জোর করে' পতিতা নারীর ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত করা হ'ত। এই সব পৈশাচিক অত্যাচার Goths and Vendals দূর করে' দিয়েছিল। তারা মানুষের মহত্ত্ব বুঝ্‌ত; অসভ্য হ'লেও এই গুণ তাদের ছিল। এই গুণেই বোধ হয় সভ্যতর রোমানদের উপরে তারা জয়ী হয়েছিল।

নারীদিগকে মন্দ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত করানকে অনেকে necessary evil বলেন। কিন্তু অন্যেরা বলেন, evil কখনও necessary হ'তে পারে না। পূর্ব্বে যুদ্ধকালে সৈন্যদের সঙ্গে পতিতা নারীর দল প্রেরিত হ'ত। Mrs. Josephine Butler প্রভৃতির চেষ্টায় এটা অনেক পরিমাণে দূর হয়েছে। বেশ্যাবৃত্তি দূর করবার চেষ্টা নানা সভ্য দেশে হচ্ছে।

নারীদের আত্মার মহত্ত্ব অন্য দিক দিয়েও স্বীকৃত হচ্ছে। আজ কাল নানা ব্যবসায় তাঁরা করতে পারেন, যা পূর্ব্বে পারতেন না। ইউরোপে পূর্ব্বে অনেক স্থানে নারীদিগকে graduate হ'তে বাধা দেওয়া হ'ত। এ দেশে কিন্তু এরূপ বাধা কেউ কখনও দেয় নি। Miss Fawcet-কে Senior Wrangler করা হ'ল না, যদিও তিনি পরীক্ষায় পুরুষ পরীক্ষার্থীদের চেয়ে অনেক বেশী নম্বর পেয়েছিলেন। ফ্রান্সের Senate বিরোধী হয়েছিলেন, মেয়েরা যাতে ভোটাধিকার না পায়। এ বিষয়েও মানবিক আদর্শের বিকাশ হচ্ছে। মহিলারা নিজেরাই ভোটাধিকারের জন্য প্রবল চেষ্টা করছেন।

আমেরিকায় মেয়েদের বড় বড় সভার চেষ্টায় সে দেশে মদ্য প্রস্তুত করা ও মদ্য বিক্রয় করা আইনদ্বারা বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে। যুদ্ধকে বে-আইনী ব'লে ঘোষণা করার চেষ্টার জন্যও মেয়েদের বড় বড় সমিতি রয়েছে। এই সকলের ফলে, সকলের আত্মার স্বাধীনতার মূল্য যে এক, তার জ্ঞান মানব সমাজে বেড়ে যাচ্ছে।

গণতান্ত্রিকতার আদর্শেরও বিকাশ হচ্ছে। এই ভাব সর্ব্বত্র বিস্তার হচ্ছে যে, ধর্ম্মে যদি সর্ব্বসাধারণের অধিকার থাকে, তবে রাজাশাসনেও থাকবে না কেন? পৃথিবীতে বর্ত্তমানে ৭০টা স্বাধীন রাজ্য আছে; তার মধ্যে ৪৫টা সাধারণ তন্ত্র। তা ছাড়া আরও কতকগুলি প্রায় সাধারণ-তন্ত্র; যেমন, ইংলণ্ড। যতগুলি মুসলমান রাজ্য আছে, সবগুলিই হয় সাধারণ-তন্ত্র, না হয় নিয়ম-তন্ত্র; স্বেচ্ছা-তন্ত্র একটিও নেই। অতএব দেখা যায়, পৃথিবীতে গণতন্ত্রেরই জয় হচ্ছে।

এতদ্ভিন্ন, বর্ত্তমান যুগে সাহিত্যে ও ধর্ম্ম বিষয়ে সাধারণ মানুষের মনুষ্যত্ব স্বীকার করা হচ্ছে। আগেকার সাহিত্যে প্রধানতঃ বড় বড় রাজারাজড়াদেরই বর্ণনা থাকত। সাধারণের সুখদুঃখ নিয়ে বড় কাব্য কোনও দেশেই রচিত হ'ত না। বর্ত্তমানে তা হয়। এ যুগে শিশুদের সম্বন্ধেও লেখা হয়। বৈষ্ণব সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণের, রামায়ণে রামচন্দ্রের, শকুন্তলা নাটকে শকুন্তলার পুত্র ভরতের, শৈশবকালের বর্ণনা আছে; কিন্তু এঁরা সকলেই অসাধারণ ছিলেন। বৌদ্ধ জাতকগুলিতেও অসাধারণ মানুষেরই বর্ণনা। এখন যে সাহিত্যে সাধারণ শিশুদের বর্ণনা দেখা যায়, এতে প্রমাণ হয়, সাধারণের মর্য্যাদা বাড়ছে। রবীন্দ্রনাথ শিশুদের সম্বন্ধে যে সব কবিতা লিখেছেন, সে-সকল কবিতা পূর্ব্বে ছিল না।

আমার শেষ বক্তব্য এই যে, ধর্ম্মের রাজ্যেও দেখা যায়, সাধারণ মানুষের মনুষ্যত্ব স্বীকৃত হচ্ছে। আগে কারো মধ্যে বিশেষ গুণ দেখলেই তাঁকে অবতার ক'রে ফেলা হ'ত। এখন লোকে বুঝতে পারছে, সাধারণ ও অসাধারণ মানুষের প্রভেদ difference in kind নয়, difference in degree মাত্র। কবিতা প'ড়ে আমরা যে তার রস গ্রহণ করি, তা এইজন্য যে, আমাদের মধ্যেও কবিত্ব আছে। তেমনি মহাপুরুষদের ধর্ম্ম-বিষয়ক উক্তি শুনে', বা উন্নত জীবন দেখে', আমরা যে মুগ্ধ হই, তার কারণ—আমাদের মধ্যে ধর্ম্মভাব রয়েছে। অশিক্ষিত বাউলদের গানে যে সব উচ্চ তত্ত্ব আছে, তা মহাপুরুষদের প্রচারিত তত্ত্বের চেয়ে কম নয়। অতএব, কোটী কোটী মানুষের পক্ষ হ'তে যদি দাবী করা যায় যে, তারাও মহাপুরুষদের সঙ্গে একই পর্য্যায়ভুক্ত জীব, তা হ'লে সেটা ধৃষ্টতা হবে না। যদি সাধারণের মধ্যে বুঝবার শক্তি না থাকত, তবে অসাধারণ-দিগকে কে চিনত? সকল মানুষের সঙ্গে সমজাতীয়তা বা জ্ঞাতিত্ব আছে। মহাপুরুষেরা ও সাধারণ মানুষেরা একই বংশের লোক। আমরা যে সাধারণ হয়েও অসাধারণ মানুষদের সঙ্গে জ্ঞাতিত্ব অনুভব করছি, এজন্য আমরা বিধাতার নিকট কৃতজ্ঞ।

সাধু নবদ্বীপচন্দ্র দাসের সঙ্গে—প্রচারে।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নবদ্বীপচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে বহু লোকেরই খোঁজ রাখিতেন। এইরূপ এক সময়ে তিনি আমায় বলিলেন, 'চল, হেরম্ব মৈত্রের সঙ্গে দেখা করিতে যাই। তৎপূর্ব্বে হেরম্ব বাবুর নাম যে আমি শুনিয়াছিলাম কি না তাহা ঠিক বলিতে পারি না। পরে শুনিলাম, তিনি তখন এম এ পরীক্ষা দিয়াছেন, এবং বিশেষ পারিতোষিকস্বরূপ এক শত টাকার পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরা তাঁহার সঙ্গে একটা বাসায় দেখা করিতে গেলাম। বেশ গৌরবর্ণ যুবাপুরুষ; বয়সটা ঠিক আমারই ন্যায় বোধ হইল। আমরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি আমাদের বেশ অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে বলিলেন, কথোপকথনের সময় তিনি বলিলেন যে, তিনি সম্প্রতি Renan's *Life of* Jesus পাঠ করিয়া বিশেষ তৃপ্তি পাইয়াছেন। তৎপরে সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক প্রণীত যীশুর জীবনী আমি একাধিক বার পাঠ করিয়াছি। পড়ে' বড়ই উপকৃত হইয়াছি।

নবদ্বীপচন্দ্রের সঙ্গে বেনিয়াটোলাস্থ ভবনে যে গৃহে বাস করিতাম, তথায় বিদ্যালয়ের সময় কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়

গমন করিতেন। মিত্র মহাশয় নবপ্রতিষ্ঠিত সিটিস্কুলের অন্যতম শিক্ষক ছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সিটিস্কুলের প্রথম শ্রেণী, অর্থাৎ এনট্রান্স ক্লাস উল্লিখিত বাটীতেই হইত। এমন কি প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রথম পথপ্রদর্শক স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, তখন সিটিস্কুলের এণ্ট্রান্স ক্লাসে অধ্যাপনার কার্য্য করিতেন। আমি তাঁহাকে দেখিয়া বড়ই সুখী হইতাম। আমাদের কৃষ্ণকুমার বাবু ক্লাসে অধ্যাপনা কার্য্য করিবার পূর্ব্বে আমাদের গৃহে আসিয়া নানারূপ প্রসঙ্গ করিতেন। তখন নবদ্বীপচন্দ্র ও আমি উভয়েই থাকিতাম। কৃষ্ণকুমার বাবু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মাবধি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ পক্ষে যে কার্য্য করিয়াছেন, এবং এখনও করিতেছেন, তাহা আমাদের সমাজের ইতিহাসে অতি উজ্জ্বল অক্ষরেই লিখিত হইবে।

ক্রমে এইরূপে সময় যাইতে লাগিল। মধ্যের অনেক ঘটনা আমার স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে না। তবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নবদ্বীপচন্দ্রের বয়স ও অভিজ্ঞতার বিষয় বিবেচনা করিয়া, প্রচারকদিগের পরীক্ষাদান ও পরীক্ষাধীন রাখিবার নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া, তাঁহাকে প্রচারক পদে অভিষেক করিলেন। কেহ কেহ আমার নিকট তাৎকালিক কামটির এই কার্য্য সঙ্গত হয় নাই বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন। কিন্তু আমি তাহা মনে করি নাই; ব্যাকরণের ব্যতিরিক্ত নিয়মের ন্যায়, সংসারের সকল কার্য্যবিভাগেই বিশেষ নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রবাহিত সময়ের মধ্যে নব নব কার্য্য ও নব নব ঘটনা আমাদের সম্মুখীন হয়। দেখিতে দেখিতে সিটিস্কুল কলেজে পরিণত হইল। শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় মহাশয় কলেজের অধ্যাপক হইয়া, রাধানাথ মল্লিকস্থ একটি ভবনে বাস করিতে লাগিলেন। সেই সময়, নবদ্বীপচন্দ্রের ও আমার বেনিয়াটোলাস্থ বাসা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাহা হইলেও হেরম্ব বাবুর বাড়ীতে আমরা উভয়েই গমন করিতাম। এইরূপে হেরম্বচন্দ্রের নূতন ভবন নির্ম্মিত হওয়ার পরও আমরা দীর্ঘকাল তাঁহার ভবনে মিলিত হইতাম। আর, অন্যান্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে স্বর্গীয় দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী মহাশয় সততই এই বাড়ী আসিতেন। ব্রাহ্মসমাজের হিতকল্পে নানা কথা হইত, কিন্তু আমার যতদূর মনে হয়, নবদ্বীপচন্দ্রের বাক্য যেন সকলে শিরোধার্য্য করিয়া লইতেন। ইহা তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা বশতঃই হউক, আর তাঁহার বুদ্ধির প্রখরতার জন্যই হউক, তাহা ঠিক বলিতে পারিলাম না। এখানে নবদ্বীপচন্দ্রের বুদ্ধির বিষয়ে, আর একটি কথার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। যখন কোন সময়ে, তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন, তখন আমি কোন ব্যক্তির নিকট এইরূপ বলিয়াছিলাম যে, সমাজের মধ্যে এত শিক্ষিত ব্যক্তি থাকিতে, ঐরূপ নির্ব্বাচন যেন ঠিক হয় নাই, আমার মনে হইতেছে। আমার এই উক্তিতে তিনি বলিলেন, "নবদ্বীপ বাবু সেরূপ জ্ঞানপথাবলম্বী না হইলেও, তাঁহার বুদ্ধি বিবেচনা, বড় সুন্দর; তাঁহার যে Strong Common Sense আছে, তাহা অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না।" কথাটা ঠিকই, একটু হাসিয়া স্বীকার করিলাম। পুস্তকার্জ্জিত জ্ঞান ও স্বাভাবিক বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, উভয়ের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। আমাদের স্বর্গীয় নবদ্বীপচন্দ্র এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোক। এখানে আর একটি ছত্র—নবদ্বীপচন্দ্রের প্রচারক পদে অভিষিক্ত হইবার পর, আমিও সমাজ কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া ঐ শ্রেণীর অন্তর্গত হই।

উভয়ে মিলিত হইয়া অনেক স্থানেই প্রচারার্থ গমন করি। কিন্তু এখন অনেক স্থানের নাম, ও অনেক ঘটনার স্মৃতি একরূপ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, দেখিতেছি। তবে যতদূর যাহা মনে আছে, তাহার কিছু কিছু পরিচয় দান করিব।

মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত লালবাগের সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব নির্ব্বাহের জন্য নিমন্ত্রণ আসিল। নবদ্বীপচন্দ্র ও আমি উভয়ে তথায় গমন করিলাম। ট্রেণে যাইবার সময় যে কি আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলাম, তাহা আর এই লেখনীতে প্রকাশ করিতে পারিলাম না। লালবাগে রামগোপাল বাবুর বাটীতে আমরা আতিথ্য গ্রহণ করি। যত্নের আর ত্রুটি ছিল না। মাসটা ঠিক স্মরণ না থাকিলেও জ্যৈষ্ঠ মাসই খুব সম্ভব। কারণ সমাজের সম্পাদক রামগোপাল বাবু সুপক্ক, রসাল, মিষ্ট বিবিধ আম সেবায় যে আমাদের তৃপ্তিদান করিয়াছিলেন, তাহা ত ভুলিবার নয়। উৎসবের প্রণালী অনুসারে রাত্রে সমাজে নবদ্বীপচন্দ্রই আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। তৎপর দিন সমস্ত দিন ব্যাপী উৎসবের কার্য্য মধ্যে প্রাতে তাঁহারই আচার্য্যের কার্য্য করিবার কথা। প্রাতে আমরা সমাজে গমন করিলাম। স্থানীয় বহু লোক সমবেত হইল। সুগায়ক বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায় সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। নবদ্বীপচন্দ্র ও আমি একত্রেই বসিয়াছি। উপাসনার সময় আরম্ভ হইল। এমন সময় নবদ্বীপচন্দ্র আস্তে আস্তে আমাকে বলিলেন, অনেক শিক্ষিত লোক উপস্থিত হইয়াছেন, বেদীর কাজটা এখন তুমিই কর। আমি প্রথমেই সম্মত হইলাম না, কিন্তু কি করি, আর সময় নাই, অগত্যা উক্ত অনুরোধ রক্ষা না করিয়া তখন আর থাকিতে পারিলাম না। বেদী গ্রহণ করিলাম। "ধর্ম্মবিশ্বাসের জয়" বিষয়ে উপদেশ দান করি। বিষ্ণুচরণ সেদিন বাঁয়্যা তবলা সহকারে সঙ্গীত করিয়া সকলের চিত্ত হরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার চিত্তহারী সঙ্গীত "ভজরে ভজ তাঁরে" পূর্ব্বেও শুনিয়াছিলাম, সেদিনও শুনিয়াছিলাম। উপাসনান্তে শুনিলাম, কার্য্যাদি সকলেরই বেশ তৃপ্তিকর হইয়াছিল। তখন আমার বয়স এই কার্য্য অনুসারে অল্পই বলিতে হইবে। যুবক ও প্রবীণেরা যে আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, সেজন্য মনে বেশ একটা তৃপ্তিই লাভ করি; এবং ভগবানকে ধন্যবাদ দিই। ধর্ম্ম-প্রচারে যে কেবল লোকের উপকারসাধন করা হয় তাহা নহে; নিজের মন প্রাণ তৃপ্তি লাভ করে, এবং আত্মা উন্নত হয়। আমাদের শিক্ষিত যুবাপুরুষেরা অনেকেই এই তত্ত্বটা

যেন বুঝিতে সমর্থ হন নাই, ইহাই মনে হয়। নতুবা ব্রাহ্ম-সমাজে এখন প্রচারকের এত অভাব হইত না।

এখন নবদ্বীপচন্দ্রের একটু মহত্ত্বের কথা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। উপাসনার সময় নিজে বেদী গ্রহণ না করিয়া, অপরের কিছু উপকার সাধিত হইবে, এই মনে করিয়া, অপরকে সেই কাজ করিতে দেওয়া, বিশেষ স্বার্থত্যাগ ও মহৎ অন্তঃকরণেরই পরিচায়ক। ভক্তচূড়ামণি চৈতন্যদেব বলিয়া গিয়াছেন, "নিজে অমানী হইয়া অপরকে মান দান করিবে।" আমাদের সাধু ভক্ত নবদ্বীপচন্দ্র সেদিন জীবনে তাহাই আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে প্রচারে বহির্গত হইয়া এইরূপ দৃষ্টান্তের একাধিক বার পরিচয় তাঁহার জীবনে পাইয়াছি। যে স্থলে অপরের দ্বারা কাজ করাইলে সুফল হইতে পারে, সেখানে তিনি তাহাই করিয়া আত্মগোপন করিতেন। এখানে আর একটু বলা দরকার। উৎসবে বক্তৃতাদান আমাকেই করিতে হইয়াছিল। নবদ্বীপচন্দ্র অন্যান্য কার্য্য সম্পন্ন করেন। নগর-সংকীর্ত্তনে সুবিখ্যাত গায়ক রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মধুর কীর্ত্তনে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিল। উৎসব সুচারুরূপেই সম্পন্ন হইয়াছিল। আমাকে তৎপরে সময় সময় এই সমাজের উৎসব সম্পন্ন করিবার জন্য গমন করিতে হইয়াছিল।

বাঁকুড়া ব্রাহ্মসমাজের এখনকার অবস্থা আমি ঠিক বলিতে পারিব না; কিন্তু পূর্ব্বে উহার সাম্বৎসরিক উৎসব বিশেষ সমারোহের সহিতই সম্পন্ন হইত। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ও তথায় ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য গমন করিতেন। একবার নবদ্বীপচন্দ্র আহূত হন। আমি সেই সময় তাঁহার সাথী হইয়াই তথায় গমন করিলাম। স্বর্গীয় কেদার নাথ কুলভি মহাশয়ের বাসাতেই আমরা আতিথ্য গ্রহণ করি। কুলভী মহাশয় তখন স্থানীয় ইংরেজী হাই স্কুলের শিক্ষক, আর বাবু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়—যিনি এখন প্রবাসী ও Modern Reviewএর সম্পাদক—তখন ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্র। তিনি নবদ্বীপচন্দ্রের সঙ্গে যখন একদিন কথা বলিতেছিলেন, তখন তাঁহার হস্তে একখানি পুস্তক দেখিয়া, তিনি তখন প্রবেশিকা পরীক্ষাই প্রদান করিবেন, এইরূপ আমার বোধ হইয়াছিল। যাহা হউক, ইঁহার শান্ত চেহারা প্রভৃতি লক্ষণে আমার বোধ হইয়াছিল যে, ইনি ভবিষ্যতে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হইবেন। আমার অনুমানটা ব্যর্থ হয় নাই।

কুলভি মহাশয় তখন দারপরিগ্রহ করেন নাই, যদিও বেশ বয়স হইয়াছিল; তাঁহার বাসায় আমাদের খুবই যত্ন হইতে লাগিল। মুর্শিদাবাদে যেমন মিষ্ট আম্র ফল-ভক্ষণে রসনার তৃপ্তি সাধন করিতাম, এখানে রসবিহীন বেশ জমাট মাখন খাইয়া বড় সামান্য আনন্দ উপভোগ করিতাম না। সময়টা শীতকাল বেশ মনে আছে। সমাজের কার্য্যাদি নবদ্বীপচন্দ্রই প্রায় সম্পন্ন করিয়াছিলেন। একদিন তিনি স্থানীয় স্কুল গৃহে ছাত্রদিগের নিকট একটি বক্তৃতা প্রদান করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইলেন। প্রচারক মহাশয় তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিয়া, বিষয় দিলেন, "চরিত্র"। বক্তৃতার দিন যথাসময়ে তিনি স্কুল ভবনে গমন করিলেন আমি কিন্তু বাসাতেই রহিলাম। বক্তৃতার পর বক্তা যখন বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন শ্রোতাদিগের কয়েক জনের মুখে শুনিলাম, বক্তৃতা-স্থলে, কোন একজন ব্যবহারজীব ছিলেন, তিনি নাকি কুলভি মহাশয়ের নিকট বলিয়াছিলেন,—যে 'বক্তা বেশ শান্ত ভাবে, আপনার বক্তব্য বিষয়টি যুক্তি সহকারে গুছাইয়া বলিয়াছিলেন—সাধারণতঃ বক্তারা বক্তৃতা প্রদান কালে যেরূপ লম্ফ ঝম্ফ করেন, ইঁহার সে ভাব দেখিলাম না।' কুলভি মহাশয় নিজ মুখে ঐ মন্তের কথা আমার নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন। নবদ্বীপচন্দ্র ইহার পূর্ব্বে যে কোন স্থলে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না।

সিরাজগঞ্জ ব্রাহ্মসমাজের নাম এখন বড় শুনিতে পাই না। কিন্তু এক সময়ে বিশেষ একটু জাঁকজমকের সহিতই উহার উৎসব সম্পন্ন হইত। যখন স্বর্গীয় ডাঃ অমৃতলাল মজুমদার মহাশয় ঐ স্থানে থাকিয়া কার্য্য করিতেন, তখন একবার নবদ্বীপচন্দ্র, আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় ও আমি স্থানীয় সমাজের উৎসব সম্পন্ন করিবার জন্য গমন করি। দুইজনেই সাধু পুরুষ তাহার আর উল্লেখের প্রয়োজন নাই। ষ্টীমারে যাইবার সময় ঐ সাধুদ্বয়ের সঙ্গে নানাবিধ জীবনের কল্যাণকর প্রসঙ্গে যে তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলাম, তাহা আর কি বলিব! একদিকে নদীবক্ষে বসিয়া চারিদিকের মুক্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শন,—অপর দিকে ভগবদ্ প্রসঙ্গ—এর তুল্য মনের ও আত্মার সুখদায়ক কি হইতে পারে? ভগবানকে ধন্যবাদ দেই, এরূপ সুখ ও আনন্দ জীবনে বহুবারই সম্ভোগ করিয়াছি।

আমরা অবশেষে গন্তব্যস্থানে উপনীত হইলাম। ডাঃ মজুমদার আমাদিগকে পাইয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তিনি অতি সাধু, অমায়িক ও সুরসিক পুরুষ ছিলেন। তাঁহারই বিশেষ যত্নে পরে স্থানীয় সমাজমন্দির নির্ম্মিত হয়; এবং তিনিই উহার সম্পাদকরূপে বহুদিন কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। মজুমদার মহাশয় বিশেষ যত্নসহকারেই আমাদের পরিচর্য্যার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। উৎসব আরম্ভ হইল। আমরা সকলেই কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিলাম। এতদ্ভিন্ন প্রকাশ্য বক্তৃতাটা আমাকেই করিতে হইয়াছিল। অন্যান্য স্থলের ন্যায় এই সিরাজগঞ্জেও আমাদের পরম প্রীতি ও শ্রদ্ধাভাজন নবদ্বীপচন্দ্র লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণে বঞ্চিত হন নাই। হায়, নবদ্বীপের ন্যায় আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়ও চিরদিনের জন্য আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়াই চলিয়া গেলেন!

কিছুদিন পরে নবদ্বীপচন্দ্র আমাকে বলিলেন, চল, এবার উড়িষ্যা অঞ্চলে গমন করি। আমি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া পড়িলাম, বলিলাম, বেশ কথা। এ কিন্তু কোন সমাজ বিশেষের উৎসবের নিমন্ত্রণ নহে; অনাহূত হইয়া প্রচারার্থ গমন করা। কোন বিষয়ে আমন্ত্রণ না পাইলে মানুষ যে কার্য্য মনের সহিত সম্পাদন করিতে পারে না। যৌবনে দুইটি জিনিষ আমার

প্রাণকে সর্ব্বদাই উৎসাহিত করিয়া তুলিত। একটি, নানাস্থান পরিভ্রমণে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শন, অপরটি, জ্ঞান, ভগবদ্‌ভক্তি ও কর্ম্মের সাধন দ্বারা মানুষ মনুষ্যত্বের উচ্চতর শিখরে অধিরোহণ করিতে সমর্থ হয়, ব্রাহ্মসমাজের এই মহৎ আদর্শের কথা নর-নারীর নিকট ঘোষণা করা। উড়িষ্যা ইতঃপূর্ব্বে কখন দেখি নাই; তবে শুনিয়াছিলাম, উহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বড়ই সুন্দর।

এখন ঐ অঞ্চল দেখিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। 'মেডিনা' নামক জাহাজে যাইব, স্থির হইল। পূর্ব্ব হইতে উহার টিকিট কিনিবার ব্যবস্থা করিতে হইল। প্রাতে জাহাজ ছাড়িবে, রাত্রেই এইজন্য যাত্রীদিগকে জাহাজে আশ্রয় লইতে হইত। আমরা তিনজনে এ যাত্রার একত্রে গমন করি। নবদ্বীপচন্দ্র, আমি ও আর একব্যক্তি। তিনি এখন পরলোকে, নামের আর আবশ্যক নাই। জাহাজ ছাড়িবার পূর্ব্বদিন রাত্রি প্রায় ১২ টার সময়, আমরা জাহাজে উঠিলাম। সঙ্গে তিন দিনের প্রায় খাদ্যসামগ্রী গ্রহণ করি। জাহাজে উঠিয়া কি আনন্দ! ডেকের উপর আমাদের শয্যা বিস্তৃত হইল। শয্যার কথা আর কি বলিব! প্রত্যেকের একখানা করিয়া কম্বল, কি সতরঞ্চ, এইরূপই হইবে। বালিসের ব্যবস্থাটা কিরূপ ছিল, তাহা স্মরণ নাই; বোধ হয়, আমাদের দ্রব্যাদি বহনকারী বড় গোচের ক্যাম্বিসের ব্যাগই উহার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিল। লিখিতে লিখিতে মনে হইতেছে, সেই সময়ের ও তাহার পূর্ব্বের ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকেরা, খৃষ্টধর্ম্মের প্রথমাবস্থার Apostolic ageএর প্রচারকদিগের ন্যায়ই জীবনযাত্রাটা নির্ব্বাহ করিতেন। যদি গৌরগোবিন্দ, অঘোরনাথ, বিজয়কৃষ্ণ, শিবনাথ, নবদ্বীপ, জীবনের সকল সুখকে পশ্চাতে রাখিয়া, ব্রাহ্মধর্ম্ম ঘোষণার জন্য প্রাণ মন ঢালিয়া না দিতেন, তাহা হইলে কি আমরা এই মহান্‌ ধর্ম্মকে সমাজ মধ্যে দাঁড় করাইতে সমর্থ হইতাম, না, ইহা প্রচারের ধর্ম্ম বলিয়া, ইহার কোন গৌরবের কথা ইহার ইতিবৃত্তে লিপিবদ্ধ করিতে পারিতাম? রাজনৈতিক ইতিবৃত্তে যেমন আমরা ত্যাগী পুরুষদিগের আত্মোৎসর্গের পরিচয় পাই, ধর্ম্মের ইতিবৃত্তেও আমরা তদপেক্ষা অনেক উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্তের পরিচয় পাইয়া থাকি। আমাদের বাল্য ইতিহাসও উহার বহির্ভূত নহে।

আমরা গঙ্গাবক্ষে "মেডিনার" উপর বেশ সুখেই রাত্রি কাটাইয়া দিলাম। প্রাতে কিছুকাল পরে জাহাজ ছাড়িল। মনে হয়, আমাদের ঐ বৃহৎ জাহাজে প্রায় সহস্র পুরুষ ও নারী যাত্রী আরোহী হইয়াছিল। জাহাজ চলিতে লাগিল, আর আমরা আনন্দে দূরের গাছপালা দেখিতে দেখিতে, আর নানারূপ প্রসঙ্গে, সময় কাটাইতে লাগিলাম। আমরা ক্রমে ক্রমে প্রশস্ত নদীর মুখ অতিক্রম করিয়া বঙ্গোপসাগরের বক্ষে গিয়া পড়িলাম। সেই সময় ক্যাপ্‌টেন ও খালাসীদিগের মধ্যে জাহাজকে কোনরূপ বিপদের পথ হইতে রক্ষা করিয়া সুনিয়মে পরিচালিত করিবার জন্য যেন এক ঘোর ব্যস্ততা পড়িয়া গেল। যাত্রীদিগকে সাবধান করিবার জন্য কয়েকজন খালাসী-কণ্ঠ হইতে বহুক্ষণ ধরিয়া এই ধ্বনি উঠিতে লাগিল, "শীর ঘুর্ণেগা," অর্থাৎ সমুদ্রে পড়িয়াছি, মাথা ঘুরিবে। আমরা পূর্ব্বেই জানিতাম যে, সাগরবক্ষে ঐরূপ সময়ে, কিছু আহার করিয়া উদর পূর্ণ রাখিলে, বমন ও শিরঘূর্ণনের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। আমরা সেজন্য কিছু ফলাদি আহার করিলাম। মাসটা বোধ হয়, জ্যৈষ্ঠ। সাগরের তরঙ্গ একটু ভয়াবহ হইলেও, বড়ই প্রাণে আনন্দ হইতে লাগিল। নবদ্বীপচন্দ্র একেবারে শুইয়া পড়িলেন। আমি ও আমার অন্য বন্ধুটি বসিতে যাই আর পারি না। দিবা অবসান হইয়া আসিল; তখন পূর্ণিমা তিথি, চন্দ্র উদিত হইয়া, সাগরের সৌন্দর্য্য যে কি সুন্দর করিয়া তুলিল, তাহা কি আমার ছার লেখনী বর্ণনা করিতে পারে? নবদ্বীপ আর এ সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইলেন না; তিনি চক্ষু মুদিয়া শয্যাতেই পড়িয়া রহিলেন। সাগরের শুভ্র বিশাল তরঙ্গ যেন এক নূতন বসন পরিয়া, ভগবানের অপূর্ব্ব কীর্ত্তির জয় বিশ্বে যেন কি এক অব্যক্ত স্বরে ঘোষণা করিতে লাগিল। তখন ইংরেজ কবি লর্ড বায়রণের (Lord Byron) কবিতায় বলিতে ইচ্ছা হইল,—

"Roll on thou deep dark and blue ocean, roll!"—"অতলস্পর্শ নীলাম্বু! তুমি তোমার সতত চঞ্চল বিশাল তরঙ্গমালা তুলিয়া প্রবাহিত হও।"

আমি এখন সাধু নবদ্বীপচন্দ্র দাসের সঙ্গে প্রচারযাত্রী। অতিরিক্ত যাত্রীর প্রাকৃতিক কোন বিভাগের সৌন্দর্য্য বর্ণনার এস্থল নহে; ক্ষান্ত হইলাম। নিশা অবসান হইল। জাহাজ ক্রমেই সাগরের উপদ্রব এড়াইয়া, ধীরগামিনী একটা নদী মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রায় বেলা অবসানে জাহাজ ছাড়িয়া আর এক ছোটরকমের ষ্টীমারে উঠিলাম, এবং যথা সময়ে আমাদের গন্তব্যস্থান কটক সহরে পৌঁছিয়া, ব্রাহ্মসমাজের সুপরিচিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন রাও মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হইলাম। তাঁহারই বাটীতে আমরা আতিথ্য গ্রহণ করিব, তাহা পূর্ব্ব হইতেই স্থির হইয়াছিল। আমি যে সময়ের কথা উল্লেখ করিতেছি, তখন কটক বা পুরী যাইবার ট্রেন হয় নাই, বোধ হয়, পাঠক পাঠিকারা বুঝিতেছেন। মধুসূদন রাও কটকের সুপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন; এবং তাঁহার পাণ্ডিত্য ও ধর্ম্মভাবও বিশেষ প্রশংসনীয় ছিল। রাও মহাশয় তাঁহার ভবনে আমাদিগের প্রতি যত্নের কিছুই ত্রুটি প্রদর্শন করেন নাই। তাঁহার সহিত মধুর আলাপে আমরা বিশেষ সুখানুভবই করিতাম।

আমরা এবার সমাজের কোন বিশেষ উৎসবের কার্য্য সম্পাদনের জন্য বহির্গত হই নাই,—প্রচারোৎসাহী নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয়ের প্রস্তাবেই তাঁহার সঙ্গে বাহির হইয়াছি। উদ্দেশ্য উড়িষ্যা অঞ্চলে উভয়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিব। এই জন্য কটকে গিয়াই আমরা একটা 'প্রোগ্রাম' প্রস্তুত করিলাম—অবশ্য, মধুবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আমার যতদূর মনে হয়, প্রথমেই একটা বক্তৃতা দিবার কথা হয়। এই

বক্তৃতাটি আমিই দেই। নবদ্বীপচন্দ্র একটু হাসিয়া বলিলেন, "এসেই বক্তৃতা আরম্ভ কল্লে?" মনে যেন হয়, নবদ্বীপচন্দ্র ও আমি উভয়ে মিলিত হইয়াই সামাজিক ও পারিবারিক উপাসনাদি সম্পন্ন করিতাম, কিন্তু আর বক্তৃতার ভারটা আমারই উপর অর্পিত হইত। সে সময় এ ভার গ্রহণ করিতে একবারেই অসম্মতি প্রকাশ করিতাম না; বরং বিশেষ আনন্দই লাভ করিতাম। দয়া করিয়া সে সময় অনেকেই উহা শ্রবণার্থ আগমন করিতেন; এবং তাঁহারা আনন্দসহকারে মৎপ্রদত্ত বক্তৃতাদি শ্রবণ করিতেন, তাহারও পরিচয় পাইতাম। এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক। নবদ্বীপচন্দ্র এ বিষয়ে আমাকে বিশেষ উৎসাহই দান করিতেন। এইরূপে আমরা কিছু দীর্ঘকাল কটকে বাস করিয়া সাধ্যানুসারে ব্রাহ্মধর্মের সত্য ঘোষণা করিতে ত্রুটি করি নাই। নবদ্বীপের জীবন ছিল খুব বড় দরের; এইজন্য আমি যতদূর বুঝিতাম, তিনি মৌখিক কথা অপেক্ষা তাঁহার জীবনের প্রভাবের দ্বারাই অনেকের চিত্ত আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কিছুকাল এইরূপে কটকে অবস্থিতি করিয়া আমরা পুরী যাত্রা করিলাম। আমাদের ঐ দীর্ঘপথ গো-যানে যাইতে হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কলিকাতা হইতে উড়িষ্যা যাত্রাকালীন আমাদের সঙ্গে একটি লোকও সমভিব্যাহারী হইয়াছিলেন। তিনি আমাদের এ-যাত্রায় সকল সময়েই সাথী হইয়াছিলেন। এখন গো-যানে পুরী যাত্রার সময়ও তিনি গো-যানে। একখানি গরুর গাড়ীর ভিতর আমরা তিনটি প্রাণী। তাহার মধ্যে নবদ্বীপচন্দ্রের অপেক্ষাকৃত স্থূল দেহ। নবদ্বীপচন্দ্রকে আমরা যে কেবল ভক্তি করিতাম, তাহা নহে, তাঁহাকে আমরা খুব ভালই বাসিতাম। আমাদের গো-যান ছাড়িল। আমরা প্রফুল্লমনে গমন করিতে লাগিলাম। চারিদিকের সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে করিতে মনে অভূতপূর্ব্ব আনন্দের তখন সঞ্চার হইয়াছিল। আমরা তিন জনে নানারূপ প্রসঙ্গেই সময় কাটাইতে লাগিলাম। কোনরূপ আলোচনা উপস্থিত হইলে, দেখিতাম, নবদ্বীপচন্দ্র তাঁহার উপস্থিত ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দ্বারা তাহা এমনই ভাবে মীমাংসা করিয়া দিতেন যে, দেখিয়া আমরা সুখীই হইতাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশশিভূষণ বসু।

ব্রাহ্মসমাজ

শিবনাথ-স্মৃতিভবনের দ্বারোদ্ঘাটন—বিগত ৩রা ডিসেম্বর অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় শিবনাথ-স্মৃতি-ভবনের দ্বিতীয় অংশের দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। সকলে ব্রহ্মমন্দিরে সমবেত হইলে, প্রথমে একটি সঙ্গীত হয়, ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রার্থনা করেন। অনন্তর সভাপতি মহাশয়কে অগ্রে লইয়া সমবেত মহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ শোভা-যাত্রা করিয়া স্মৃতিভবনের দ্বারে উপস্থিত হইলে, শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য প্রার্থনা করেন ও সভাপতি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র দ্বারোদ্ঘাটন করেন। গৃহে প্রবেশ করিয়া সকলে আসন গ্রহণ করিলে পর, সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রমোহন বসু কার্য্যবিবরণ পাঠ করেন, এবং সভাপতি মহাশয় ও শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টো-পাধ্যায় শাস্ত্রীমহাশয়ের প্রকৃত স্মৃতি-রক্ষা বিষয়ে বক্তৃতা করেন। সঙ্গীতান্তে কার্য্য শেষ হয়।

শাস্ত্রী মহাশয়ের তৈলচিত্র-উন্মোচন—বিগত ১০ই ডিসেম্বর শিবনাথ-স্মৃতিভবনে স্থাপনের জন্য শাস্ত্রী মহাশয়ের যে তৈলচিত্র নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার আবরণোন্মোচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সভাপতি-রূপে এই কার্য্য সম্পাদন করেন। সকলে সমবেত হইলে, প্রথমে একটি সঙ্গীত হয়। তৎপর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্রের প্রস্তাবে রামানন্দ বাবু সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। তিনি প্রার্থনা করিলে পর, শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দত্ত, কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাসের লিখিত বিবৃতি পাঠ করেন। অনন্তর সভাপতি চিত্রের আবরণ উন্মোচন করিয়া বক্তৃতা করেন। আরও একটি সঙ্গীত ও কিঞ্চিৎ জলযোগের পর সভার কার্য্য শেষ হয়। শ্রীযুক্ত ললিত-মোহন দাস সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

পারলৌকিক—বিগত ৪ঠা ডিসেম্বর পরলোকগত গোবিন্দ পিল্লাই এর আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ১১ই ডিসেম্বর পরলোকগত সুপ্রভাতচন্দ্র দাসের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ আচার্য্যের কার্য্য ও শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী শাস্ত্র পাঠ করেন। এই উপলক্ষে প্রচার বিভাগে ২৲, উপাসক মণ্ডলীতে ২৲ ও দুঃস্থ ব্রাহ্ম পরিবার ভাণ্ডারে ১৲ মোট ৫৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে। শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চির শান্তিতে রাখুন।

গৃহ প্রতিষ্ঠা—বিগত ১১ই ডিসেম্বর শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দাস গুপ্তের বালিগঞ্জ কেয়াতলা রোডস্থিত নবনির্ম্মিত গৃহের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য ও অশ্বিনী বাবু প্রার্থনা করেন। নব গৃহে প্রেমময় গৃহ-দেবতার সিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হউক।

দান—শ্রীযুক্ত হরকান্ত বসু মাতার বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে ৫৲, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত বসু মাতার বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে ১০৲, শ্রীমতী বিনোদিনী ধর পতি পরলোকগত নিশিকান্ত ধরের বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে বিধবাদের সাহায্য ভাণ্ডারে ১০৲ এবং ডাক্তার সতীশচন্দ্র সেন মাতার আদ্যশ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রচার বিভাগে ৫৲, লাইব্রেরী ফাণ্ডে ৫৲, শিবনাথ স্মৃতি ভাণ্ডারে ৫৲ ও অনুন্নত শ্রেণীর শিক্ষা বিধায়িনী সভায় ২০৲ দান করিয়াছেন। এ সমস্ত দান সার্থক হউক ও পরলোকগত আত্মাসকল চিরশান্তি লাভ করুন।

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী কন্যা বীণাপাণির বিবাহো-পলক্ষে দাতব্য বিভাগে ৫৲ দান করিয়াছেন। নবদম্পতি চির-কল্যাণ লাভ করুন।

উষা-কীর্ত্তন—অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও ১লা পৌষ হইতে সমস্ত পৌষ মাস মাঘোৎসবের প্রস্তুতির জন্য নগরের বিভিন্ন অংশে উষা-কীর্ত্তন হইবে।

ভ্রম সংশোধন—বিগত সংখ্যায় ১৯২ পৃষ্ঠা ২য় স্তম্ভের ৩৪ ছত্রে "দুই দিন" স্থলে "এক দিন" হইবে।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাগ কর্ত্তৃক ১লা পৌষ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।—সম্পাদক শ্রীবরদাকান্ত বসু, বি-এ

Registered No. 65

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫৫ ভাগ
১৮শ সংখ্যা।

১৬ই পৌষ, শনিবার ১৩৩৯, ১৮৫৪ শক,
ব্রাহ্মসংবৎ ১০৩
31st December, 1932.

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০
অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে প্রেমময় জীবনবিধাতা, যদিও তুমি তোমার অসীম প্রেমে আমাদিগকে উৎসবের জন্য আহ্বান করিতেছ, তথাপি মঙ্গল বিধাতারূপে আমাদের কল্যাণের জন্যই, আমাদিগকে তাহার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত হইবার দায়িত্বও প্রদান করিয়াছ। আমরা যদি আমাদের কর্ত্তব্য যথার্থরূপে সম্পন্ন না করি, তাহা হইলে তোমার প্রেমও আমাদের উপর সম্যক্‌প্রকারে কার্য্য করিতে পারে না। তাই বহুবার দেখিতে পাইয়াছি, উপযুক্ত রূপে প্রস্তুত না হওয়াতে, তোমার প্রেমের দান আমরা অনেক সময়ই ভাল করিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই। তোমার উৎসবের জন্য যেরূপ আকুল প্রাণে ছুটিতে হয়, যেরূপ দীন হীন কাঙ্গাল হইয়া উপস্থিত হইতে হয়, যেরূপ ক্ষুদ্র মলিন চিন্তাবাসনাগুলির বন্ধন হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে হয়, সম্পূর্ণরূপে তোমার হাতে আপনাকে অর্পণ করিতে হয়, আমাদের মধ্যে তাহার কিছুই নাই, তাহার জন্য যথোচিত চেষ্টা যত্নও নাই। আমরা এখনও জড়প্রায়ই পড়িয়া রহিয়াছি। হে দুর্ব্বলের বল, তুমি ভিন্ন আমাদের হৃদয়ে কে সে বল দিবে, যাহাতে আমরা সকল জড়তা অতিক্রম করিয়া উৎসাহের সহিত তোমার উৎসবের জন্য প্রস্তুত হইতে পারি? তোমার কৃপা ভিন্ন আমাদের আর অন্য সম্বল নাই। তুমিই কৃপা করিয়া আমাদিগকে প্রস্তুত করিয়া লও। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

চয়ন

কোনও মানুষ কখনও দৈনিক বোঝার চাপে পিষ্ট হইয়া যায় নাই। যখন অদ্যকার বোঝার সঙ্গে কল্যকার (আগামী) বোঝা যোগ করা হয়, তখনই উহা সে যাহা বহন করিতে পারে তাহা অপেক্ষা অধিক ভারী হয়। নিজের উপর কখনও এরূপভাবে বোঝা চাপাইও না। যদি নিজের উপর এরূপ বোঝা চাপিয়াছে দেখিতে পাও, তাহা হইলে অন্ততঃ এই কথা মনে রাখিও যে, উহা তোমারই নিজের কাজ, ভগবানের নহে। তিনি ভবিষ্যৎ তাঁহার হাতে ছাড়িয়া দিতে, এবং বর্ত্তমানের প্রতি মন দিতেই, তোমাকে অনুরোধ করিতেছেন।

তোমাকে ১২ ঘটিকার সময় একটা অপ্রিয় কর্ত্তব্য করিতে হইবে। ৯ ঘটিকা এবং ১০ ঘটিকা এবং তাহার মধ্যস্থিত সমস্ত সময় ১২ ঘটিকার রংএর দ্বারা মসিলিপ্ত করিও না। প্রত্যেক ঘণ্টার কাজ করিয়া যাও, এবং শান্তিতে তাহার পুরস্কার উপভোগ কর। এইরূপ করিলে যখন সেই বিভীষিকাময় ভবিষ্যৎ মুহূর্ত্ত বর্ত্তমানে উপস্থিত হইবে, তখন তুমি আলোকের পথে চলিয়া উহার সম্মুখীন হইতে পারিবে, এবং সেই আলোক উহার অন্ধকারকে নিশ্চয়ই পরাভূত করিবে।

জর্জ্জ ম্যাকডোনাল্ড।

সমস্ত বিপদ পরীক্ষা সঙ্কটের মধ্যে আমরা যদি স্মরণে রাখি যে, আমাদিগকে এক বারে একটি মাত্র পদক্ষেপ করিতে হইবে, তাহা হইলে আমরা বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইব। আমাদিগকে সেই একটি মাত্র পদক্ষেপ সাহসের সহিত ও অবিচলিত ভাবে গ্রহণ করিতে সাহায্য করিবার জন্য, আসুন, আমরা ভগবানের কৃপা ভিক্ষা করি। আগামী কল্যকার বল বহুল পরিমাণে অদ্যকার সহিষ্ণু চেষ্টার ফল।

অদ্যকার জন্য জীবন ধারণ কর। কল্যকার আলোক, কল্যকার চিন্তা ভাবনা দৃষ্টিগোচর করিবে। মুদিত পুষ্পের ন্যায় রাত্রিতে যাইয়া নিদ্রিত হও; ভগবান তোমার প্রভাতের উপর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিবেন।

ক্যাবল।

সম্পাদকীয়।

উৎসবের আয়োজন—উৎসবের দিন যতই নিকটবর্ত্তী হইতেছে, ততই আমরা তাহার জন্য বিবিধ প্রকার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইবার প্রয়োজনীয়তা অল্পাধিক পরিমাণে অনুভব করিতেছি, এবং ইতিমধ্যে কোন কোন উপায় অবলম্বন করিতে আরম্ভও করিয়াছি। উৎসবকে যথার্থরূপে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে, কি প্রকার আয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়, এবং আমরা কার্য্যতঃ তাহার কতটা করিতেছি—তাহাও এই সময় ভাবিয়া দেখা যে একান্ত আবশ্যক, সে কথা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কারণ, তাহা পরিত্যাগ করিয়া আমরা অন্য যত আয়োজনই করি না কেন, তদ্দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য কখনও সম্যক্‌রূপে সাধিত হইবে না। মূল উদ্দেশ্য ভুলিয়া, ক্ষুদ্র স্বার্থ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাবের দ্বারা চালিত হইয়া, এমন উপায়ও যে কেহ অবলম্বন না করিতে পারেন যাহাতে সহায়তার পরিবর্ত্তে বিঘ্নই উৎপন্ন হইতে পারে, তাহাও বলা কঠিন—সেরূপ আশঙ্কারও কারণ মাঝে মাঝে দেখা যায়।

উৎসবের সফলতার জন্য অন্তরের ও বাহিরের অনেক প্রকার আয়োজনই যে আবশ্যক, কোনটাই যে উপেক্ষণীয় নহে, তাহা বলা বাহুল্য। তথাপি তাহাদের মধ্যে যে কোন কোনটার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে, তদভাবে যে অপর সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। এই আপেক্ষিক মূল্যের কথা ভুলিলে কিছুতেই চলিবে না। কিন্তু আমরা যে সকলেই সকল সময় সত্য ভাবে এই আপেক্ষিক মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হই, আমাদের ব্যক্তিগত অভিরুচি প্রবৃত্তি অনুসারে মিথ্যা কাল্পনিক মূল্য প্রদান না করি, তাহা কিছুতেই বলা যায় না। এরূপ না করিলে যে আমাদের মধ্যে কোনও প্রকার অমিল বা সংঘর্ষ উপস্থিত হইত না, সম্পূর্ণ ঐক্যই দেখিতে পাওয়া যাইত, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কাজেই কি প্রকারে নিঃসন্দিগ্ধরূপে সত্যভাবে এই মূল্য নির্দ্ধারণ করা যায়, তাহাই সর্ব্বাগ্রে বিশেষ ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে।

যে উপায় মূল উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সহায়, যাহা ব্যতীত উহা কিছুতেই সাধিত হইতে পারে না, তাহারই আপেক্ষিক গুরুত্ব বা মূল্য যে অপর সকল হইতে বেশী, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই,—সে কথা সকলেই স্বীকার করিবে। উৎসবের প্রধান উদ্দেশ্য যে প্রেমস্বরূপ জীবন-দেবতার সহিত প্রত্যক্ষ যোগস্থাপনের দ্বারা নূতন জীবন লাভ করা, নূতন আশা উৎসাহ বল সঞ্চয় করিয়া জীবনের পরিবর্ত্তন ও উন্নতি সাধন করা, সে বিষয়েও কোনও মতভেদের কারণ দেখা যায় না! আনন্দই যাহাদের প্রধান লক্ষ্য, তাহারাও ইহা ব্যতীত অপর কিছু হইতে স্থায়ী আনন্দলাভ করিতে সমর্থ হয় না। এই সাক্ষাৎ যোগস্থাপন ও নবজীবনলাভ যে আমাদের ইচ্ছা বা শক্তির উপর নির্ভর করে না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু তাই বলিয়া যদি আমরা মনে করি যে, আমাদের চেষ্টা যত্ন আয়োজনের উপর উহা কিছুমাত্র নির্ভর করে না, তাহা হইলে আমরা মহা ভ্রমে পতিত হইব। কেননা, তাঁহার কৃপা সকলের জন্য সমভাবে থাকিলেও, আমাদের বিভিন্ন জীবনে উহা বিভিন্ন প্রকার ফল যে প্রসব করিতেছে—তাহা ত আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাইতেছি। এই বিভিন্নতার কারণ যে আমাদের মধ্যেই খুঁজিতে হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। তাঁহার করুণা সকলের জন্য সমান ভাবে বর্ষিত হইলেও, আমরা যে যে-পরিমাণে উহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইব, সে সেই পরিমাণেই উহা লাভ করিব। কাজেই আমাদের করণীয় সর্ব্বপ্রধান আয়োজন আপনাদিগকে তাঁহার দানগ্রহণের উপযোগী করা।

সর্ব্বাগ্রে দেখিতে পাওয়া যায়, আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহের উপরই এই উপযোগিতা নির্ভর করে। যাহার মধ্যে তাহা নাই, যে উদাসীন অথবা অপর কিছুর জন্য আকাঙ্ক্ষিত, অপর কিছুর পশ্চাতে ধাবিত, সে কি প্রকারে ইহা গ্রহণ করিবে, অথবা পাইলেও আদরে বরণ করিয়া লইবে, বা সযত্নে রক্ষা করিবে? সে ত নিশ্চয়ই উহা উপেক্ষার সহিত পরিত্যাগ করিয়া নিজ আকাঙ্ক্ষিত বিষয়ের জন্যই ব্যস্ত হইয়া ছুটিবে। আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহের মূলে থাকে অভাব-বোধ; যাহা আছে তাহা লইয়াই তৃপ্ত থাকিলে, যে অবস্থায় আছে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিলে, কেহ অপর কিছুর জন্য আকাঙ্ক্ষিত ও আগ্রহান্বিত হয় না। আর, এই অভাব-বোধ যত প্রবল হয়, আগ্রহ আকাঙ্ক্ষাও ততই বর্দ্ধিত হয়, তাহা পূরণের জন্য প্রাণ ততই ব্যাকুল হইয়া উঠে। সুতরাং এই অভাব-বোধটা জাগ্রত করাই সর্ব্বপ্রধান আয়োজন। তাহা ব্যতীত অপর সমস্তই বৃথা হইয়া যাইবে। আমাদের নবজীবন-লাভের যে কত প্রয়োজন, আমরা যে কিরূপ মৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছি, প্রেমময়ের প্রেম ও করুণা আকুল প্রাণে না খুঁজিলে, হৃদয় পাতিয়া আদরে ও যত্নে গ্রহণ না করিলে যে অপর কোনও উপায়েই আমাদের বর্ত্তমান দুর্গতি দূর হইবে না, নূতন আশা বল উৎসাহ, নবজীবন লাভ সম্ভবপর হইবে না, তাহা গভীর ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে।

এই হেতু বিশেষ আত্মচিন্তা ও আত্মপরীক্ষার যে একান্ত আবশ্যক, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। তাহা ব্যতীত আমরা কোনওক্রমেই নিজেদের প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইব না। আমাদের সমস্ত উদাসীনতা অবহেলার মূল কারণ চিন্তাহীনতা, আত্মচিন্তা ও আত্মপরীক্ষার অভাব। কিন্তু শুধু অভাব-বোধ জাগ্রত করিবার জন্যই যে ইহাদের একান্ত প্রয়োজনীয়তা, তাহাও নহে। আমরা যদি গভীররূপে নিজ নিজ জীবনের সমস্ত অবস্থা ও ঘটনা পর্য্যালোচনা করি, তবে একদিকে যেমন আমাদের নানা অভাব দুর্ব্বলতার পরিচয় পাই, তেমনি অপর দিকে জীবনপথে আমরা যে নিতান্ত অসহায় নই, প্রেমময় জীবনবিধাতা যে আমাদের নিত্যসঙ্গী ও সহায় হইয়া রহিয়াছেন, জীবনের সকল অবস্থায়, সকল মুহূর্ত্তে সমস্ত সুখ দুঃখ সম্পদ্ বিপদ, জয় পরাজয়ের মধ্য দিয়া আমাদিগকে গড়িয়া তুলিতেছেন, চির কল্যাণের পথে লইয়া চলিয়াছেন, আমরাও

তাঁহাকে ভুলিয়া চলিলেও যে তিনি কখনও আমাদিগকে ভুলিয়া থাকেন না, বা পরিত্যাগ করেন না, আমাদিগকেও চিরকাল তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিতে দেন না, বার বার অসীম ধৈর্য্যের সহিত তাঁহার পথে ফিরাইয়া আনেন, তাঁহার শরণাপন্ন হইতে বাধ্য করেন—তাহারও অকাট্য প্রমাণ পাইতে পারি। ইহাতে আশা বিশ্বাস নির্ভর যে বিশেষ ভাবেই দৃঢ়ীভূত হয়, সংশয় সন্দেহ যে বহু পরিমাণে চলিয়া যায়, এবং তৎসঙ্গে তাঁহার শরণাপন্ন হইবার আগ্রহ আকাঙ্ক্ষা ও কৃপার ভিখারী হইয়া ধৈর্য্যের সহিত তাঁহার দ্বারে প্রতীক্ষা করিবার ভাবও যে অনেক বর্দ্ধিত হয়, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আমাদের মধ্যে ইহার কত অভাব আছে, এবং ইহা কিরূপ অপরিহার্য্যরূপে আবশ্যক, তাহা আমরা সকলেই অবগত আছি।

আমাদের জীবন যে সহজে পরিবর্ত্তিত হইতে পারিতেছে না, তাঁহার শক্তি যে আমাদের উপর সম্যক্ প্রকারে কার্য্য করিতে সমর্থ হইতেছে না, তাহার একটা প্রধান কারণ যে আমাদের বিরোধিতা বা স্বেচ্ছাচারিতা ও অভ্যাসের দাসত্ব, তাহা আমরা সর্ব্বদাই অনুভব করিয়া থাকি। অধিকাংশ সময়ই আমরা আপনার ভাবে আপনার পথেই চলি, আপনার ইচ্ছা অভিরুচি বিসর্জ্জন দিয়া, সম্পূর্ণরূপে তাঁহার দ্বারা তাঁহার পথে চালিত হইতে ইচ্ছুক হই না, কখনও সেরূপ চেষ্টা যত্নও করি না। আর, যদি সেরূপ ইচ্ছা ক্ষীণ ভাবে প্রাণে জাগে, তথাপি তখন আমাদের পক্ষে অভ্যস্ত পাপ মোহের শৃঙ্খল ছিন্ন করা বড়ই কঠিন হইয়া পড়ে। সকলের অভ্যস্ত পাপ অবশ্য এক নয়, কিন্তু কে যে ইহা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত তাহা বলা কঠিন। সর্ব্বাপেক্ষা বিপদ এই যে, অনেক সময়ই আমরা নিজে আমাদের দাসত্বের কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না; সে শৃঙ্খল এত গভীর প্রদেশে আমাদিগকে শৃঙ্খলিত করিয়াছে যে, আমরা সাধারণতঃ আমাদের কাজ কর্ম্মে চলাফিরাতে তাহা বুঝিতেই পারি না,—তাহাকেই স্বাভাবিক মনে করি। পূর্ব্বাপেক্ষা আমাদের মধ্যে পাপবোধ যে অত্যন্ত শিথিল হইয়াছে, তাহার পরিচয় আমাদের মধ্যে চারিদিকেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে অতি সামান্য পাপও কিরূপ গুরুতর বিবেচিত হইত, তাহা বর্ত্তমানে অনেকের নিকট অতি অদ্ভুত বলিয়াই পরিগণিত হইয়া থাকে, সংসারী লোকের নিকট কতকটা উপহাসের বিষয়ও ছিল। অথচ অনেক গুরুতর পাপও এখন বহু লোকের নিকট নিতান্ত উপেক্ষণীয়।

অতি সূক্ষ্মভাবে সত্য রক্ষা করা, ঋণগ্রস্ত না হওয়া, সর্ব্ব প্রযত্নে ঋণ পরিশোধ করা, কর্ত্তব্যপালনে কোনও শৈথিল্য না করা, আপনার সম্বন্ধে কোনও ভ্রান্ত ধারণা জন্মিবার বিন্দুমাত্র সুযোগ না দেওয়া, আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা দূরে থাকুক আকাঙ্ক্ষাও না করা, কোনও প্রকার ক্ষুদ্রতা স্বার্থপরতাকে, অপ্রেম বিদ্বেষকে হৃদয়ে স্থান না দেওয়া, অর্থ বিত্ত পদ মান অপেক্ষা চরিত্র ও ধর্ম্মকে উচ্চতর স্থান দেওয়া, সকল বিষয়ে কঠোর ন্যায়নিষ্ঠা ও পবিত্রতা রক্ষা করা প্রভৃতি বিষয়ে নির্ম্মল বিবেকানুবর্ত্তিতা যে বহু পরিমাণে অনেক লোকের মধ্যেই শিথিল হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সূক্ষ্ম কেন, অনেক স্থূল পাপের জন্যও পূর্ব্বের ন্যায় অনুতাপাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে বড় একটা দেখা যায় না—বরং, পাপ করিয়াও যাহাতে নির্লজ্জভাবে সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া সকলের মধ্যে বিচরণ করিতে পারে, তাহার জন্য বিবিধপ্রকার চেষ্টা যত্নও অনেকের মধ্যে দেখিতে না পাওয়া যায়, এমন নহে।

যে জীবনে বিবেক ম্লান, সেখানে যে ধর্ম্ম কিছুতেই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, ব্রহ্মযোগ বা উচ্চতর জীবন কোনও প্রকারেই সম্ভবপর নয়, তাহা বলা বাহুল্য। অনুতাপানলের দহনতাপে পাপ প্রবৃত্তিকে ভস্মীভূত না করিলে, হৃদয়ে পবিত্রস্বরূপের আসন রচিত হইতে পারে না। আমাদের উৎসব কৃত্রিম ভাবোচ্ছ্বাস নহে—পুণ্যস্বরূপের মধ্যে পুণ্য জীবন লাভ, সত্যস্বরূপের সঙ্গে সত্য যোগ, প্রেমস্বরূপের প্রেমে আপনাকে ডুবাইয়া দেওয়া, পাপ-মলিন জীবনের আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করা ব্যতীত আর কিছুতেই উৎসবের কোনও সার্থকতা নাই। সুতরাং পাপের সঙ্গে কোনও প্রকার বন্দোবস্ত করিতে গেলে চলিবে না; আংশিক হৃদয় দিতে চাহিলে কোনও প্রকারেই হৃদয়রাজকে পাওয়া যাইবে না, উৎসবের প্রকৃত আয়োজন কিছুই করা হইবে না।

করুণাময় পিতা আমাদিগকে যথার্থ ভাবে তাঁহার উৎসবের আয়োজন করিতে সমর্থ করুন। আমরা সকলে সমগ্র মন প্রাণের সহিত সে কার্য্যে নিযুক্ত হই। তাঁহার ইচ্ছাই আমাদের প্রতি জীবনে ও সমগ্র সমাজে জয়যুক্ত হউক।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

মাঘোৎসবের প্রস্তুতি—আর এক পক্ষ কাল পরে মাঘোৎসব আরম্ভ হবে। ১লা পৌষ হ'তে উষা-কীর্ত্তন উৎসবের আগমনী কীর্ত্তন করছে। যে পক্ষকাল বাকী আছে, সে সময় কিরূপ প্রস্তুত হওয়া উচিত? মহোৎসবের জন্য প্রস্তুত হ'তে হয়। বাড়ী ঘর, পান আহার, বস্ত্র পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার, সবই শুদ্ধ সংযত করতে হয়; আত্মপরীক্ষা, অপরাধ-স্বীকার, ক্ষমা প্রার্থনা, এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, করুণা ভিক্ষা, সাধুভক্তগণের স্পর্শ স্মরণ, শাস্ত্রপাঠ, শ্রবণ মনন, উপাসনা প্রার্থনা—ইত্যাদি নিয়মপূর্ব্বক প্রতিদিন গৃহে, মণ্ডলীতে ও একাকী নানা ভাবে অবলম্বন করতে হয়। তবে তো মহামিলন সম্ভব। হৃদয় মনকে মিলনের যোগ্য করবার জন্য এই সব আয়োজন করতে হয়।

মাঘোৎসব ঘর বাড়ী পরিষ্কার করবার একটা সুযোগ, শয্যা বস্ত্রাদি পরিষ্কার করবার একটা বিশেষ সময়, পান আহার ব্যবহার শুদ্ধ ও সংযত করবার উপলক্ষ্য,—এবং আত্মাকে জাগ্রত ব্যাকুল ক'রে তোলবার বিশেষ আহ্বান। এই সকল উপায় অবলম্বন ক'রে অন্তর ও বাহিরকে যে পরিমাণে প্রস্তুত করতে পারা যায়, সেই পরিমাণে উৎসবে সফলতা লাভ হয়।

উৎসব সম্বন্ধের ব্যাপার। চন্দ্র সূর্য্য ফুল ফল হ'তে আত্মীয় স্বজন সাধু ভক্তগণ পর্য্যন্ত সকলের সঙ্গে সম্বন্ধ শুদ্ধ সত্য ক'রে নিয়ে, সে-সকলের মধ্যে দিয়ে, প্রেমময়ের সঙ্গে সম্বন্ধ যে পরিমাণে সত্য ও জীবন্ত হবে, সেই পরিমাণে প্রেমস্বরূপের সঙ্গে এবং তাঁহার সন্তানগণের সঙ্গে মিলন হবে এবং উৎসব সার্থক হবে। মলিন, বিশুষ্ক, বিচ্ছিন্ন, চঞ্চল থেকে উৎসব হয় না।

ব্রাহ্মপরিবারগুলিকে উৎসবের জন্য এইরূপে প্রস্তুত হ'তে হবে। যথাসাধ্য সব সংস্কৃত করতে হবে। উপাসনায় বসতে হবে। বন্ধুগণকে ডাকতে হবে। রাগ অভিমান বিবাদ ছাড়তে হবে। মন্দিরে বেশী ক'রে আসতে হবে। সব নিজেদের কল্যাণের জন্য, সন্তানদের মঙ্গলের জন্য। জগতের কল্যাণ তা হ'তে হবেই। একদিনের উৎসবের জন্য কয় মাস ধরে প্রস্তুত হ'তে হয়। সব আয়োজন, সকলের হৃদয় মন শুদ্ধ সুন্দর হ'লে তো উৎসব হবে! সেজন্য কত ঝাড়া মোছা, ঘষা মাজা, হাসা কাঁদা, ধ্যান প্রার্থনা, মেলা মেশা দরকার!

মানব জীবন

(১৫)

পরিশ্রম

কর্ত্তব্যপালন করতে হ'লে পরিশ্রম করতে হয়। কর্ত্তব্য-পালনের জন্য আমরা যত পরিশ্রম করি সবই পবিত্র। মহা জ্ঞানী কারলাইল বলেছেন,—দুজন লোককে আমি শ্রদ্ধা করি,—(১ম) যে যন্ত্রাদির সাহায্যে কঠিন পরিশ্রম ক'রে পৃথিবীকে সুখের স্থান করতে চেষ্টা করে, এবং (২য়) যে আত্মার অন্নজল বিতরণের জন্য পরিশ্রম করে।

প্রথম চিন্তার বিষয় এই যে, পরিশ্রম গৌরবের বিষয় কি না? ভারতবর্ষে সাধারণতঃ শারীরিক পরিশ্রম অগৌরবের বিষয়, নিম্নশ্রেণীর লোকদের উপযুক্ত কাজ, ভদ্রলোকদের যোগ্য নয়। এদেশের সভ্যতার আদর্শ, যিনি যত পরিশ্রম না করেন, তিনিই তত শ্রেষ্ঠ? পরিশ্রমকে হীন ক'রে দেখার ফলে, যারা পরিশ্রম ক'রে নানা প্রকার অতি প্রয়োজনীয় কাজ করে, তারাও হীন ব'লে গণ্য হয়েছে। তার ফলে দেশের কোটি কোটি মানুষকে পশু ক'রে রাখা হয়েছে। তার ফলে দেশের দুর্গতি, জাতীয় দুর্গতি হয়েছে।

পরিশ্রমকে হীন চোখে দেখা অতি গুরুতর ভুল। বহু কোটি লোক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার খুব অনুরাগী, অনেক ছেলে মেয়েও গীতা পড়ে,—অথচ পরিশ্রম যে কেন এ দেশে হীন বিষয় ব'লে গণ্য হয়েছে জানি না। গীতার প্রধান উপদেশই এই যে, কাজ করতে হবে, পরিশ্রম করতে হবে, কর্ত্তব্য সাধন করতে হবে, জীবনের সমস্ত কর্ত্তব্যসাধনের জন্য পরিশ্রম করতে হবে, এই পরিশ্রমই ধর্ম্ম সাধন।

মানুষকে মানুষ হ'তে হ'লে, বাঁচতে হ'লে, উন্নতি করতে হ'লে, সুখ ও সম্পদ বাড়াতে হ'লে, পরিশ্রম করতেই হবে। সকল উন্নতির মূলে পরিশ্রম। কোন কাজ করতে গেলেই শরীর ও মনকে খাটাতে হয়, তাতেই শরীরের ও মনের শক্তি বিকশিত হয়। কোন যন্ত্রকে যদি ফেলে রাখা যায়, তা হ'লে তাতে মরচে ধরে। বেশী মরচে ধরলে অল্প অকেজো হ'য়ে যায়। তেমনি শরীর-যন্ত্রকে কাজে লিপ্ত না রাখলে, পরিশ্রম না করলে, শরীর অকেজো হ'য়ে যায়। সকলের কর্ত্তব্যবুদ্ধি খুব প্রখর নয়, সেই জন্য, অধিকাংশ লোকের পক্ষে এইরূপ নিয়ম বা শাসন থাকা ভাল যে, সকলকেই শক্তি অনুসারে কোন না কোন কাজ করতে হবে, তবে অন্নবস্ত্র পাবে।

সকল দেশেই পরিশ্রমের পরিমাণ বড়ই অনিয়মিত অবস্থায় আছে। লক্ষ লক্ষ লোক কঠিন পরিশ্রম ক'রেও যথেষ্ট ভাত কাপড় পায় না, অথচ অল্প সংখ্যক ধনী ও চালাক মানুষ অন্যের পরিশ্রমের ফলে অনেক বেশী সুখসম্পদ্ সম্ভোগ করে। সেজন্য জগতে মানুষে মানুষে এত দলাদলি হয়। সকলেই শক্তি অনুসারে পরিশ্রম করবে, এবং সকলেই যথেষ্ট খেতে পরতে সুখে থাকতে পারবে,—সকলের পরিশ্রমের ফল সকলে ভোগ করবে, এরূপ না হ'লে, মানুষ 'মানুষ' হবে না।

পরিশ্রম বিনা সংসার চলে না। ধনী এবং গরীব সকলকেই কোন না কোনরূপ পরিশ্রম করতে হয়। কেহ হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রম ক'রে যা পারে উৎপন্ন করে, কেহ কিছুই উৎপন্ন করে না, কিন্তু অন্যের পরিশ্রমের ফল ভোগ করে! সেইজন্য জনসমাজে এত অশান্তি। ভগবানের বিধি এই যে, কল্যাণকর কাজে মানুষ যে পরিমাণ পরিশ্রম করবে, সেই পরিমাণ সমাজের উন্নতি হবে। ঈশ্বর তাঁর কাজ করছেন। আমাদের মধ্যে যে শক্তি জ্ঞান মঙ্গল ভাব প্রেম ইত্যাদি দিয়েছেন, সে-সকল কাজে লাগাতে হবে, সে-সকল দিয়ে কল্যাণকর কাজ করতে হবে, তাঁর কাজে মানুষ তাঁর সঙ্গী হবে,—এই মহা অধিকার ঈশ্বর মানুষকে দিয়েছেন। এতেই পরিশ্রমের গৌরব।

শস্য উৎপন্ন করা, নানা প্রকার কাজের জিনিষ তৈরি করা, নানা স্থানে সে-সকল কেনাবেচার ব্যবস্থা করা,—ভাল জিনিষ ঠিক দামে, সহজে যাতে সকলে পায়, এরূপ ব্যবস্থা করা,—এ সকল বিষয়ে পরিশ্রম করা কল্যাণকর কাজ। মানুষের শরীর যাতে সুস্থ সবল হয়, আরাম পায়—তার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

কিন্তু মানুষ তো কেবল শরীর নয়। মানুষের মধ্যে যে আত্মা আছে তার বিকাশ, পুষ্টি ও তৃপ্তি যাতে হয়, তার জন্য পরিশ্রম করা, আরও বড় কর্ত্তব্য। শিক্ষক, ধর্ম্মপ্রচারক, কবি, লেখক, বক্তা, গায়ক, চিত্রকর সকলে নিজ নিজ পরিশ্রম দ্বারা মানুষের কল্যাণ সাধন করেন, যদি লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি থাকে, ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি থাকে।

কেবল পরিশ্রম করলেই কল্যাণ হয় না, দশ জনের মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রেখে পরিশ্রম করলে তা সার্থক। নতুবা পরিশ্রম ঘোর অনিষ্টের কারণ হয়। মদের দোকান পরিচালনে একজন খুব পরিশ্রম করতে পারে, তাতে জগতের ঘোর অকল্যাণ

হয়। বক্তা, লেখক, সংবাদপত্রপরিচালক যদি সত্য প্রেম পবিত্রতার অনুগত না হ'ন, তা হ'লে তাঁদের বক্তৃতা, পুস্তক এবং সংবাদপত্র দ্বারা জগতের অকল্যাণ হবে, অশান্তি বাড়্‌বে। ধর্ম্মপ্রচারক পর্য্যন্ত লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'য়ে পরিশ্রম কর্‌লে, মানুষের অকল্যাণই করেন। বড় বড় নাম, খুব হাঁকডাক—চারিদিকে বাহবা,—খুব পরিশ্রম—তাই যথেষ্ট নয়। কাজটা কল্যাণকর কি না, তা-ই প্রধান চিন্তার বিষয়। পরিশ্রম ধন্য, সার্থক, যদি মঙ্গল-সাধনের জন্য, সত্য ন্যায় শুদ্ধতার অনুগত হ'য়ে করা যায়। যে বক্তা বক্তৃতার দ্বারা মানুষের মনে দলাদলির ভাব জাগান, তাঁর চেয়ে, যে মুচী নীরবে নিজের কাজ যথাসাধ্য ঠিক মত করে, সে জগতের অনেক বেশী কল্যাণ করে। পরিশ্রম ধন্য, যদি লক্ষ্য ঠিক থাকে, যদি জগতের কল্যাণ উদ্দেশ্য করা হয়।

দ্বিতীয়তঃ, পরিশ্রম সার্থক হয়, যদি কাজ যথাযথ ভাবে, নিখুঁৎভাবে করা হয়। ইঞ্জিনিয়ার এবং মজুর ড্রেন নর্দ্দমা রাস্তা তৈরি করেন। এই কাজ ঠিক মত করার উপর হাজার হাজার লোকের স্বাস্থ্য, সুখ, শ্রী নির্ভর করে। পরিশ্রম করেছে, ড্রেন হয়েছে, রাস্তাও হয়েছে—কিন্তু ঠিক মত হয় নাই, তার ফলে কত লোক জ্বরে ভোগে, কত কষ্ট ভোগ করে। রাজ্য-শাসন, আইন-প্রণয়ন, রাস্তাঘাট তৈরি, শিক্ষাদান, ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালন, ধর্ম্মপ্রচার, হ'তে আরম্ভ ক'রে প্রত্যেকের প্রতিদিনের শত প্রকার ছোট বড় কাজে পরিশ্রম,—এ সকলেই মানুষের সঙ্গে এবং ঈশ্বরের সঙ্গে প্রত্যেকের যোগ আছে। ঈশ্বর প্রভু এবং মানুষ ভাইবোন। চালক ঈশ্বর, লক্ষ্য মানুষের কল্যাণ সাধন, উপায় যথাযথ পরিশ্রম। প্রকাশ্য পরিশ্রম হ'লেই বড় হয় না, ঘরের কোণে পরিশ্রম হ'লেই ছোট হয় না। ছোট বড় সব কাজই ঈশ্বরের কাজ। সেজন্য পরিশ্রম গৌরবের বিষয়।

সাধু নবদ্বীপচন্দ্র দাসের সঙ্গে—প্রচারে।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সময়টা গ্রীষ্মকাল। মধ্যাহ্নে প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপে কষ্ট অনুভব করিলেও, মনের প্রফুল্লতায় তাহা আর বিশেষ অনুভব করিতে পারিতাম না। মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যার সময় কোন চটিতে গাড়ী গিয়া দাঁড়াইত। নবদ্বীপচন্দ্র নিজে হাটে যাইতেন, এবং সামান্যরূপ রন্ধনের দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আনিতেন; এবং তৎপর নিজেই রন্ধন করিয়া আমাদিগকে খাওয়াইতেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, আমরা তাঁহাপেক্ষা বয়সে অনেক অল্প হইলেও, তিনি এ সকল কার্য্যে আমাদের সাহায্যলাভের প্রয়াসী হইতেন না—নিজে আমাদের পরিচর্য্যা করিয়া যেন তৃপ্তি লাভ করিতেন। আমরা যখন শালপাতায়, মোটা চেলের ভাত, বেগুণের ঝোল ও অম্বল খাইতাম, তখন ত উহা আমার নিকট অতি সুমিষ্ট বলিয়াই বোধ হইত। এইরূপে আমরা চারিদিকের পাহাড়, জঙ্গল ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জল-স্রোতের ধারা দেখিতে দেখিতে, এবং বিবিধ হিতকর প্রসঙ্গে সময় অতিবাহিত করিয়া, নীলাচলে উপস্থিত হইলাম। এখানে তৎকালীন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসাবাটীতে আমরা উঠিলাম। ইনি আমাদের সুপরিচিত পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় (Dr. P. Chatterjee) মহাশয়ের পিতা। প্রভাত বাবু ব্রাহ্মসমাজের সহিত সাক্ষাৎ ভাবে যোগ না রাখিলেও, একজন সহানুভূতিকারী ছিলেন। তাঁহার ঐ বাসাবাটী সাগরের প্রায় অতি নিকটেই অবস্থিত; নীলাম্বুর ক্রীড়া এখান হইতে বেশ দেখা যাইত। আমাদের প্রতি সে সময় আতিথ্য-সৎকারে কোন পরিবারেরই কোনরূপ অযত্ন দেখি নাই। এখানেও প্রভাত বাবুর কোন যত্নেরই ত্রুটি নাই; পরন্তু তিনি কোর্ট হইতে আসিয়া সদালাপে ও সৎপ্রসঙ্গে অধিকাংশ সময়ই ক্ষেপণ করিতেন; আর, তাঁহার মধুর ব্যবহারে আমরা সকলেই বড় সুখানুভব করিতাম। আমরা তাঁহার বাসায় যে কেবল কথোপকথনেই সময় অতিবাহিত করিতাম, তাহা নহে; অনেক সময় উপাসনা হইত। নবদ্বীপচন্দ্র ও আমি উভয়েই এই কার্য্য সমাধা করিতাম। কিন্তু সাধারণ লোক ও পাণ্ডাদিগের মধ্যে কিছু বলিবার জন্য প্রভাত বাবু আমায় অনুরোধ করিতেন। আমি তাহা পালন করিয়াছিলাম। একদিন একটি সভাতে আমি কিছু বলি, তাহাতে একটি ধনী পাণ্ডা বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। মানুষ ধর্ম্মের তত্ত্ব কিছু বুঝিলে গোঁড়ামি পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

পুরীর সাগরোপকূলে ভারতের বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও ধর্ম্মসংস্কারকদিগের স্মৃতির ও কার্য্যের চিহ্নস্বরূপ অনেক আশ্রম প্রতিষ্ঠিত আছে। একদিন আহারান্তে মধ্যাহ্নকালে, নবদ্বীপচন্দ্র আমায় বলিলেন,—"চল, আশ্রম দেখিতে যাই।' তথাকার সাগরতটে যে সাধুদিগের আশ্রম আছে, ইহার পূর্ব্বে তাহা শুনিয়াছিলাম কি না, ঠিক মনে নাই। আমার যৌবনকালে, [illegible] ও প্রতীচ্যের ধর্ম্মসংস্কারক ও ভক্তদিগের জীবনচরিত পড়িতে বড়ই ভালবাসিতাম; তাই নবদ্বীপচন্দ্রের বাক্যে তখনই প্রস্তুত হইয়া রবিকরোদ্দীপ্ত সাগরের উপকূল দিয়া চলিতে লাগিলাম। সত্যই বহু আশ্রমে সাগর-তট শোভিত। নানকপন্থিদিগের মঠ, শঙ্কর-মঠ, চৈতন্য-মঠ ও অন্যবিধ মঠ। আমরা সকল মঠই কয়েক দিনে পরিদর্শন করি ও মঠাধ্যক্ষদিগের সঙ্গে তাঁহাদের স্ব স্ব ধর্ম্মমত লইয়া আলোচনা করি। গুরু নানকের মঠে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, একটি বৃদ্ধা সুন্দরী নারী, ফুলের মালা গাঁথিতেছেন। এক অতি বৃদ্ধ একটি গৃহের সম্মুখে উপবিষ্ট, গৃহাভ্যন্তরে বেদীর উপর বস্ত্রাবৃত "গ্রন্থজী"। এই গ্রন্থজীকে ফুলের মালার দ্বারা, সুশোভিত করা হয়, ও তাঁহাকে দীপালোকের দ্বারা আরতি করা হয়। মঠাধ্যক্ষের সঙ্গে আমরা কিয়ৎক্ষণ ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। বলিলাম,—গুরু নানক একেশ্বরবাদ ঘোষণা করিয়াছেন, তবে আপনারা কেন বিশেষ এক ধর্ম্মগ্রন্থকে এবম্প্রকার উপাস্য দেবতার ন্যায় করিয়া, তাঁহার পূজা করিয়া

থাকেন? বৃদ্ধ আমাদের প্রশ্নে অতি আনন্দের সহিত তাহার উত্তর দিলেন। মর্ম্ম এই মনে পড়ে, তিনি একেশ্বর-বাদের প্রতি দৃঢ়তর আস্থা স্থাপন করিয়া বলিলেন, ঐরূপ করাতে কোন ক্ষতি নাই; "গ্রন্থজী" দেবতা নহেন, তবে উহা গুরু নানকজীর বাক্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শনের একটা চিহ্ন মাত্র। ঐরূপ উক্তির মধ্যে যে কিছু সত্য নাই, তাহা একেবারেই বলা যাইতে পারে না। মহামানবদিগের সকল বিষয়ই মানব অতি শ্রদ্ধার সহিত রক্ষণ করিয়া থাকে; তবে ঐ শ্রদ্ধাটা সময়ে সময়ে অতিরিক্ত মাত্রায় উপস্থিত হইয়া, অবতারবাদ বা মহাপুরুষবাদে গিয়াই দণ্ডায়মান হয়। যাহা হউক, নানক-মঠের বাবাজী অবশেষে আমাদের পরিচয়ে জানিলেন যে, আমরা ব্রাহ্মসমাজের লোক। আমরাও এই সুযোগে আমাদের সমাজের ধর্ম্মমতাদি বিষয়ে কিছু উল্লেখ করিয়া একটু সুখী হইলাম। গুরু নানকের ঐ শিষ্যও তাহাতে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

এখন শঙ্করাচার্য্যের মঠে গমন করিলাম। এখানেও একজন বৃদ্ধ মঠাধ্যক্ষ। তাঁহার সহিতও আমাদের কথোপকথন হইল। শঙ্কর অদ্বৈতবাদী ও ঘোর তার্কিক ছিলেন—তিনি জ্ঞান-পথাবলম্বী ছিলেন। যদিও স্বর্গীয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়, তাঁহার কবিতার এক স্থলে, শঙ্করাচার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহার ভয়ে নাস্তিকেরা ত্রাসিত হইত; কিন্তু তাহা হইলেও ভারতীয় অদ্বৈতবাদের এই পথপ্রদর্শকের শিষ্যেরা জীবনে বা কার্য্যে ভগবদ্-বিশ্বাসের বা ভক্তির কোন পরিচয় প্রদান করেন না—এমন শুনা গিয়াছে, যে তাঁহারা একেশ্বরবাদীদিগের উপাসনা বিদ্রূপাত্মক ভাবেই দর্শন করিয়া থাকেন। আমরা উল্লিখিত শঙ্করমঠে গমন করিয়া, নানক-পন্থিদিগের মঠে যেরূপ একটা তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলাম, এখানে সেরূপ করিতে ততটা সমর্থ হইয়াছিলাম বলিয়া মনে হইতেছে না; এখানে শঙ্করমঠের বাবাজী যেন একটু যুক্তি তর্কেরই প্রাধান্য দেখাইতে লাগিলেন—ভগবদ্-ভক্তির মিষ্টতা লাভ করিতে পারিলাম না।

এইবার আর এক মঠ। এটি প্রেমিকচূড়ামণি শ্রীচৈতন্যের মঠ,—গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের মঠ! গৌর একেশ্বর-বাদী ছিলেন না সত্য, কিন্তু তাঁহার ভগবদ্-ভক্তি সকল সম্প্রদায়েরই অনুকরণীয়। বহু দিন পূর্ব্বে পণ্ডিতাগ্রগণ্য ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়, প্যারিসে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কোন সভার বিশেষ অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য আহূত হন। ঐ সভায় তিনি যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহা তৎপূর্ব্বেই এখানে মুদ্রিত হয়। সেখানি একটা খুব বড় রকমেরই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধের বিষয়—"Vaishnavism and Christianity, Compared." ঐ [illegible] গুতপ্রবর তাহাতে এক স্থানে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার তাৎপর্য্য আমার যতটুকু স্মরণ আছে তাহা এই, খৃষ্টধর্ম্ম ঈশ্বরের পিতৃত্ব-ভাব প্রচার করিয়াছে, কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্ম মাধুর্য্যের কথা ঘোষণা করিয়াছে,—মধুরভাবে ভগবানের পূজা করিতে বলিয়াছে। প্রতীচ্য এই ভাব গ্রহণ করিলে, ধর্ম্মের মিষ্টতা লাভ করিতে সমর্থ হইবে, ইত্যাদি।

আমরা পুরীর সাগর-তটের ঐ বৈষ্ণবদিগের আখড়ায় গমন করিয়া বড়ই সুখী হইলাম। আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ নবদ্বীপচন্দ্রের ভাবটা যেন এখানে কিছু উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িল; তিনি খুব গোঁড়া, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক, তাহা জানি,—ব্রাহ্মধর্ম্মকে জীবনে অক্ষুণ্ণ রূপে রক্ষা করিবার জন্য তিনি সততই ব্যগ্র, তাহাও আমার জানিবার বাকী ছিল না; কিন্তু তা' বলিলে কি হয়, নবদ্বীপ বৈষ্ণববংশসম্ভূত; তাহার প্রভাব একেবারে যাইবার নহে; তাহার উপর তিনি প্রেমিক ও ভক্তিমান। আমি শাক্ত বংশের ছেলে; কিন্তু বহুদিন হইতে নবদ্বীপের নিমাই পণ্ডিতের জীবনে ভক্তি-প্রবণতার বিষয় পাঠ করিয়া, মনটা বৈষ্ণবভাবাপন্নই হইয়া পড়িয়াছিল; তাই আজ উভয়েই ঐ মঠে গিয়া বড়ই তৃপ্তি অনুভব করিতে লাগিলাম। আখড়াবাসী বৈষ্ণবেরা আসিয়া আমাদের সঙ্গে যখন কথা কহিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদের ব্যবহারে ও কথার মিষ্টতায় আমরা বড়ই তৃপ্তি লাভ করিতে লাগিলাম। গৌরের মধুর ভক্তিলীলা ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া, তাঁহারা যে আমাদের প্রাণে অমৃত বর্ষণ করিতে লাগিলেন, কেবল তাহাই নহে; তৎসঙ্গে তাঁহাদিগের নিকট হইতে আমরা কিছু কিছু নূতন ঘটনার বিষয়েও পরিচিত হইতে লাগিলাম। একজন বলিলেন, "মহাপ্রভু যখন গোপীনাথ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হইয়া যান, তখন গদাধর গোস্বামী একখণ্ড খোলাকুঁচি লইয়া এই বালুর উপর (আমরা সাগর-তটের বালুর উপরই বসিয়াছি) লিখিলেন,—

"কি কহিব কোথা যা'ব বাক্য নাহি সরে।
গোরাচাঁদ হারাইলাম, গোপীনাথের ঘরে।"

চৈতন্য ভাবাবেগে নীলাম্বুতে ঝম্প প্রদান করিয়াই মানব-চক্ষুর অগোচর হইয়া পড়েন, প্রামাণ্য বৈষ্ণবগ্রন্থাদিতে আমরা ইহারই পরিচয় লাভ করিয়া থাকি। সে যাহাই হউক, গদাধর যখন অশ্রুসিক্ত নয়নে বালুর উপর ঐ কবিতাটি লিখিয়াছিলেন, তখন চৈতন্যবিরহে তাঁহার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিলাম; এবং আমরাও এই সময়, সেই মহাপুরুষের তিরোভাবের কথা স্মরণ করিয়া, হৃদয়ে ব্যথাও পাইয়াছিলাম। আমাদের নবদ্বীপচন্দ্র তখন ভাবে গদগদ হইয়া পড়িলেন; তাঁহার বদনমণ্ডল বিমর্ষভাব ধারণ করিল; চক্ষু জলসিক্ত হইল, আর এক অব্যক্ত দুঃখের শব্দ তাঁহার কণ্ঠ হইতে বহির্গত হইতে লাগিল—যেন গদাধরের মর্ম্মবেদনা, তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন। আজ প্রায় পাঁচ শত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ভাবিলে অবাক হইতে হয়, ভক্তির কি অপূর্ব্ব মোহিনী শক্তি; ভগবৎ প্রেমের কি অপূর্ব্ব মাধুর্য্য!

তাঁহাদিগের সঙ্গে ঐরূপ প্রসঙ্গের পর তাঁহারা চৈতন্যের কোন কোন দ্রব্য দেখাইলেন, যথা, তাঁহার গাত্রের ছিন্ন কন্থা ও খড়ম ইত্যাদি। আমরা তাঁহার ছিন্ন কন্থার অস্তি

সামান্য মাত্র অংশ গ্রহণ করি। নবদ্বীপচন্দ্র উহা আমাকে সযতনে রক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু, এত সামান্য যে তখন উহা স্থায়ীরূপে রক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই।

আমরা চৈতন্য-মঠ পরিত্যাগ করিয়া সাগরের উপকূল দিয়া বাসার দিকে প্রত্যাগমন করিলাম। মধ্যাহ্ন সূর্য্য তখন পশ্চিম দিকেই একবারে হেলিয়া পড়িয়াছে। আমরা চলিতে লাগিলাম, কিন্তু উভয়েই নীরব; কে যেন বাক্য আমাদের হরিয়া নিয়াছে। অবশেষে বাসায় ফিরিলাম। সে-দিনকার ঐ ঘটনা যখনই স্মৃতিপথে উদিত হয়, তখনই যেন অজ্ঞাতসারে একটা স্নিগ্ধকর মধুর বায়ু আমার প্রাণের উপর দিয়া বহিয়া যায়। আর এক কথা, যদি সে দিন ঐ স্থানে নবদ্বীপের ন্যায় সাধু ও ভক্তিপ্রাণ সঙ্গী না হইত, তাহা হইলে, কি আমি ঐ সুখ অনুভব করিতে পারিতাম?

আমরা ঐ সময় উড়িষ্যার বিশেষ বিশেষ স্থান ও তথাকার কীর্ত্তিও দর্শন করি। তন্মধ্যে খণ্ড-গিরির বিষয়ে দুই এক ছত্র মাত্র লিখিতেছি। একদিন উহা দর্শনের জন্য বহির্গত হইয়া সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বেই তথায় উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, বৃক্ষলতাবিহীন একটা প্রকাণ্ড পর্ব্বত; এবং উহার গাত্রের চারিদিকে শত শত গহ্বরে পূর্ণ। এই গহ্বরগুলি বেশ প্রশস্ত। উহার ভিতর একজন লোক বেশ বসিতে পারে, বা কোন প্রকারে শয়নও করিতে পারে। ইহাই খণ্ডগিরি নামে খ্যাত। পাহাড়ের উপরে একটা দিকে প্রশস্ত ছাদের ন্যায় একটা স্থান রহিয়াছে। এই গিরিগাত্রে খোদিত গহ্বরে বৌদ্ধ শ্রমণেরা বাস করিতেন, এবং সন্ধ্যার সময় পর্ব্বতোপরি ঐ প্রশস্ত ছাদের ন্যায় স্থানে বসিয়া, শুভ চিন্তায় রত হইতেন। যতদূর আমার স্মরণ হইতেছে, পর্ব্বতগাত্রের গহ্বরে প্রায় সাত শত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বাস করিতেন। আর উল্লিখিত পর্ব্বতের পাথরসকল সমতল করিয়া যে একটা প্রকাণ্ড যায়গা প্রস্তুত করা হইয়াছিল, সেখানে সাত শত শ্রমণ বসিয়া যখন, "লোকের দুঃখ নিবারিত হউক," "সকলে সুখী হউক" ইত্যাদি শুভ চিন্তায় রত হইতেন, তখন কি মনোহর দৃশ্যই হইত! অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁহার সুবিখ্যাত "ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়" নামক গ্রন্থে বৌদ্ধ শ্রমণদিগের ঐরূপ শুভ চিন্তার বিষয় উল্লেখে বলিয়াছেন—যিনি ঐরূপ শুভ চিন্তা প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তিনি নরলোকের অতীত। ঐ প্রসিদ্ধ লেখক গৌতম বুদ্ধকেই লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছেন। খণ্ড গিরির ঐ সকল ব্যাপার দেখিতে দেখিতে নবদ্বীপচন্দ্রের ও আমার মন এক অপূর্ব্ব ভাবেই পূর্ণ হইয়া পড়ে। এখানে বলা প্রয়োজন, নবদ্বীপচন্দ্রের ন্যায় ধার্ম্মিক ও ভাবগ্রাহী ব্যক্তির সঙ্গে থাকিয়াই আমি ঐ অতীত বৌদ্ধ কীর্ত্তির সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য যেন বিশেষরূপেই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।

আমরা উড়িষ্যায় নানা স্থানে প্রচার করিয়া, এবং ঐতিহাসিক বিবিধ স্থান পরিদর্শন করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করি। ভক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাসের সঙ্গে উড়িষ্যা ভ্রমণ আমার জীবনের একটা অতীত সুখকর বিষয়রূপে আমার স্মৃতিপথে চিরদিনই বিরাজ করিবে।

এখন বিষয়ের আর একটা দিকে একটু উপস্থিত হইলাম। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ প্রচারক মহাশয়েরা একবার স্থির করিলেন যে, ভগবদ্ শক্তি লাভ করিবার জন্য, আমাদের একবার নির্জ্জন বাসের আবশ্যক। সেই অনুসারে আমরা অনেকেই খাসিয়াং (দার্জ্জিলিং) যাত্রা করি। এখানে পর্ব্বতের বক্ষে একটি বাটী ভাড়া করিয়া আমরা বাস করি। সেখানে অবস্থানকালীন আমাদের দৈনিক কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারিত হইল। এখানে এ প্রসঙ্গের আর অধিক উল্লেখ করিব না। শাস্ত্রী মহাশয়, তাঁহার ইংরাজীতে লিখিত ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তে এ বিষয়ের একটা বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। প্রভাতে আমরা কিছু জলযোগান্তে বাসা ছাড়িয়া, যাহার যে স্থানে ইচ্ছা বসিয়া নির্জ্জন চিন্তা ও পাঠাদি করিতাম। শাস্ত্রী মহাশয়, আমাদের বাসার নিকটেই একটা প্রস্রবণের নিকট বসিয়া দীর্ঘ সময় ক্ষেপণ করিতেন। পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় পাহাড়ের অন্য কোন প্রদেশে গমন করিতেন। নবদ্বীপচন্দ্রের আমি বিশেষ সঙ্গী, তাহা আর অধিক বলিতে হইবে না। আমি তাঁহার সঙ্গে কোন একটা পর্ব্বতের খুব উচ্চতর শিখরে আরোহণ করিয়া, সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যপূর্ণ নির্জ্জন প্রদেশে একটা প্রকাণ্ড শিলাখণ্ডের উপর উপবেশন করিতাম। এখানে হইতে কাঞ্চনজঙ্ঘার অপরূপ সৌন্দর্য্য আমাদের নয়নপথে নিপতিত হইত; প্রভাতের বিমল সূর্য্যকিরণ ধবল তুষাররাশির উপর নিপতিত হইয়া, যে শোভা প্রকাশ করিত, তাহা অতি বড় চিত্রকরও বোধ হয়, যথাযথ চিত্র করিতে সমর্থ হয় না। এই মনোহর স্থানে যাইবার সময় আমি সঙ্গে একখানি ছোট পুস্তক লইতাম। সেখানি "Imitation of Christ". এই বইখানির আর পরিচয়ের আবশ্যক নাই। খৃষ্টীয় জগতে 'বাইবেল' গ্রন্থের পরেই এই উপাদেয় পুস্তকখানি অসংখ্য নরনারীর ধর্ম্মজীবনের উৎকর্ষ সাধন কল্পে বিশেষ সহায়তাই প্রদান করিয়াছে। এই বইখানি সমগ্র নরনারীর অধ্যাত্ম জীবন লাভের পক্ষে পরম সহায়। আমাদের ব্রাহ্মসমাজেও ইহার আদর সামান্য নহে। আমি এই হিমালয়ের শিখরে উহা পাঠ করিতাম, এবং তাহার বাঙ্গালা তরজমা করিয়া, নবদ্বীপচন্দ্রকে শুনাইতাম। তিনি স্থির হইয়া, গম্ভীরভাবে এই অমিয়-মাখা কথাগুলি শ্রবণ করিতেন; আর তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া বোধ হইত যেন, সেগুলি, তাঁহার হৃদয়ের মর্ম্মস্থান স্পর্শ করিতেছে। এইরূপ এক সময়ে পড়িলাম,—

"Speak Lord, for thy servant heareth."

"ভগবন্! তোমার দাস, তোমার বাণী শ্রবণের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে।" যাই এই বচনটি পাঠ করিলাম, তিনি ভাবে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, চক্ষু নীমিলিত করিলেন। আমি মুখের দিকে তাকাইলাম,—বহুক্ষণ এই ভাবে কাটিয়া গেল। আমি পুস্তকখানি হস্তে লইয়া নীরবেই বসিয়া রহিলাম। অনেকক্ষণ পরে চক্ষু

খুলিলেন। তৎপর নীচে নামিতে লাগিলাম; আর সেই সময় কি যেন বলিতে লাগিলেন, তাহা ঠিক স্মরণ নাই; তবে ভগবান যে মানব অন্তরে তাঁহার বাণী প্রকাশ করেন, এই কথাই বলিতে লাগিলেন। নবদ্বীপচন্দ্রের ন্যায় সাধুপুরুষ অন্তরে ভগবদ্‌বাণী শ্রবণের উপযুক্ত, ইহাই আমার ধারণা জন্মিল। আমাদের খার্সিয়াং অবস্থানের বিষয় আর অধিক নহে। তবে, এই প্রসঙ্গে আর সামান্য কিছু বলিতে হয়। এখানে অবস্থান কালে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়, দার্জ্জিলিং সমাজ হইতে আহূত হন, তথায় সমাজের কিছু কার্য্য করিবার জন্য। তিনি তথায় একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি ফিরিয়া আসিলে, সমাজ দয়া করিয়া আমার ন্যায় সামান্য লোককেও তথায় আহ্বান করেন। আমি তাঁহাদের ইচ্ছা পূর্ণ করি। তথায় আমিও একদিন সমাজের কার্য্য করি ও একটি বক্তৃতা প্রদান করি।

আমরা এই নির্জ্জনবাসে, আত্মার তৃপ্তি সাধন করিয়া, কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করি। সময়ে সময়ে এইরূপ সৎসঙ্গে নির্জ্জনবাস সকলেরই পক্ষে প্রয়োজন; বিশেষতঃ, ধর্ম্মপ্রচারকদিগের পক্ষে।

তখন হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের মহা ধুম পড়িয়া গিয়াছে। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি প্রমুখ হিন্দুধর্ম্ম প্রচারকেরা বঙ্গ দেশের চারিদিকে ঐ আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। আন্দোলনের উদ্দেশ্য যে প্রকারেরই হউক, ব্রাহ্মসমাজ দেশের অনিষ্ট সাধন করিতেছে, প্রচারকদিগের বক্তৃতাদির মধ্যে ঐরূপ একটা ধুয়া সর্ব্বদাই দেখা যাইত। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দুই জন সুযোগ্য প্রচারক ও বক্তা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ঐ আন্দোলনের আবেগময় স্রোতের মুখে দণ্ডায়মান হইয়া, উহার গতি বন্ধ করিবার জন্য প্রয়াসী হইয়াছিলেন। এই ধর্ম্মবীরদ্বয় বিশেষরূপ সফলতাও লাভ করিয়াছিলেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্থানীয় থিয়েটার হলে—"সাকার ও নিরাকার উপাসনা" (ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা) ও শাস্ত্রী মহাশয়ের "জাতিভেদ" ঐ প্রতিবাদের বিশেষ ফলস্বরূপ এখনও প্রকাশিত পুস্তকরূপে সাক্ষ্যদান করিতেছে। আমাদের দেশের লোকের জানা দরকার, আজ রাজনৈতিক আন্দোলনের দিনে লোকে যে সকল সামাজিক সমস্যা লইয়া আন্দোলন করিতেছেন, ব্রাহ্মসমাজ বহুদিন পূর্ব্বে সে সকল সমস্যা সমাধান করিয়া, কার্য্যে তাঁহার সাক্ষ্য দান করিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশশিভূষণ বসু।

পরলোকগত গোবিন্দচন্দ্র দত্ত

(দৌহিত্র শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত।)

বাঙ্গলা ১২৬৫ সালের কার্ত্তিক মাসে, ইংরাজি ১৮৫৯ খৃঃ অব্দের অক্টোবর মাসে মাতামহ মহাশয় মেদিনীপুর নগরের পাহাড়ীপুর পল্লীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম মধুসূদন দত্ত। তিনি পুত্রের বহু পূর্ব্বে পরলোকযাত্রা করিয়াছেন। মাতামহ মহাশয় তাঁহার পিতার একমাত্র পুত্র ছিলেন।

উক্ত পল্লীতে এক মুসলমান গুরুমহাশয়ের পাঠশালা ছিল। ঐ পাঠশালায় মাতামহ মহাশয়ের বিদ্যারম্ভ হয়। বঙ্গ দেশের ইংরাজী-শিক্ষাপ্রাপ্ত অধিকাংশ যুবক তৎকালে মদ্য মাংসাসক্ত ও উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন। মাতামহ মহাশয়ের পিতা বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। এজন্য তিনি পুত্রকে ইংরাজী স্কুলে প্রবিষ্ট করাইতে প্রথমতঃ অনিচ্ছুক হইয়াছিলেন; কিন্তু ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিলে রাজসরকারে পদপ্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকায়, পুত্রের অর্থাগমের সুবিধার জন্য তিনি তাঁহাকে অত্র নগরস্থ ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি পুত্রকে এই সত্যপালনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন যে, পুত্র জীবনে মদ্য মাংস স্পর্শ করিতে পাইবে না। সৎপুত্র পিতার এই আদেশ সম্পূর্ণরূপে পালন করিয়াছিলেন। তিনি জীবনে কখনও মদ্য মাংস স্পর্শ করেন নাই। মাতামহ মহাশয় ইংরাজী বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলে, ঐ শ্রেণীর শিক্ষক স্বর্গীয় পূজ্যপাদ রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের কনিষ্ঠ সহোদর শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় অভয়চরণ বসুর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা জন্মে। তিনি মাতামহ মহাশয়কে শান্ত শিষ্ট ও অনুগত ছাত্র দেখিয়া, তাঁহাকে মেদিনীপুর ব্রহ্মমন্দিরে নিয়মিতরূপে যাইবার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনিও তাঁহার শিক্ষক মহাশয়ের আদেশ ও উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া বিশিষ্ট কারণ ব্যতীত অনুপস্থিত না থাকিয়া, আজীবন গুরুবাক্য পালন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর প্রায় এক মাস পূর্ব্বে, তিনি এক রাত্রিতে অপেক্ষাকৃত সুস্থ থাকায়, রুগ্নাবস্থায়ও সস্ত্রীক ব্রহ্মমন্দিরে যাইয়া উপাসনায় যোগ দিয়াছিলেন। মাতামহ মহাশয়ের পিতাকে বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত অনেকদিন সঞ্চিত অর্থেই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হওয়ায়, তাঁহার জীবনের শেষ অবস্থায় অর্থাভাব ঘটিয়াছিল। এজন্য পুত্রকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই স্কুল পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। অর্থোপার্জ্জন না করিলে সংসার চলিতেছে না দেখিয়া, তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর, তিনি স্থানীয় দেওয়ানী আদালতে পদপ্রার্থী হইয়া প্রথমতঃ নকলনবিশ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পরে ক্রমশঃ ঐ আদালতের রেকর্ড-কিপারের পদে পর্য্যন্ত উন্নীত হইয়াছিলেন।

তিনি যৎকালে পেন্‌সন্ গ্রহণ করেন, তৎকালে মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়াছিল। সাপ্তাহিক উপাসনা বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। ঐ সমাজের সভ্যগণের মধ্যে কতকগুলি সভ্য কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে যাওয়ায়, এবং কতকগুলি পরম পিতার আহ্বানে অমৃতধামে যাইতে বাধ্য হওয়ায়, সমাজে সভ্য ও উপাসক সংখ্যা বড়ই কমিয়া গিয়াছিল। কিন্তু মাতামহ মহাশয় এই প্রতিকূল অবস্থার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, ইতিপূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত থাকায়, নিজেই সম্পাদক, নিজেই আচার্য্য ও নিজেই অর্থসাহায্যকারী হইয়া ঝড়, বৃষ্টি ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করতঃ সমাজের সকল কার্য্য একাই নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

ভগবানের কৃপায় মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের এই দুর্দ্দিন কেবল মাতামহ মহাশয়ের সহায়তায় অন্তর্হিত হইল। সমাজের এইরূপ অবস্থা পুনরায় না আইসে, তজ্জন্য তিনি ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা এই সমাজে প্রদান জন্য তাঁহার সম্পাদিত উইলে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন।

মাতামহ মহাশয়ের বিবাহ এই নগরের তৎকালীন খ্যাত-নামা এক জমিদার পরিবারে ঘটিয়াছিল। তিনি শ্বশুরালয় হইতে অর্থসাহায্য প্রাপ্ত হওয়ায়, তাঁহার পত্নী শ্রীযুক্তা পতিত-পাবনী দত্তের নামে একটী স্বর্ণরৌপ্যের অলঙ্কারের দোকান এই নগরে স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার সাংসারিক অবস্থা সচ্ছল ছিল।

মাতামহ মহাশয়ের একটি পুত্র ও দুইটি কন্যা জন্মিয়াছিল। কিন্তু বিধাতার নির্দ্দেশে তাঁহার ঐ তিনটি সন্তানকে অল্প বয়সেই একে একে অমরধামে যাইবার ডাক আসিয়াছিল। এইরূপে তিনি তাঁহার সমস্ত সন্তানগুলি হারাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার দুই কন্যা ৫টি পুত্র ও ৪টি কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।

মাতামহ মহাশয় তাঁহার সমস্ত পুত্র কন্যা হইতে বঞ্চিত হওয়ায়, পারিবারিক প্রাচীন ডাক্তার পরলোকগত ভুবনেশ্বর মিত্র মহাশয় একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোবিন্দ! তুমি কয়েক বৎসরের মধ্যে একে একে তোমার সকল পুত্র কন্যা হারাইলে, কিন্তু তোমাকে বিষণ্ণ দেখিতে পাই না কেন?" তাহাতে তিনি সাহাস্য বদনে উত্তর করিলেন, "এইরূপ শোক তাপ নিবারণ উদ্দেশ্যেই উপায়স্বরূপ ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি। এই সংসার ঘোর পরিবর্ত্তনের স্থান। এখানকার ধন জন জলবিম্ববৎ অতিশয় চঞ্চল। হর্ষ, বিষাদ, মিলন, বিচ্ছেদ, জীবন মরণ অভিনয় এখানে সততই চলিতেছে। এক মাত্র সর্ব্বব্যাপী মহান্ প্রভু পরমেশ্বরের শরণ ব্যতীত কাহার সাধ্য এখানে মৃত্যুভয় ও শোক তাপ হইতে রক্ষা পায়? যাঁহারা তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহারাই তাঁহার কৃপায় অভয় প্রাপ্ত হয়েন, এবং ভগবান তাঁহার আনন্দস্বরূপও তাঁহাদের নিকট প্রকাশ করিয়া, তিনি স্বয়ং তাঁহাদের এক মাত্র প্রিয়জন ও প্রিয়বস্তু হইয়া উঠেন। ভগবান অজর অমর অবিনাশী ও নিত্য। সুতরাং ব্রহ্মের প্রিয়জন ও প্রিয়বস্তু নাশের বিন্দু মাত্র আশঙ্কারও সম্ভাবনা নাই। আমি তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়া তাঁহারই কৃপায় শোক তাপ হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছি, এবং কিছু কৃতকার্য্য হইয়াছি। অপর পক্ষে, পুত্র কন্যাগণকেও আমি অমর জ্ঞান করি। কারণ, দেহকে আমি জীবাত্মার অংশ মনে করি না। সুতরাং দেহ নাশে অবিনাশী জীবাত্মার নাশ হয় না। মানবগণ ভগবানের অজর অমর সেবক। তাঁহারা ভগবানের কার্য্য সম্পাদন জন্য কখনও ইহলোকে, কখনও অন্য লোকে বিচরণ করেন। সুতরাং এই দিক দিয়া দেখিলেও স্বজনগণ দেহান্তরিত হইলে শোক তাপের কোন কারণ নাই।" ডাক্তার মহাশয় ইহা শুনিয়া বলিলেন, "তোমার যদি এরূপ জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, এবং যদি এই অবস্থায় আসিতে সমর্থ হইয়াছ, তুমি ধন্য, তুমি প্রকৃত ব্রহ্মোপাসক। তুমি প্রকৃত ব্রাহ্ম। তুমি প্রকৃত ব্রাহ্মণ।" তাঁহার মহাশয়ও একেশ্বরবাদী ছিলেন। তিনি বিখ্যাত হিন্দু গুরু স্বর্গীয় ভোলাগিরির শিষ্য।

মাতামহ মহাশয় স্ত্রী জাতির হিতৈষী ছিলেন। তাঁহার পল্লীর সকল বালিকা যাহাতে লেখা পড়া শিখিতে পারে, এজন্য তিনি নিজ পল্লীতে একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, এবং ঐ প্রতিষ্ঠানেরও উন্নতিকল্পে তিনি তাঁহার সম্পাদিত উইলে ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা প্রদানের বিধান করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজ পল্লীতে আপন বাটীতে একটি প্রার্থনা-সমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ পল্লীর উৎসাহী ভক্তগণ কালগ্রাসে পতিত হওয়ায়, ঐ সমাজের এখন অস্তিত্ব নাই। মাতামহ মহাশয় স্বজন ও কুটুম্ববৎসল ছিলেন। তিনি অনেক-গুলি কুটুম্ব স্বজনের প্রতিপালক ছিলেন। মাতামহ মহাশয় অতিশয় সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। কোন নিরাশ্রয় বিধবা বা অসহায় ব্যক্তি বিপন্ন হইয়া বিপদের কথা তাঁহাকে জানাইলে, তাহাকে বিপদ হইতে উদ্ধারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন। তিনি প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি পালনে কখনও পশ্চাৎপদ হন নাই। তিনি ভগবানের নাম জপের অতিশয় পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা "দয়াল" নাম জপ করিতেন। তিনি বৈষ্ণবচূড়ামণি হরিদাসের ন্যায় অতি উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের গুণগান ও উপাসনা করিতেন। বৃদ্ধাবস্থায় এরূপ উচ্চরব করিতে কোন কোন বন্ধু নিষেধ করিলে তিনি বলিতেন, মনুষ্য জীবনের মহোপকারী অমৃতপ্রসূ ভগবৎ নাম উচ্চ রবে বদন ভ'রে না বলিলে কি মনের তৃপ্তি হয়? এই অবস্থায় মৃত্যু জীবনস্বরূপ। ইহাতে নিজের ও অন্যের উপকার সাধিত হয়।" ইহা ধর্ম্ম প্রচার বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন। "যায় শোক যায় তাপ, যায় হৃদয়ভার, সর্ব্ব সম্পদ তাহে মিলে যখন থাকি তাঁহার সাথ।" এই সংক্ষিপ্ত ভক্তবাণীতে, ব্রহ্মোপনিষদের সার মর্ম্ম ও ধর্ম্মসাধনের মহান উদ্দেশ্য ও অনন্ত ফলের কথা নিহিত আছে, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন। এ জন্য উপাসনা করিবার সময়, এই বাণীই তাঁহার উদ্বোধন-মন্ত্র ও এই বাণীই তাঁহার উপদেশ-মন্ত্র ছিল। উপাসনা-কালে এই ভক্ত বাণী উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিতে তিনি কখনও ভুলিতেন না।

দুই বৎসর পূর্ব্বে মাতামহ মহাশয় দুরন্ত হৃদ্‌রোগে ও তজ্জনিত শোথ রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। এই সুদীর্ঘ দুই বৎসরকাল ক্রমিক সুচিকিৎসা সত্ত্বেও বর্ত্তমান বাঙ্গালা ১৩৩৯ সাল ৩১শে শ্রাবণ, ইংরাজী ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে ১৬ই আগষ্ট মঙ্গলবার রাত্রি ২টার সময়, ৭৩ বৎসর বয়সে তিনি ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের মধুর আহ্বানে অনন্ত আনন্দধামে চলিয়া গিয়াছেন। তিনি ৫টী দৌহিত্র, ৪টী দৌহিত্রী এবং তাঁহার পত্নীকে ইহধামে রাখিয়া গিয়াছেন।

মাতামহ মহাশয় পরম পিতার আহ্বানে ইহলোকের কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া অমরধামে চলিয়া গেলেন। তিনি পশ্চাতে শরীরী আত্মজ পুত্র কন্যা রাখিয়া যাইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু রাখিয়া গিয়াছেন অশরীরী আত্মজ ভগবৎনিষ্ঠা, চরিত্রের দৃঢ়তা, দুঃস্থ ও নিরাশ্রয় জনের প্রতি ভালবাসা ও ধৈর্য্য প্রভৃতি

বিবিধ সদ্‌গুণ। তিনি তাঁহার বাস্তুবাটীতে কখন কোন পৌত্তলিক অনুষ্ঠান হইতে পারিবে না, এই আদেশ তাঁহার পত্নীকে পালন করিতে বলিয়া গিয়াছেন। আমি তাঁহার চরিতামৃত আস্বাদন উদ্দেশ্যে অতি গভীর শ্রদ্ধার সহিত আজ তাঁহার আত্মাকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিতেছি। পরম পিতার নিকট আন্তরিক প্রার্থনা এই যে, তিনি তাঁহার অমর আত্মার অনন্ত মঙ্গল ও অনন্ত উন্নতি সাধন করুন। আর রাজর্ষি, দেবর্ষি ও ভক্তজনগণের পরলোকগত আত্মার দ্বারা তাঁহাকে নিয়ত বেষ্টিত রাখুন, ও পবিত্র ব্রহ্মানন্দ অনন্তকাল উপভোগ করাইয়া তাঁহার আত্মাকে ধন্য ও কৃতার্থ করুন; এবং তাঁহার শোকার্ত্ত সহধর্ম্মিণী, দৌহিত্র, দৌহিত্রী, জামাতা, আত্মীয় ও বন্ধুগণের প্রাণে প্রচুর শান্তি বারি সেচন করিয়া সান্ত্বনা প্রদান করুন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ।

ব্রাহ্মসমাজ

মাঘোৎসব—প্রেমময়ের অপার করুণায় আমাদের প্রিয় মাঘোৎসব পুনরায় সমুপস্থিত। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে ত্র্যধিকশততম মাঘোৎসব সম্পন্ন করিবেন, এরূপ স্থির করিয়াছেন। আবশ্যক হইলে ইহার কিছু পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে। ব্যাকুল হৃদয় বিশ্বাসিগণের সম্মেলনের উপর উৎসবের সফলতা বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। তাই কার্য্যনির্ব্বাহক সভা উৎসবে যোগদান করিবার জন্য সকলকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিতেছেন।

১লা মাঘ, ১৪ই জানুয়ারী শনিবার—প্রাতে ব্রাহ্মপরিবারে ও ছাত্রছাত্রীভবনে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণার্থ উপাসনা ও প্রার্থনা সন্ধ্যায়—ঐ

২রা মাঘ, ১৫ই জানুয়ারী রবিবার—প্রাতে—ঐ। সন্ধ্যায়—উদ্বোধন, আচার্য্য - শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

৩রা মাঘ, ১৬ই জানুয়ারী সোমবার—প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত মথুরানাথ নন্দী, বি এ। সন্ধ্যায় বক্তৃতা—বক্তা শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বেদান্তবাগীশ, এম, এ।

৪ঠা মাঘ, ১৭ই জানুয়ারী মঙ্গলবার—প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র সোম। সন্ধ্যায় বক্তৃতা—বক্তা ডাঃ কালিদাস নাগ, এম, এ, ডি, লিট।

৫ই মাঘ, ১৮ই জানুয়ারী বুধবার—প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত। সন্ধ্যায়—সঙ্গত সভার উৎসব।

৬ই মাঘ ১৯শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার—মহর্ষি স্মৃতিদিবস—প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ; সন্ধ্যায় স্মৃতিসভা—সভাপতি স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায়। বক্তা—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, এম এ, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম এ, শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসু বি, এ।

৭ই মাঘ, ২০শে জানুয়ারী শুক্রবার—প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী, বি এ। সন্ধ্যায়—তত্ত্ববিদ্যা সভার উৎসব উপলক্ষে বক্তৃতা; বক্তা—পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, বিষয়—প্রেমালোকে ব্রহ্মলোক প্রকাশ।

৮ই মাঘ, ২১শে জানুয়ারী শনিবার—প্রাতে মহিলাদিগের উৎসব। পুরুষদিগের জন্য সিটিকলেজে উপাসনা সন্ধ্যায়—বার্ষিক সভা (কেবল সভ্যদিগের জন্য)।

৯ই মাঘ, ২০শে জানুয়ারী রবিবার প্রাতে যুবকদিগের উৎসব; মধ্যাহ্নে—যুবকদিগের আলোচনা সভা; অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায়—বরাহনগর শ্রমজীবিগণের নগর কীর্ত্তন। সন্ধ্যায় উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য।

১০ই মাঘ, ২৩শে জানুয়ারী সোমবার—প্রাতে কলিকাতা উপাসকমণ্ডলীর উৎসব। মধ্যাহ্নে নবদ্বীপচন্দ্র স্মৃতিসভা; সভাপতি—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র। বক্তা—শ্রীযুক্ত সরোজেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্তা অবন্তী ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় নগর কীর্ত্তন। সন্ধ্যায়—উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র।

১১ই মাঘ, ২৪শে জানুয়ারী মঙ্গলবার **সমস্তদিনব্যাপী উৎসব** প্রত্যূষে—কীর্ত্তন। প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। মধ্যাহ্নে উপাসনা—আচার্য্য শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু। তৎপরে পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায় শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রভৃতি; অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় ইংরাজীতে উপাসনা, আচার্য্য—শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায়; সন্ধ্যায় উপাসনা, আচার্য্য পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ।

১২ই মাঘ, ২৫শে জানুয়ারী বুধবার—প্রাতে সাধনাশ্রমের উৎসব। মধ্যাহ্নে প্রচার বিষয়ে আলোচনা, সভাপতি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত আলোচনা উত্থাপন করিবেন। সন্ধ্যায় বক্তৃতা—বক্তা শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ, এম, এ।

১৩ই মাঘ, ২৬শে জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার—প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু। অপরাহ্ণ ৩টায় বালক-বালিকা সম্মিলন। সন্ধ্যায়—ছাত্রসমাজের উৎসব উপলক্ষে বক্তৃতা। বক্তা ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র, এম বি।

১৪ই মাঘ, ২৭শে জানুয়ারী শুক্রবার—প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী বি, এ। অপরাহ্ণ ৪টায় মেরীকার্পেন্টার হলে রবিবাসরীয় নীতি বিদ্যালয়ের উৎসব। সন্ধ্যায় উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায়।

১৫ই মাঘ, ২৮শে জানুয়ারী শনিবার—প্রাতে উপাসনা—অপরাহ্ণ—লাইব্রেরীর দ্বারোদ্ঘাটন। সন্ধ্যায় ইংরাজীতে উপাসনা, আচার্য্য পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ।

১৬ই মাঘ, ২৯শে জানুয়ারী রবিবার—প্রাতে উপাসনা আচার্য্য শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন; সন্ধ্যায় শান্তিবাচন—আচার্য্য শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ, এম এ।

উপাসনাদি সমস্ত কার্য্য প্রাতে ৭॰ ঘটিকায় ও সন্ধ্যায় ৬॥ ঘটিকায় আরম্ভ হইবে।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ২৩শে ডিসেম্বর, পূর্ব্বাহ্ণ ৮-১০ ঘটিকার সময়, কলিকাতা নগরীতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রচারক ও ভূতপূর্ব্ব সভাপতি হেমচন্দ্র সরকার ৫৮ বৎসর বয়সে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া অমরলোকে গিয়াছেন। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় সকলে মন্দির-প্রাঙ্গণে সমবেত হইলে, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী উপাসনা করেন। অনন্তর শোভাযাত্রা করিয়া সংকীর্ত্তন করিতে করিতে মৃত দেহ শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয়। বহু পুরুষ ও নারী সঙ্গে গিয়াছিলেন। সেখানে শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় প্রার্থনা করিলে পর দেহ অগ্নিসাৎ করা হয়। তাঁহার ন্যায় অক্লান্তকর্ম্মা উৎসাহশীল আত্মত্যাগী সেবকের অভাবে ব্রাহ্মসমাজের যে গুরুতর ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে। তিনি রুগ্ন দেহ লইয়াও যে অসাধ্যসাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহা নিতান্তই আশ্চর্য্যজনক। ব্রাহ্মসমাজের সেবাতে তিনি শেষ রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত দান করিয়া গেলেন। তাঁহার এই মহৎ দৃষ্টান্ত আমাদের মধ্যে উজ্জ্বল পথপ্রদর্শকরূপে জীবিত থাকুক।

বিগত ২৭শে ডিসেম্বর, পূর্ব্বাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময়, কলিকাতা নগরীতে একনিষ্ঠ কর্ম্মী ললিতমোহন দাস অস্ত্রোপচারের গৌণ ফল হেতু হঠাৎ ৬৫ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। হাসপাতাল হইতে মৃত দেহ সাধনাশ্রমে আনিয়া রাখা হয়। অপরাহ্ণে সকলে সমবেত হইলে, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রার্থনা করেন। অনন্তর শোভাযাত্রা করিয়া সংকীর্ত্তন করিতে করিতে শব শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয়। বহু নরনারী সঙ্গে গিয়াছিলেন। সেখানে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ প্রার্থনা করিলে পর দেহ অগ্নিসাৎ করা হয়। তিনি দীর্ঘকাল নানারূপে অতি নিষ্ঠার সহিত ব্রাহ্মসমাজের ও দেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন। নিয়মিত লেখক, সহকারী সম্পাদক, ও সম্পাদকরূপে তিনি বহু বৎসর তত্ত্বকৌমুদীর জন্য বিশেষভাবে খাটিয়াছেন। বহু পরিবারের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ বন্ধুতা সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। তিনি যে পরলোকগমনের পূর্ব্বে শাস্ত্রী মহাশয়ের তৈলচিত্র উন্মোচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন ও 'ধর্ম্মসাধন' নামক পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছেন, ইহা বিশেষ আনন্দের বিষয়। তাঁহার স্থানও সহজে পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। মঙ্গলবিধাতা আমাদের মধ্য হইতে এরূপ শ্রেণীর নূতন নূতন লোক গড়িয়া তুলুন।

বিগত ১১ই ডিসেম্বর দ্বারহাটা গ্রামে শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর সাপুইর পুত্রের আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য ও শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দে সঙ্গীতাদি করেন।

বিগত ১৭ই ডিসেম্বর জয়নগর গ্রামে শ্রীযুক্ত শ্রীমন্ত দের কনিষ্ঠা কন্যা প্রকৃতি ৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছে। বিগত ২৫শে ডিসেম্বর তাহার আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। পিতা স্বয়ং উপাসনার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চিরশান্তিতে রাখুন এবং আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবগণের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

নামকরণ—বিগত ২রা কার্ত্তিক শুভড্যা গ্রামে শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র রায়ের গৃহে তাঁহার দুই ভ্রাতুষ্পুত্রের দুইটী শিশুপুত্রের নামকরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। গ্রামের বহু নরনারী এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। শিশুদ্বয়ের নাম জ্যোতিভূষণ এবং প্রীতিভূষণ রাখা হইয়াছে।

বিগত ১৮ই নবেম্বর ঢাকানগরীতে অশ্বিনীকুমার বসুর গৃহে তাঁহার ২য় পুত্রের ১ম পুত্রের নামকরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য এবং অশ্বিনী বাবু প্রার্থনা করেন। মঙ্গল বিধাতা শিশুদিগের সহায় হউন।

শুভ বিবাহ—বিগত ২৭শে অগ্রহায়ণ ঢাকানগরীতে শ্রীযুক্ত রজনীনাথ সরকারের পুত্র শ্রীমান সুললিত সরকারের সহিত স্বর্গীয় সীতাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের ২য়া কন্যা কল্যাণীয়া কুমারী শোভনার শুভ বিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত অগ্রহায়ণ মাসে ঢাকানগরীতে পাবনা নিবাসী বাবু জ্যোতিষচন্দ্র চাকির সহিত শ্রীহট্ট নিবাসী পরলোকগত ভারতচন্দ্র চৌধুরীর কন্যা (অনাথাশ্রমে পালিতা) কল্যাণীয়া কুমারী কমলার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। রায় সাহেব সতীশচন্দ্র ঘোষ নবদম্পতিকে উপদেশচ্ছলে কয়েকটী কথা বলেন।

প্রেমময় পিতা নবদম্পতিদিগকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

দান—শ্রীযুক্তা সৌদামিনী সেন পুত্র সিদ্ধনাথের বিবাহ উপলক্ষে সাধারণ বিভাগে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন। এই দান সার্থক হউক ও নবদম্পতি কল্যাণ লাভ করুন।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাস খুল্লতাত গৌরমোহন দাসের বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে দুঃস্থ ব্রাহ্ম পরিবার ভাণ্ডারে ৫৲, শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র নাগ কন্যা অশোকার বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে ধুবড়ী ব্রাহ্মসমাজে ২৲, শ্রীযুক্ত জানকীনাথ সেন পুত্রের চতুর্থ বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে পুত্রের স্মৃতি ভাণ্ডারে ৫৲ দান করিয়াছেন। এই সমস্ত দান সার্থক হউক এবং পরলোকগত আত্মাসকল চিরশান্তি লাভ করুন।

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ—নিম্ন লিখিত প্রণালী মতে পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের ৮৬তম সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হয়। বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী উৎসবের কার্য্যের জন্য ঢাকায় থাকেন। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ মজুমদার ঢাকায় উপস্থিত ছিলেন বলিয়া উৎসবের কার্য্যে সাহায্য করিয়াছেন।

২০শে অগ্রহায়ণ সন্ধ্যায় উৎসবের উদ্বোধন—উপাসনায় শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। ২১শে অগ্রহায়ণ মন্দির-প্রতিষ্ঠা দিন—প্রাতের উপাসনায় শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত বিস্ময়চন্দ্র মজুমদার "দিন আগত এই, ভারত তবু কই?" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ২২শে অগ্রহায়ণ, প্রাতের উপাসনায় অমৃতবাবু উপাসনা করেন, সন্ধ্যায় মনোমোহন বাবু উপাসনা করেন। এই দিন উপাসকমণ্ডলী প্রতিষ্ঠার বিশেষ দিন। ২৩শে অগ্রহায়ণ ইষ্টবেঙ্গল স্কুল প্রতিষ্ঠার দিন—প্রাতে মনোমোহন বাবু আচার্য্য ছিলেন। অনেক শিক্ষক ও ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। সায়ংকালে বক্তৃতা সভায় মনোমোহন বাবু সভাপতির কার্য্য এবং অমৃত বাবু ও শ্রীযুক্ত অতুলকুমার সেন, "পূর্ণাঙ্গ ধর্ম্ম" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ২৪শে অগ্রহায়ণ প্রাতের উপাসনায় শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। সন্ধ্যায় মনোমোহন বাবু "ব্রাহ্মধর্ম্মের বাণী" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ২৫শে অগ্রহায়ণ প্রাতে শ্রীযুক্ত মথুরানাথ গুহ, এবং সন্ধ্যায় মনোমোহন বাবু আচার্য্যের কার্য্য করিলে উৎসব শেষ হয়।

উৎসবান্তে ২৬শে অগ্রহায়ণ সায়ংকালে ইষ্টবেঙ্গল ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগকে লইয়া একটী প্রীতি-সম্মিলন হয়। মনোমোহন বাবু সঙ্গীতান্তে প্রার্থনা করিয়া ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ও তাহার প্রতিকার বিষয়ে একটী আলোচনা উপস্থিত করেন। কেহ কেহ এই বিষয়ে কিছু বলেন। তৎপরে প্রীতিজলযোগ, আলাপ, প্রসঙ্গ ও সঙ্গীতান্তে কার্য্য শেষ হয়। এই সম্মিলনে শতাধিক নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল।

২৬শে নবেম্বর পূর্ব্ববাঙ্গালা ছাত্র সমাজের এক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী "বাঙ্গালা সাহিত্যে ব্রাহ্মসমাজের দান" বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন।

৪ঠা ডিসেম্বর সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ মজুমদার 'জীবন-পথের ভীষণ বাধা" বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন।

১৭ই ডিসেম্বর সুনীতি-সঙ্ঘের পক্ষ হইতে ব্রহ্মমন্দিরে মনোমোহন বাবু 'কোন্ পথে যাই?" বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন।

বাণীবন বালক-বিদ্যালয়—বাণীবন ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক জানাইতেছেন যে,—বাণীবনে বালকদিগকে সাধারণ শিক্ষার সহিত কৃষি এবং শিল্প শিক্ষা দিবার জন্য বাণী-মন্দির স্থাপিত হইয়াছে। ধর্ম্ম এবং নীতি শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা হইবে। বর্ত্তমানে ষষ্ঠ শ্রেণী (class VI) পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে। প্রবেশ ফি ২৲ দুই টাকা, এবং সর্ব্বসমেত মাসিক ব্যয় প্রতি ছাত্রের [illegible] জানুয়ারীর প্রথম হইতেই ছাত্র লওয়া হইবে। বিস্তারিত সংবাদের জন্য শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন রায়, বাণীবন, হাওড়া—ঠিকানায় রিপ্লাইকার্ডে পত্র লিখিতে হইবে।

প্রচার—শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী প্রায় ৩ মাস কাল ঢাকায় অবস্থান করিয়া মন্দিরে ৭।৮ রবিবার, শ্রাদ্ধ, বিবাহ, নামকরণ, জন্মদিন, প্রভৃতি ২০।২৫টী অনুষ্ঠানে, সোমবাসরীয় সম্মিলনে, সঙ্গতসভায়, সাপ্তাহিক পারিবারিক সম্মিলনের উপাসনায় বহুদিন আচার্য্যের কার্য্য, বার্ষিক উৎসবে বক্তৃতা ও সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন, সুনীতিসঙ্ঘে, নববিধান ব্রাহ্মসমাজে, আনন্দাশ্রমে, ছাত্রসমাজে ৭।৮টী বক্তৃতা প্রদান, এবং বহু ব্রাহ্ম পরিবার ও বন্ধু পরিবারে গমন ও নানাবিধ ধর্ম্ম প্রসঙ্গ করিয়াছেন। তাঁহার কার্য্যে সকলেই উপকৃত বোধ করিয়াছেন। পৌষের প্রথম সপ্তাহে তিনি বরিশালে গমন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রশশী গুপ্তের প্রচার কার্য্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রকাশিত হইল:—

এলাহাবাদ—২৯—৩০ সেপ্টেম্বর। ২৯শে—দুইটি পরিবারে উপাসনা, ৩০শে—ডাঃ নিরোদচন্দ্র মৈত্রের গৃহে সমবেত উপাসনা। দেরাদুন—২রা হ'তে ২৭শে অক্টোবর। নবীনচন্দ্র রায়ের জীবনী লেখা; ২রা, ৯ই, ১৬ই এবং ২৩শে অক্টোবর মিসেস চৌধুরীর গৃহে সামাজিক উপাসনা—হিন্দী ভাষায়। রাজচন্দ্র চৌধুরীর বার্ষিক শ্রাদ্ধ, এবং তিনটি পরিবারে উপাসনা। নিম্নশ্রেণীর ২টি স্কুল পরিদর্শন, উপদেশ দান, ও শিক্ষকগণের সঙ্গে প্রসঙ্গ। লাহোর—২৮শে অক্টোবর হ'তে ৮ই নভেম্বর এবং ১১ই হ'তে ১৬ই নভেম্বর। মন্দিরে তিন রবিবার উর্দ্দুতে উপাসনা; সাধন আশ্রমে উর্দ্দুতে উপাসনা; বাংলা উপাসক-মণ্ডলীতে দুই দিন উপাসনা। ৪টি অনুষ্ঠানে উপাসনা এবং ১০টি পরিবারে উপাসনা; দয়াল সিং স্কুলে ছাত্রগণকে উর্দ্দুতে উপদেশদান। নানা স্থানে সমাজ ও ধর্ম্ম প্রসঙ্গ। সিয়ালকোট—৯—১১ নভেম্বর। প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে সমবেত উপাসনা, উপদেশ ও সাধন-প্রসঙ্গ। দিল্লী ১৮—২০ নভেম্বর। ১৯শে সন্ধ্যাকালে কেশবচন্দ্রের জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ সমবেত উপাসনা। ২০শে (দুপুরে) একটি পরিবারে উপাসনা, সন্ধ্যায়—সমবেত সামাজিক উপাসনা। দেরাদুন—২১—২৪ নভেম্বর। প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে উপাসনা। ২২শে পারিবারিক অনুষ্ঠানে বিশেষ উপাসনা। লক্ষ্ণৌ—২৫—২৯ নভেম্বর। ২৬শে সমবেত উপাসনা ও ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ে প্রসঙ্গ। ২৭শে প্রাতে ব্রহ্মমন্দিরে মহারাণী সুনীতি দেবীর আদ্যশ্রাদ্ধে উপাসনা, ২৮শে পরিবারে উপাসনা। ২৯শে সমবেত সামাজিক উপাসনা এবং যুবকগণের সঙ্গে প্রসঙ্গ। এলাহাবাদ—৩০শে নভেম্বর—৪ঠা ডিসেম্বর। পাঁচটি পরিবারে উপাসনা; ব্যক্তিগত সাধন-প্রসঙ্গ; সমবেত সামাজিক উপাসনা। পাটনা—৫—৮ ডিসেম্বর। প্রত্যহ পারিবারিক প্রার্থনা; ৭ই প্রাতে প্রকাশচন্দ্র রায়ের বার্ষিক শ্রাদ্ধে উপাসনা এবং সন্ধ্যায় সে বিষয়ে প্রসঙ্গ। গয়া—৮—৯ ডিসেম্বর। ৮ই পারিবারিক প্রার্থনা। ৯ই সন্ধ্যায় সমবেত উপাসনা। সর্ব্বত্র প্রায় সমস্ত ব্রাহ্ম পরিবার পরিদর্শন, এবং অন্য বন্ধুগণের সঙ্গে আলাপাদি।

সর্ব্বত্র সকলের এক কথা—আরও ঘন ঘন প্রচারক আসেন তো ভাল হয়। ব্রাহ্মপরিবারগুলি সর্ব্বত্র পরস্পর হ'তে বিচ্ছিন্ন। ব্রাহ্মসমাজের কোন ভাব ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিকশিত হচ্ছে না। কেহ গেলে, দুচার দিন দেখা সাক্ষাৎ, মেলা মেশা, উপাসনাদি হয়। নতুবা কিছুই হয় না। সর্ব্বত্র লোক চাই। লোক তৈরি হয় কিরূপে, ইহা অতি গুরুতর সমস্যা।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাগ কর্ত্তৃক ১৮ই পৌষ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।—সম্পাদক শ্রীবরদাকান্ত বসু, বি-এ

Registered No. 65

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫৫ ভাগ
১৯শ সংখ্যা।

১লা মাঘ, শনিবার ১৩৩৯, ১৮৫৪ শক,
ব্রাহ্মসংবৎ ১০৩
14th January, 1933.

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০
অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

করুণাময়ী জননী, তোমার অপার স্নেহে তুমি আমাদিগকে তোমার উৎসব-দ্বারে আনিয়া উপস্থিত করিলে! তুমি জান, তোমার উৎসব-গৃহে প্রবেশ করিবার যোগ্যতা আমাদের কিছুই নাই। আমরা উপযুক্ত আয়োজন উদ্যোগ কিছুই করি নাই। তোমার উৎসবের আহ্বান শুনিয়া যেরূপ আকুল আকাঙ্ক্ষা লইয়া ছুটিয়া আসিতে হয়, যেরূপ দীন হীন কাঙ্গাল বেশে তোমার দ্বারে ভিখারী হইতে হয়, অনন্যগতি হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইতে হয়, আপনার সমস্ত ইচ্ছা অভিরুচি বিসর্জ্জন দিয়া তোমার হাতে সম্পূর্ণরূপে আপনাকে সমর্পণ করিতে হয়, তাহার কিছুই আমাদের মধ্যে নাই। জীবনে তোমার যে অসীম করুণার পরিচয় পাইয়াছি, তাহা ভিন্ন ত আমাদের অন্য কোনও আশার কারণ নাই। আমরা অযোগ্য হইলেও, তুমি কখনও আমাদিগকে পরিত্যাগ কর না, যোগ্য করিয়া লইবার জন্য সর্ব্বদাই নানারূপে নিযুক্ত আছ, ইহাই আমাদের একমাত্র আশা। তোমার মঙ্গল সঙ্কল্প কখনও ব্যর্থ হইতে পারে না। তুমি এই কৃপা কর, আমরা যেন তোমার মঙ্গল ব্যবস্থা অবনত মস্তকে কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করিতে পারি। তুমি আনন্দ সুখ দেও, আর দুঃখ বেদনাই দেও, তোমার মধুর প্রকাশে হৃদয় মন সরসতাতে পূর্ণ কর, আর শুষ্কতার মধ্যে ফেলিয়া শুদ্ধ সুন্দর পবিত্র করিবার আয়োজন কর, যাহাই কর না কেন, সমস্তই যে তোমার স্নেহের দান, এই বিশ্বাস যেন কিছুতেই না হারাই। আমরা এই উৎসবের মধ্যে যাহাতে সম্পূর্ণরূপে তোমার হইয়া যাইতে পারি, তুমি কৃপা করিয়া তাহাই কর। তোমার ইচ্ছাই আমাদের জীবনে ও সমাজে সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউক।

চয়ন

১। স্বীয় প্রভুকে স্মরণ রাখ, মনুষ্যকে ছাড়িয়া দাও।

২। বদ্ধকে মুক্ত কর এবং মুক্তকে বদ্ধ কর। অর্থাৎ বদ্ধ মুদ্রাধার উন্মোচন করিয়া দান বিতরণ কর, এবং অযথা-ভাষী উন্মুক্ত জিহ্বাকে বদ্ধ কর।

৩। যাত্রার জন্য চারিটী বাহন আছে,—যখন কোন সম্পদ উপস্থিত হয়, কৃতজ্ঞতার বাহনে আরোহণ করিয়া অগ্রসর হই; পূজা অর্চ্চনা কালে প্রেমের বাহনে আরোহণ করি; বিপদ উপস্থিত হইলে সহিষ্ণুতার বাহনে আরোহণ করি; এবং পাপ করিলে অনুতাপ-বাহনে যাত্রা করি।

তাপস এব্রাহিম আধম।

ঈশ্বরকে ভালবাসাতেই আমাদের আনন্দ ও সুখ, তাঁহাতে বিশ্বাস স্থাপন করাতেই আমাদের শান্তি ও বিশ্রাম, এবং তাঁহার ইচ্ছার নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করাতেই আমাদের বল ও শক্তি।

চার্লস্ ব্যায়ার্ড।

সম্পাদকীয়।

উৎসব-দ্বারে—দেখিতে দেখিতে আমরা উৎসব-দ্বারে আসিয়া উপস্থিত। আমরা কে কি প্রকার আয়োজন লইয়া আসিয়াছি, কে কি ভাবে উৎসব সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইব, কিছুই জানি না। দ্বারে উপস্থিত হইলেই যে উৎসব-গৃহে প্রবেশ করা যায়, এমন নহে। উৎসবের সকল অনুষ্ঠানে যোগ দিলেই যে প্রকৃত পক্ষে উৎসব সম্ভোগ করা হয়, তাহাও বলা যায় না। আমাদের জীবনে সকল উৎসব যে সমভাবে সফল

হইয়াছে, তাহা ত কেহই বলিতে পারি না। কত সময় ত বহু লোককে উৎসবে গভীর ভাবে ডুবিতে দেখিয়াও, নিজে কিছুমাত্র ডুবিতে পারি নাই, উপর উপর ভাসিয়া বেড়াইয়াছি, অথবা বাহিরে একপাশে পড়িয়া রহিয়াছি। আমাদের অনেক আয়োজন উদ্যোগকেও যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইতে না দেখিয়াছি, এমনও ত নহে। কাজেই আমাদের চেষ্টা যত্ন আয়োজন কেন ব্যর্থ হয় তাহা একবার ভাবিয়া দেখা আবশ্যক। তাহা হইলে হয় ত বুঝিতে পারিব, আমাদের ব্যর্থতার মূল কারণ কোথায়।

আমাদের চেষ্টা যত্ন আয়োজনের মূলে যে অনেক সময়ই আত্মশক্তির উপর অত্যধিক নির্ভর থাকে, তাহা সামান্য একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা অনেক সময় মনে করি, আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি বিচার, বিশ্বাস ভক্তি নিষ্ঠা সেবা, প্রেম পুণ্য সাধুতা, ভজন পূজন কীর্ত্তন, আকুলতা ব্যাকুলতা উচ্ছ্বাস, ধ্যান ধারণা প্রার্থনা প্রভৃতি সাধনের বলে অব্যর্থরূপেই সফলতা লাভ করিব,—জ্ঞানস্বরূপকে নিঃসংশয়িত রূপে প্রত্যক্ষ করিব, প্রেমস্বরূপকে ভক্তি বলে বাঁধিয়া ফেলিব, পাপমুক্ত হইয়া পুণ্যস্বরূপের সঙ্গে চির যুক্ত হইব, আনন্দ শান্তিতে ডুবিয়া থাকিব। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখি তাহা হয় না, কি যেন আমাদের ও জীবন-দেবতার মধ্যে একটা সূক্ষ্ম ব্যবধান রচনা করিয়া দেয়, আমাদিগকে আড়াল করিয়া দাঁড়ায়। তাহা যে আমাদের অহঙ্কার ব্যতীত আর কিছুই নহে, সে কথা বলা বাহুল্য। তিনি কোনও ক্রমেই আমাদের আয়ত্তাধীন নহেন। আমাদের আয়ত্তাধীন যাহা তাহা আমাদেরই মনগড়া, কল্পনার সৃষ্টি ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। কেননা সেস্থলে একমাত্র আমার শক্তিই কার্য্য করিতেছে, তাঁহার কোনও কার্য্যের অবসর সেখানে নাই।

তাঁহার প্রকাশের মধ্যে তিনিই কর্ত্তা, আমি গ্রহীতা মাত্র। আমার একমাত্র কার্য্য আপনাকে গ্রহণের উপযুক্ত অবস্থায় অবস্থিত করা, স্থিরচিত্তে আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষার ভাবে উন্মুখীন রাখা, যাহাতে তিনি অবাধে আমাদের মধ্যে কার্য্য করিতে পারেন, আমাদের মধ্যে এমন কিছু না থাকে যাহার জন্য তাঁহার কার্য্য বিন্দু পরিমাণেও বাধা পাইতে পারে। আত্মশক্তি বা অপর কিছুর উপর নির্ভর থাকিলে আমাদের দৃষ্টি যে তাঁহার দিকে না থাকায় সেই দিকেই আবদ্ধ থাকে, তাঁহার দিকে উন্মুখীনতা ও তাঁহার উপর নির্ভর থাকে না, তাঁহার প্রকাশ আর গ্রহণ করা যায় না, তাঁহার সহিত যোগ রক্ষা করা যায় না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এই জন্যই দীনতার এত প্রয়োজন। দীন হীন কাঙ্গাল হইয়া তাঁহার কৃপার ভিখারী না হইলে কিছুতেই চলে না। যতক্ষণ আত্মশক্তির উপর বিন্দু পরিমাণ নির্ভর ও আশা থাকে, ততক্ষণ প্রকৃত দীনতা আসিতে পারে না, কৃপার ভিখারীও হওয়া যায় না, অনন্যগতি হইয়া সরল প্রার্থনায় নিযুক্ত হওয়া সম্ভবপর হয় না। তাঁহার কৃপালাভ করা বা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ যোগ স্থাপন করা আর কি প্রকারে সম্ভবপর হইবে?

কিন্তু শুধু দীন হীন ভিখারী হইলেই কি যথেষ্ট হইল? অনন্যোপায় হইয়া ব্যাকুল ভাবে প্রার্থনা করিলেই কি সব প্রার্থনা পূর্ণ হয়। অত্যধিক ব্যাকুলতা অনেক সময় ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটায়, স্থির শান্ত ভাবে আশা ও নির্ভরের সহিত প্রতীক্ষা করিতে দেয় না—সহজেই, প্রার্থনা পূর্ণ হইল না বলিয়া, নিরাশা ও অবিশ্বাসে প্রাণকে অভিভূত করিয়া ফেলে। উপযুক্ততার অবস্থা ও সময় সম্বন্ধে যে আমাদের বিচার করিবার ক্ষমতা নাই, একমাত্র সর্ব্বজ্ঞ মঙ্গলময় জীবন-বিধাতাই যে তাহা নির্ণয় করিতে সমর্থ, সে কথা অনেক সময়ই আমাদের স্মরণে থাকে না। তাহা স্মরণে থাকিলে আমরা এত সহজে অস্থির হইতাম না, ধৈর্য্যের সহিত প্রতীক্ষা করিয়া যথা সময়ে ফললাভ করিতে সমর্থ হইতাম। আর, আমরা যাহা চাহিব, সকল সময় তাহাই যে পাইব, এমন কোনও নিশ্চয়তাও নাই। আমাদের প্রকৃত কল্যাণের জন্য কোন্ প্রার্থনা কি ভাবে পূর্ণ হওয়া আবশ্যক, তাহাও আমরা অনেক সময় যথার্থ রূপে নির্ণয় করিতে পারি না। সে বিষয়েও তাঁহার পূর্ণ জ্ঞানের দ্বারা চালিত হইয়াই তিনি কার্য্য করিবেন,—আমাদের আকুলতা কখনও তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিবে না, আমাদের পছন্দ বা অপছন্দও তিনি গণনার মধ্যে আনিবেন না। সকল বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে তাঁহারই উপর নির্ভর করিতে হইবে।

আমরা অধিকাংশ সময় আমাদের পছন্দ মত সফলতাই খুঁজি, সেরূপ দানই প্রার্থনা করি। তাহা যে পূর্ণ হইতে পারে না, আর পূর্ণ হওয়া সম্ভবপর হইলেও যে তাহা কল্যাণকর হইত না, সে কথা যে আমরা একেবারেই জানি না বা বুঝি না, এমন নহে। তথাপি আমরা সকল সময় তাঁহার উপর নির্ভর করিতে পারি না। এরূপ অবস্থায় আমাদের পক্ষে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট সকল সময় ও ব্যবস্থা অবনত মস্তকে কৃতজ্ঞ চিত্তে গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় না—তৎপরিবর্ত্তে অনেক সময় অসন্তোষ ও বিদ্রোহিতাই জাগিয়া উঠে। এরূপ অবস্থায় উৎসব সম্ভোগ যে অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এই জন্যই সকল বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার উপর নির্ভর রাখিতে না পারিলে, কিছুতেই উৎসব সফল হইতে পারে না।

জীবনে আমরা তাঁহার অপার প্রেম ও মঙ্গলবিধাতৃত্বের যে সকল পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে তাঁহার উপর বিশ্বাস ও নির্ভর স্থাপন করা কিছুমাত্র কঠিন নহে—সম্পূর্ণরূপেই স্বাভাবিক। তবে আমরা সকল সময় এই নির্ভর রাখিতে পারি না কেন? তাঁহার প্রেম ও শক্তি সম্বন্ধে যে আমাদের বিশেষ কোনও রূপ সন্দেহ আছে, তাহা ত বলা যায় না। আমাদের ইচ্ছা অভিরুচি পরিত্যাগ করিয়া, সম্পূর্ণরূপে তাঁহার হাতে আপনাদিগকে সমর্পণ করিতে প্রস্তুত না হওয়াই যে সে পথে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বাধা, সে কথা সামান্য একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। একদিকে আমরা যে অনেক সময় আমাদের প্রকৃত কল্যাণ নির্ণয় করিতে পারি না, অল্প জ্ঞান বশতঃ অকল্যাণকেও কল্যাণ বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকি, সে কথা স্মরণে থাকে না, অন্য দিকে নিজে যাহা ভাল মনে করি,

যাহা ভালবাসি, তাহা পাইবার জন্যই বিশেষ ভাবে আকাঙ্ক্ষিত হইয়া তাহার বিপরীত কিছু গ্রহণ করিতে স্বভাবতঃই নিতান্ত অনিচ্ছুক হই। এই জন্যই অন্যরূপ কিছু যখন আসে, তখন তাহাকে বিধাতার দান বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না।

শুধু তাহাই নহে। অনেক সময় আমাদের ইচ্ছা তাঁহার ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিপরীত পথেই ধাবিত হওয়াতে, দুই ইচ্ছার মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। যদিও আমরা দীর্ঘকাল তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধ পথে চলিতে পারি না, পরিণামে তাঁহার ইচ্ছাই জয়যুক্ত হয়, আমাদের ইচ্ছা পরাজিত হয়, তথাপি ইহাতে তাঁহার ইচ্ছার কার্য্য যে বহু পরিমাণে ব্যাহত হয়, পূর্ণরূপে কার্য্য করিতে পারে না, তাঁহার পথে আমাদের প্রত্যাবর্ত্তন করিতে যে অনেক বিলম্ব হইয়া যায়, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আর, আমরা যদি আমাদের ইচ্ছার বিরোধিতা পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণরূপে তাঁহার হাতে আপনাদিগকে সমর্পণ করিতে পারি, তাহা হইলে তাঁহার ইচ্ছা অব্যাহত ভাবে কার্য্য করিয়া যে আমাদিগকে সহজে ও অগোণে তাঁহার অভীপ্সিত কল্যাণের পথে লইয়া যাইতে সমর্থ হয়, তাহা বলা বাহুল্য। সুতরাং জীবনের পরিবর্ত্তনের জন্য, কল্যাণ ও উন্নতির পথে চালিত হইবার জন্য, তাঁহার হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া পূর্ণ আনুগত্য লাভ যে একান্ত আবশ্যক, তাহা আর অধিক করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই।

মানব-জীবনের সার্থকতা ও পূর্ণতা জীবনবিধাতার পূর্ণ আনুগত্য ভিন্ন অন্য কোনও উপায়েই লাভ করা যায় না, পুণ্য ও পবিত্রতার অন্য কোনও অর্থই নাই,—অন্য যত দিকে যত প্রকার উন্নতিই সাধিত হউক না, ইহা ব্যতীত তাহাদের কোনও মূল্যই নাই। উৎসবের মধ্যে আর যাহাই পাই না কেন, এই ব্রহ্মানুগত্য লাভ না করিতে পারিলে, প্রকৃত পক্ষে মূল্যবান কিছুই যে পাওয়া হইবে না, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং নিজের সমস্ত ইচ্ছা অভিরুচি বিসর্জ্জন দিয়া, সম্পূর্ণরূপে তাঁহার হাতে আত্মসমর্পণ না করিলে আর কোনও উপায়েই উৎসব সফল হইতে পারে না। কাজেই আমরা আর যাহা করি আর না করি, উৎসব-দ্বারে আসিয়া আপনার ইচ্ছা বা স্বাতন্ত্র্য বিন্দু পরিমাণে রাখিলেও চলিবে না সম্পূর্ণরূপেই ত্যাগ করিতে হইবে। একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ করা যায়। সে ত্যাগ বাহিরের কোন ত্যাগ নয়, একেবারে আপনাকে ত্যাগ, নিজ ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য ত্যাগ—সম্পূর্ণ আত্ম-বিলোপ।

এই ভাবে উৎসব-দ্বারে উপস্থিত হইয়া প্রতীক্ষা করিলে যে উৎসব কিছুতেই ব্যর্থ হইবে না, তাহা দৃঢ়তার সঙ্গেই বলা যায়। আনন্দ উচ্ছ্বাস, ভাব ভক্তি সরসতার পরিবর্ত্তে দুঃখ বেদনা শুষ্কতা শূন্যতাও যদি আসে, তাহা হইলেও উৎসব ব্যর্থ হইয়াছে মনে হইবে না, সার্থকই হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারা যাইবে। কেন না, জীবনগতির পরিবর্ত্তন, সম্পূর্ণরূপে তাঁহার আনুগত্য লাভ ভিন্ন, অপর কিছুতেই নবজীবনের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় না, উৎসবের সার্থকতা নিঃসন্দিগ্ধরূপে সূচিত হয় না। অপর সমস্তের সঙ্গেই মিথ্যা ও কল্পনা জড়িত থাকিতে পারে। সুতরাং আমরা যেন এই ভাব লইয়াই দীন হীন কাঙ্গাল বেশে, পূর্ণ ধৈর্য্য ও আত্মসমর্পণের সহিত উৎসব-দ্বারে প্রতীক্ষা করি।

করুণাময় পিতা আমাদিগকে সেই ভাবে প্রস্তুত করুন। তাঁহার ইচ্ছাই সর্ব্বতোভাবে আমাদের প্রতি জীবনে জয়যুক্ত হউক।

ব্রাহ্মসমাজের মিলন সাধনের উপায়—

বিগত কার্ত্তিক মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় "ব্রাহ্মসমাজের মিলন সাধনের উপায় (আচার্য্য বিনিময়)" শীর্ষক দ্বিতীয় প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া, উক্ত বিষয়ে আমাদের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। ইহাতে তিনি প্রথমে জানাইয়াছেন যে, উপাসনা-প্রণালীতে সংস্কৃত ভাষার আধিক্য থাকিবেই, এরূপ মত তিনি তাঁহার পূর্ব্ব প্রবন্ধে কোথাও প্রকাশ করেন নাই, এবং সংস্কৃত ভাষাকে যে মৃত ভাষা বলা উচিত নয়, তাহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মূল বিষয়ের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই বলিয়া এ সম্বন্ধে কোন বিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়া আমরা আবশ্যক বোধ করিতেছি না। সংস্কৃত ভাষা জীবিত কি মৃত, ইহা নিতান্তই অবান্তর কথা। দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের প্রাক্কালে কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ নবীন ব্রাহ্মগণ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, এবং তিনি তাঁহার যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ করিয়া, উহাদের "বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার ফলে বিচ্ছেদের ভিত্তি যেমন বিচূর্ণিত হইবার সূত্রপাত হইবে, সেইরূপ অপর দিকে মিলনেরও ভিত্তি সংগ্রথিত হইতে থাকিবে" মনে করিয়া পত্র দুইখানি সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার উক্ত বিশ্লেষণ ও মন্তব্য বর্ত্তমান সময়ে মিলনের পক্ষে কি সাহায্য করিবে বুঝিতে পারা গেল না। সকলে যে তাঁহার মত গ্রহণ করিবেন, তাহা সম্ভবপর মনে হয় না। আমাদের মনে হয়, গত বিষয়ের উত্থাপন না করিলেই ভাল হইত। তৃতীয়তঃ, তিনি সমাজের মধ্যে আচার্য্য বিনিময়ের প্রস্তাব করিয়াছেন। ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য সাধন বিষয়ে সাহায্য হইতে পারে। এ বিষয়টা সকলেরই বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। কোথাও কোনও গুরুতর বাধা না থাকিলে, এরূপ করাই উচিত হইবে। প্রত্যেক সমাজ যখন আপনার পছন্দ মত আচার্য্য বাছিয়া লইবেন, তখন সেরূপ গুরুতর কোনও বাধার কারণ দেখা যায় না। এই প্রস্তাবের প্রতি আমরা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। সঙ্কীর্ণতা সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়। তবে উদারতার নামে ধর্ম্ম ও নীতির উন্নত আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করা কখনও উচিত হইবে না। পরস্পরের উপাসনাক্ষেত্রে মিলিত হইলে যে মিলনের পক্ষে বিশেষ সহায়তা হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সে বিষয়ে আমরা কোনও বাধা দেখিতেছি না। সকল ক্ষেত্রে আচার্য্য বিনিময় যদি সম্ভবপর না-ও হয়, তথাপি ইহা অনায়াসে অবলম্বিত হইতে পারে।

মানব জীবন

(১৫)

বিষয়কর্ম—দেওয়া ও পাওয়া।

আমরা সংসারে কোন কোন কাজ করি কিছু পাওয়ার জন্য। তাকেই বল্‌ছি বিষয়কর্ম। চাকরদের বেতন দিই, তাদের সেবা পাওয়ার জন্য। আমি কোন স্কুলে শিক্ষকের কাজ করি, কিছু টাকা পাব ব'লে। মানুষ ভাল না হ'লে, কেবল টাকায় কোন কাজ ভাল চলে না। খুব শক্ত পাকা ঘর তৈরি কর্‌তে হ'লে, খুব ভাল পাকা ইঁট কাঠ প্রভৃতি চাই, ভাল মিস্ত্রী চাই।

আমাদের সকলকেই কিছু দিয়ে, কিছু পেয়ে, সংসারে চল্‌তে হয়। দেওয়া এবং পাওয়া যদি ন্যায়সঙ্গত, ধর্ম্মসঙ্গত হয়, তা হ'লে জগতের কল্যাণ হয়, মানুষের জীবন উন্নত হয়। আর যদি তা ধর্ম্মসঙ্গত না হয়, কেবল নিজের স্বার্থ, নিজের লাভ ও সুবিধার পানেই দৃষ্টি থাকে, তা হ'লে বিষয়কর্ম ঘোর অকল্যাণের কারণ হয়।

বিষয়-কর্ম্মে, কেনা-বেচায়, দেওয়া-নেওয়ায়, মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে, যদি ন্যায় প্রেম সাধুতা না দাঁড়ায়, তা হ'লে মানবজীবন হীন হয়, নানাপ্রকার দুঃখ ও দুর্গতি সমাজে প্রবেশ করে। চারিদিকে হাজার হাজার লোক অভাবে দুঃখে দিন কাটাচ্ছে, এবং অতি অল্প কয়জন লোক সুখে আরামে বিলাসিতায় ডুবে আছে। এ অবস্থা স্বাভাবিক নয়। মানুষ এখনও মানুষ হয় নাই, তাই মানুষের এত দুঃখ।

মানুষের প্রধান একটা লক্ষণ এই যে, সুখে দুঃখে মানুষ পরস্পরের সঙ্গী ও সহায় হইতে পারে। মানুষের যা-কিছু উন্নতি হয়েছে, তা সেই জন্যই হয়েছে। লক্ষ লক্ষ স্বার্থপর নির্ব্বোধ মানুষের মধ্যে দু'চার জন প্রেমিক জ্ঞানী মাঝে মাঝে জন্মান, এবং নিজেদের সর্ব্বস্ব দিয়ে অন্যের মঙ্গল সাধন করেন, তাই জগতের উন্নতি হয়েছে। বিষয়কর্ম্মে, কেনা-বেচায়, সংসারের অন্য সব কাজে, প্রেম জ্ঞান সাধুতাকে পরিচালক কর্‌তে হবে। তবে সংসার সুখের স্থান হবে।

আমরা সর্ব্বদাই কিছু পাওয়ার জন্য কিছু করি, কিছু দেই। নানা ভাবে এইরূপ কর্‌তে পারি:—(১ম) একবারে নিঃস্বার্থভাবে,—কিছু পাওয়ার জন্য নয়, কেবল দিয়েই, অপরের সাহায্য বা কল্যাণ ক'রেই, আনন্দ তৃপ্তি; এই আনন্দটুকু কম মূল্যবান নয়। (২) দেব বেশী, নেব সামান্য। (৩য়) যা দেব, তাহার সমান পরিমাণ কিছু চাই। (৪র্থ) দেব যত কম পারি, এবং নেব যত বেশী সম্ভব। (৫) কিছুই দেব না, কেবল যত পারি নেব।

শেষ প্রকারের কাজকে সোজা কথায় বলে চুরি ডাকাতি, ঠগানো, জোর-জুলুম। এটা যে ঘোরতর অন্যায় তা সহজেই বোঝা যায়। যত কম দিয়ে যত বেশী পারি নেব—এরকম করাকেও অন্যায় বলি আমরা সকলে। সামান্য একটি চাকর যদি এ-রকম হয়, তা হ'লে বড়ই কষ্ট পেতে হয়। কেরাণী, শিক্ষক প্রভৃতি যদি এই ভাব নিয়ে কাজ করে, তা হ'লে তাদের দিয়ে কাজ ভাল হ'তে পারে না। যার কাজ তার ক্ষতি হয়। তৃতীয় ভাব—যেমন নেব ঠিক তেমনি দেব,—এটা ন্যায়সঙ্গত ভাব। কিন্তু এ ভাবেও সকলে চলেন না ব'লে সংসারে কত দুঃখ কষ্ট, কত হাহাকার! যারা ধনী তারা অনেক সময় সামান্য মজুরী দিয়ে, গরীবদের কাছ থেকে অনেক বেশী কাজ আদায় করেন। যেসব স্থলে টাকা দিয়ে বা কিছু দিয়ে কাজ কর্‌তে হয়, অথবা টাকা বা কিছু দিয়ে কাজ করাতে হয়, সে সব ক্ষেত্রে, এই নিয়মটির অনুগত হ'লেও ধর্ম্মরক্ষা হয়। কিন্তু মহৎ হ'তে হ'লে, প্রেমিক মানুষ হ'তে হ'লে, কম নিয়ে বেশী দিতে হবে, দেবার জন্য প্রস্তুত থাক্‌তে হবে। এবং কোন কোন স্থলে কিছু পাওয়ার আশা না ক'রেই যথাসাধ্য দিতে হবে, কাজ কর্‌তে হবে।

সাধারণ বিষয়কর্ম্মে, কতগুলি বিধি পালন না কর্‌লে ধর্ম্ম রক্ষা হয় না, মানুষ থাকা যায় না। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে এ কথা স্পষ্ট কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ছি:—

(১) আমি যদি কোন কাজ কর্‌তে সম্মত হই, তা হ'লে, সে কাজ ক'রে কত টাকা পাব, অথবা তাতে কোন বেতন নাই—এই সব চিন্তা ক'রে, সে কাজ ভাল বা মন্দ ক'রে কর্‌ব, এ হ'তে পারে না। কোনও কাজের ভার নেব কি না, সে বিষয়ে আমি স্বাধীন; সেই কাজের ভার গ্রহণ করার পূর্ব্বে আমি ভাব্‌তে পারি, পরামর্শ কর্‌তে পারি, টাকা বা অন্যান্য সর্ত্ত সম্বন্ধে আলোচনা কর্‌তে পারি,—কিন্তু যখন কাজের ভার নিলাম, দায়িত্ব স্বীকার কর্‌লাম, তখনি আমি ঈশ্বরের কাছে দায়ী হ'লাম সেই কাজ যথাযথরূপে কর্‌বার জন্য। কাজের ভার নেওয়া মানেই সেকাজ যথা সময়ে করা, সম্পূর্ণরূপে করা, নিখুঁৎ রূপে করা, শ্রেষ্ঠ প্রণালীতে করার জন্য দায়িত্ব নেওয়া। কাজের ভার নিয়ে তার পর যদি মনে করি, এতে বেতন এত কম, অথবা এ'তো আর মাইনে দেওয়া কাজ নয়, এবং সেই জন্যে যেমন ইচ্ছা তেমন ক'রে করি, বা কিছুই না করি, তা হ'লে ধর্ম্মও থাকে না, মানুষও থাকা হয় না। এমন যারা করে তারা ভাল মানুষ নয়।

একজন শিক্ষক ৩০ টাকা বেতনে কাজ না নিতে পারেন, বল্‌তে পারেন বেতন বড় কম। কিন্তু কাজ যদি স্বীকার করেন, তবে আর সে কথা বল্‌বার অধিকার নাই। ডাক্তার যদি রোগীর কল্যাণ অপেক্ষা তাঁর ফির কথাই ভাবেন, তা হ'লে কেমন হয়? কোন সমিতির সম্পাদকের কাজ নিলাম, কিন্তু কিছু করি না, এ কি ঠিক?

(২) অন্য দিকে, আমরা যদি কোন কাজে কোন লোককে নিযুক্ত করি, তা হ'লে কি ভাবে নিযুক্ত করা উচিত? যেমন কাজ চাই, তার উপযুক্ত প্রতিদান দেওয়া উচিত। তা না ক'রে, যদি আমরা যত কম দিয়ে যত বেশী কাজ আদায় কর্‌তে পারি, এই নিয়ম অনুসারে কাজ করি, তা হ'লে গরীবদের প্রতি অবিচার করা হয়। অনেক মানুষ বড় গরীব, তাই তারাঃ

অনেক সময় বাধ্য হয়ে, যা পায় তাই নিয়েই অনেক বেশী কাজ করে। কিন্তু অভাব সম্পূর্ণ দূর হয় না, পেট ভ'রে খেতে পায় না, তাই হয়ত খুব পরিশ্রম ক'রেও কাজ ভাল হয় না। এ ক্ষেত্রে অপরাধ যাঁরা নিযুক্ত করেন তাঁদের।

এক টুকরো হাড় নিয়ে দুটো কুকুর লড়াই করে। প্রত্যেক কুকুরের চেষ্টা সে-ই সবটা পায়, অপর কুকুরটা না পায়। মানুষ যখন কিছু দিয়ে, কিছু পেতে চায়—তখন তাদের সম্বন্ধ কি ঐ কুকুরের মত? মানুষ কি এই ভাব্‌বে, যত কম দিয়ে বা কিছু না দিয়ে, যত আদায় করতে পারি, ততই পাকা লোক? তা হ'লে মানুষও পশু হয়। এরূপ ভাব আছে ব'লে মানুষের এত দুঃখ।

কি বাড়ীতে ঝী চাকর নিযুক্ত করা, কি রাস্তায় কুলী মজুর গাড়ী নিযুক্ত করা, কিম্বা আমাদের অধীন কোন স্কুল কলেজ অফিস বা দোকানে শিক্ষক কেরাণী বা চাকর নিযুক্ত করা—যা করি না কেন, তাতেই দেওয়া নেওয়া আছে। এই দেওয়া নেওয়ার সময় যদি ন্যায়বোধ, ভ্রাতৃভাব কোন কাজে না লাগে, কেবল স্বার্থপরতা, চালাকী, কম দিয়ে বেশী আদায়ের প্রবৃত্তিই কাজ করে,—তা হ'লে যাঁরা এরূপ করেন তাঁদের টাকা থাকতে পারে, বিদ্যা থাকতে পারে, খুব খ্যাতি প্রতিপত্তি থাকতে পারে,—কিন্তু তাঁরা, ভাল মানুষ ন'ন, ধর্ম্মনিষ্ঠ ন'ন। বড় বড় নানা কাজ—স্কুল কলেজ প্রভৃতি পরিচালন-করলেও, সে সকল দ্বারা জগতের কল্যাণ হবে না। গোড়ায় গলদ আছে, পাপ আছে।

নিঃস্বার্থ দান, নিঃস্বার্থ সেবার কথা নয়। দেওয়া নেওয়ার বিষয়েও ধর্ম্ম ন্যায় প্রেম যদি রাজত্ব না করে, তা হ'লে, সেকাজে কল্যাণ হয় না। এ বড় কঠিন বিষয়। সূক্ষ্ম আত্মপরীক্ষা ক'রে দেখ্‌তে হবে, বিষয় কর্ম্মে ন্যায় ও প্রেম রক্ষা হচ্ছে কি না। এ অতি উচ্চ ধর্ম্মসাধন। এরই উপর জগতের সুখ শান্তি নির্ভর করছে।

সাধু নবদ্বীপচন্দ্র দাসের সঙ্গে—প্রচারে।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ঐরূপ এক সময়ে রাজসাহী জেলার অন্তর্গত কোন এক স্থান হইতে—খুব সম্ভব নওগাঁ—জনৈক ইংরেজী বিদ্যালয়ের হেড মাষ্টার ব্রাহ্মসমাজের বার্ত্তা ঘোষণার জন্য প্রচারক চাহিয়া পাঠান। নবদ্বীপচন্দ্র ও আমি তথায় গমন করি; এবং হেডমাষ্টার মহাশয়ের ভবনেই অবস্থিতি করি। মাষ্টার মহাশয় কৃতবিদ্য ব্যক্তি, বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এ। আমরা প্রচারার্থই তথায় গমন করিয়াছি। সুতরাং উপাসনাদি ব্যতীত প্রকাশ্য বক্তৃতা প্রদানও বিশেষ আবশ্যক। সে সময় মফঃস্বলে বক্তৃতাদি শুনিতেই লোকে খুব ভালবাসিত। এস্থলে আমাকেই একটি প্রকাশ্য বক্তৃতাদানের জন্য অনুরোধ করা হইল। আমি স্বীকৃত হইলাম। বক্তব্য বিষয় বিজ্ঞাপিত হইল। যথাসময়ে বক্তৃতা আরম্ভ করিলাম। বহু লোকেরই সমাবেশ হইয়াছিল। সম্মুখে দেখিলাম, উপবীতধারী কয়েকজন ব্রাহ্মণ। বলা বাহুল্য, হিন্দুধর্ম্মের ঐরূপ আন্দোলনের সময়, ইহারা আমাকে সহজে ছাড়িবেন না। যাহা ভাবিয়াছিলাম, বক্তৃতার ক্ষণেক পরেই, একজন ব্রাহ্মণপণ্ডিত উঠিয়া শ্রোতৃবর্গকে বলিলেন, বক্তা হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে বলিতেছেন,—উনি পৌত্তলিকদিগকে গালি বর্ষণ করিতেছেন। আমি অবশ্য একটি শ্লোকের দ্বারা পৌত্তলিকদিগের পূজাবিষয়ে বুদ্ধিহীনতার পরিচয় প্রদান করিতে যাইতেছিলাম। সেই ব্রাহ্মণের প্ররোচনায় বহু লোক ক্ষেপিয়া উঠিল। কলরব উত্থিত হইল। নবদ্বীপচন্দ্র ও হেডমাষ্টার আমার নিকটেই বসিয়াছিলেন। গোলযোগ-কারীরা কেবল গোলমাল করিয়াই ক্ষান্ত হইল না; অবশেষে ভাঙ্গা ইট্ পাট্‌কেলের অংশও নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। এইরূপ সময়ে নবদ্বীপচন্দ্র নতজানু হইয়া বসিয়া বলিলেন, "যদি আমরা আপনাদের প্রাণে ব্যথা দিয়া থাকি, দয়া করিয়া, আমাদিগকে ক্ষমা করুন।" নবদ্বীপচন্দ্রের প্রার্থনা ফলবতী হইল; নিমিষের মধ্যে সকল প্রকার অত্যাচারের ভাব তিরোহিত হইল।

'অক্রোধের দ্বারা ক্রোধ জয় কর; আর ক্ষমা ও ধৈর্য্যের দ্বারা মানবের দুর্বৃত্ত ব্যবহার দমন করিতে যত্নবান হও',—এইরূপ উক্তিই সাধুগণের ও ধর্ম্মশাস্ত্রের। নবদ্বীপচন্দ্রের জীবনে ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত একাধিক বারই দর্শন করিয়াছি।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করিতেছি। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মের সময় বলিলে অত্যুক্তি হয় না, পবিত্রচরিত্র, ধার্ম্মিক, মজিলপুর নিবাসী কালীনাথ দত্ত মহাশয়, ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে একপ্রকার যোগপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবার প্রয়াসী হন। ঐ পথাবলম্বীরা শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ করিয়া, সাধনে প্রবৃত্ত হইতেন। তাঁহাদিগের ঐ প্রকার সাধনের সময়, একপ্রকার শব্দও নির্গত হইত। দত্ত মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকেও আপনার দলভুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—অবশ্য, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, তাঁহার ঐ গ্রামবাসী বন্ধুর দলভুক্ত হওয়া দূরে থাকুক, ঐ মতের বিশেষ প্রতিবাদ করিতেন। কারণ, উহা ঈশ্বরলাভের প্রকৃত পথ নহে। স্বর্গীয় দত্ত মহাশয়, আমাকে বড়ই স্নেহ করিতেন, এবং আমাকেও তাঁহাদিগের পথানুসরণে বিশেষ প্রয়াসী হইয়াছিলেন—অনেক বুঝাইয়াছিলেন; এমন কি, তাঁহাদিগের নির্জ্জন-সাধনচক্রের মধ্যে বসাইয়া, সাধনকারীদিগের যোগের প্রভাব আমার মনের উপর বিস্তারের চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু এতৎসত্ত্বেও যখন কৃতকার্য্য হইলেন না, তখন বলিলেন, "You are a faithful servant of the Brahmo Samaj." যদিও আমি তাঁহার এতটা প্রশংসার উপযুক্ত নই।

যাহা হউক, আমাদের নবদ্বীপচন্দ্র দাস ঐ জালে পড়িয়াছিলেন। একবার,—কোন্ স্থানে একেবারেই স্মরণ নাই,—উভয়ে প্রচারার্থ বহির্গত হই। পথে কোন স্থানে নৌকাযোগে আমাদের যাইতে হয়। সন্ধ্যা উপস্থিত হইয়াছে। চারিদিক

নিস্তব্ধ। নৌকা চলিতেছে। এমন সময় দেখিলাম, নবদ্বীপচন্দ্র নৌকায় একপার্শ্বে বসিয়া, ঐরূপ যোগসাধনে রত হইয়াছেন। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, সাধন-প্রক্রিয়ায় নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের একপ্রকার শব্দ উত্থিত হয়; এখানেও তাহার কোনও ব্যতিক্রম হইতেছে না। তাঁহার সাধন সমাপ্ত হইলে, একটু মৃদু ভর্ৎসনায় তাঁহার ঐ কার্য্যের প্রতিবাদ করিলাম। তখন পূর্ণ যৌবন; রক্তের তেজটাও সামান্য নহে; সেইজন্য প্রতিবাদটা যেন কিছু কর্কশ রকমেরই হইয়াছিল। কিন্তু নবদ্বীপচন্দ্র আমার কথার উপর একটি কথারও উত্তর করিলেন না। স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর হইতেই আর কখনই, ঐরূপ যোগসাধনে রত হইতে দেখি নাই। আমি বয়সে তাঁহার ছোট হইলেও তিনি বিশেষ ধৈর্য্যের সহিত আমার যুক্তিতর্কগুলি মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া যে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার ধৈর্য্যের ও সত্যনিষ্ঠারই পরিচয় প্রদান করিতেছে।

দাস মহাশয়ের সঙ্গে আরো অনেকস্থলে প্রচারার্থ গমন করিয়াছি। কিন্তু দীর্ঘকালের জন্য, উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি আমার স্মৃতি-ক্ষেত্র হইতে একবারে মুছিয়া যাইবারই উপক্রম হইয়াছে, তাই সে-সকল-বিষয়ে লেখনী চালনা হইতে বিরত হইলাম। কিন্তু মুক্তকণ্ঠে ইহা আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে, সকলস্থলেই আমি তাঁহার মহত্ত্ব, স্নেহপ্রবণতা, ও ভগবদ্‌ভক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া সুখী হইয়াছি। যথার্থ ধর্ম্মজীবনের একটা আদর্শ চক্ষের সম্মুখে প্রতীয়মান হইল, তাহাও অনেক সময় মনে হইয়াছে। জীবনে ঐরূপ পুরুষের সঙ্গলাভ আমার পক্ষে একটা কল্যাণকর ঘটনা বলিয়াই আমি চিরদিন মনে রাখিব।

নবদ্বীপচন্দ্র জ্ঞানানুশীলনের দ্বারা কোন পুস্তকাদি রচনায় কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই; তাঁহার বাগ্মিতারও কোন বিশেষ পরিচয় আমরা পাই নাই সত্য, কিন্তু, তাহা না হইলেও, তিনি নিজ জীবনের যে উচ্চতা আমাদিগকে দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা বড়ই উজ্জ্বল; বড়ই মনোমুগ্ধকর। নবদ্বীপচন্দ্র স্বার্থত্যাগে, হৃদয়ের কোমলতায়, পরদুঃখকাতরতায়, প্রচারোৎসাহে যে দৃষ্টান্ত আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা অতুলনীয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ভবিষ্য ব্রাহ্ম-সমাজের ইতিহাসলেখকেরা এ মহাত্মার জীবন-কাহিনী অতি উজ্জ্বলরূপেই বর্ণনা করিবেন, আশা করি। "পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস" বলিয়াই, তাঁহার শেষ-জীবনে লোকে তাঁহাকে অভিহিত করিয়াছেন। খুব ভালই কথা। কিন্তু বর্ত্তমান লেখক, নবদ্বীপচন্দ্র দাসের নামের পূর্ব্বে "সাধু" এই বিশেষণ যোগ করিয়া, "সাধু নবদ্বীপচন্দ্র দাস" বলিয়াই আখ্যাত করিল।

শ্রীশশিভূষণ বসু

পরলোকগত হেমচন্দ্র সরকার

স্বর্গীয় পিতৃদেব পরলোকগত হেমচন্দ্র সরকার মহাশয় ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে নদীয়া জেলার অন্তর্গত বড় আন্দুলিয়া নামক গ্রামে তাঁহার মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মতিথি ৭ই শ্রাবণ, ২২শে জুলাই। তাঁহার পিতা পরলোকগত মধুসূদন সরকার, পিতামহ পরলোকগত কৃষ্ণগোবিন্দ সরকারের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। নদীয়া জেলার অন্তর্গত বল্লীপুর গ্রাম ইহাদের পৈতৃক নিবাস। ইঁহারাই সেখানকার অবস্থাপন্ন প্রধান নিবাসী ছিলেন। মাতামহ শ্রীনাথ বিশ্বাস ধনী ও পদস্থ পরিবার দেখিয়া আদরের কন্যা ভুবনমোহিনীর সহিত মধুসূদনের বিবাহ দিলেন। পিতামহী ভুবনমোহিনী তাঁহার দৈহিক সৌন্দর্য্যের জন্য বিশেষ খ্যাত ছিলেন। তাঁহার সে অসাধারণ সৌন্দর্য্য ও কান্তি তাঁহার সকল সন্তানের মধ্যে কেবল পিতৃদেবই পাইয়াছিলেন।

পিতৃদেব সমগ্র পরিবারের ও বিশেষতঃ পিতামহীর অনেক সাধনা ও তপস্যালব্ধ ধন। পিতামহীর যখন বিবাহ হয়, তিনি আট বৎসরের বালিকা। কিন্তু তাঁহার বিংশতি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সন্তান হয় নাই। ইহাতে পরিবারস্থ সকলেই চিন্তিত ও ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। সন্তানলাভের জন্য ঠাকুরমা অনেক ব্রত করিবার পর বাবার জন্ম হয়। এতকালের দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর পিতার জন্মে সমগ্র পরিবারের মধ্যে কিরূপ আনন্দের তরঙ্গ উঠিয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। তাঁহার বৃদ্ধ দাদামহাশয়ের নয়নের মণি হইলেন। এই সময়কার একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পিতৃদেব তখন কয়েকদিনের শিশু মাত্র। হঠাৎ শিশুর ক্রন্দনে বাড়ীর সকলে অস্থির হইয়া উঠিলেন; কত প্রকার চেষ্টা করা হইল, শিশুর ক্রন্দন আর থামে না। সকলেই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধ দাদামহাশয় কাছারী হইতে বাড়ী ফিরিয়া ঘটনা শুনিয়া, সেই কাপড়েই ছুটিয়া আসিলেন। দেখিলেন দৌহিত্রের পরণের কাপড়টী তত পরিষ্কার নহে। তিনি তৎক্ষণাৎ পাগড়ীর বহুমূল্য পরিষ্কার কাপড় ছিঁড়িয়া দৌহিত্রের গাত্রে জড়াইয়া দিলেন; সকলে বিস্ময়ে দেখিলেন যে, শিশুর ক্রন্দন সঙ্গে সঙ্গে থামিয়া গিয়াছে। এই ঘটনাটী পিতৃদেবের রোগশয্যার মধ্যে প্রায়ই মনে পড়িত। রোগযন্ত্রণায় যখন অস্থির হইয়া পড়িতেন, তখন একটু উপাসনা বা ভগবানের নাম শুনিলেই তিনি স্থির হইয়া যাইতেন। শুভ্র বস্ত্র যেরূপ শিশুর দেহকে জুড়াইয়া দিয়াছিল, শেষ শয্যায় সেরূপ ভগবানের নাম তাঁহার শরীর মনকে স্নিগ্ধ করিয়া তুলিত।

পিতৃদেবের জন্মের পরেই পরিবারের অবস্থা খারাপ হইয়া যায়। ঠাকুরদাদা অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন; তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতারা তাঁহাকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিলেন। এইজন্যই ইঁহাদিগকে ঘোর দারিদ্র্যে পড়িতে হইয়াছিল। জ্ঞান হইয়া অবধি পিতৃদেবকে দারিদ্র্যের সহিত

(কুমারী প্রফুল্লা রাও কর্ত্তৃক ব্রাহ্মবাসরে পঠিত)

সংগ্রাম করিয়া চলিতে হইয়াছে। জীবনের প্রারম্ভ হইতেই তিনি আপনার অসাধারণ অধ্যবসায়, কর্ম্মকুশলতা ও বুদ্ধিমত্তার গুণে আপনার পথ আপনি করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রে এমন কিছু অসাধারণ ভাব ছিল, যাহাতে আবাল বৃদ্ধ সকলেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেন। যাঁহারা একবার দেখিতেন, তাঁহাদের মনে ছাপ মারিয়া আসিতেন। বাল্যকালে তিনি যেরূপ অসুবিধা ও কষ্টের মধ্যে পড়াশুনা করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয় এবং তাঁহার প্রাণে জ্ঞানের পিপাসা প্রথম হইতেই কি গভীর ছিল তাহা বোঝা যায়। ৭/৮ বৎসরের বালকের পক্ষে প্রতিদিন ৪ মাইল যাওয়া আসা করিয়া স্কুলে পড়া কষ্টকর, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। পড়িবার বই পাইতেন না। কোন প্রকারে বই সংগ্রহ করিতেন, কাহারও বাড়ীতে পড়িবার স্থান করিয়া লইতেন, এইরূপে বাল্যের শিক্ষা সমাপ্ত হয়। এই সময়ের একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। বাবা যখন গ্রামের স্কুলে পড়িতেন, একটি পাঠ্য পুস্তকের প্রয়োজন হইয়াছিল। গ্রামে কোন দোকান ছিল না, যেখান হইতে ইহা কিনিতে পারিতেন। আট মাইল দূরে বৈষ্ণনাথতলা নামক স্থানে পাওয়া যাইত। ৭ বৎসরের বালক কোন প্রকারে পুস্তকের মূল্য সংগ্রহ করিয়া এই আট মাইল দূর পথ হাঁটিয়া গেলেন এবং বই লইয়া হাঁটিয়া ফিরিলেন। তখন তাঁহার পা ফুলিয়া গিয়াছে। বাড়ী ফিরিয়া গুরুজনকে বই দেখাইয়া জানিতে পারিলেন যে, দোকানওয়ালা তাঁহাকে ঠিক বই দেন নাই। তখন আর ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিলেন না। কাঁদিয়াই ফেলিলেন। পিতৃদেব তাঁহার মাতা অপেক্ষা মাসীমাতারই হাতে গড়া মানুষ। ইহাঁকে বাবা 'বড় মা' বলিয়া ডাকিতেন। ইনি বাড়ীর কর্ত্রী ও অতি তেজস্বিনী রমণী ছিলেন। পিতৃদেব তাঁহার কিরূপ প্রিয় ছিলেন তাহা পরবর্ত্তী কালে ঠাকুরমার কথাতে বুঝিতে পারা যায়। বলিতেন 'দেখ হেম, তোমার 'বড় মা' তোমাকে ছাড়িয়া একদিনও থাকিতে পারিত না, তাই সে এখন কন্যারূপে তোমার নিকটে আসিয়াছে।' ইহার মৃত্যুতে বাবা বড় কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন।

পিতৃদেবের ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভ শৈশব হইতেই। ইহার জন্ম ভক্ত বৈষ্ণব পরিবারে; সুতরাং সকলেই শ্রীকৃষ্ণের উপাসক ছিলেন। তিনি যখন বড় আন্দুলিয়া গ্রামের প্রাইমারী স্কুলে পড়িতেন, শিক্ষকদের শাস্তি ও প্রহারকে বড়ই ভয় করিতেন। কোন কোন দিন পড়া ভাল না হইলে শিক্ষক অন্যান্য ছাত্রদের বেত্রাঘাত করিয়া তাঁহার দিকে যখন অগ্রসর হইতেন, বালক ভয়ে কাতর হইয়া চক্ষু বুজিয়া কৃষ্ণকে ডাকিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, কৃষ্ণকে স্মরণ করিলে তাঁহার সকল বিপদ কাটিয়া যাইবে। এবং সত্য সত্যই দেখিতেন যে শিক্ষক তাঁহার পাশ দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাঁহাকে আর শাস্তি দেন নাই! এই ঘটনা যখন হয়, তখন পিতৃদেবের বয়স ৭ বৎসরেরও কম। শিশুর প্রাণের এই ভগবৎ-বিশ্বাস পরে গভীর ভগবৎ-প্রেমে পরিণত হইয়াছে।

স্কুলের পড়া শেষ করিয়া কলেজে যখন পড়িতে যান, পিতৃদেবের তখনকার অধ্যবসায় ও কষ্টসহিষ্ণুতার দৃষ্টান্ত সংসারে বিরল। তখনকার তাঁর সেই দৈন্য ও কষ্টের কথা ভাবিলে চক্ষের জল রাখা যায় না। তাঁহার থাকিবার ও খাইবার সংস্থান ছিল না। যাঁহাদের অনুগ্রহে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, তাঁহাদের নিকট হইতে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। এই সকল যাতনার মধ্যেও তাঁহার গভীর জ্ঞানপিপাসা ও জীবনের উচ্চ আদর্শ, তাঁহাকে সকল সহ্য করিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইতে শক্তি দিয়াছিল। সে সময়ে বহরমপুরে থাকিয়া পড়িতেন। আর আজিমগঞ্জে তাঁহার মাতুলালয় ছিল। প্রতি সপ্তাহে শনিবার দিন বহরমপুর হইতে বাড়ীতে আসিতেন, ও সোমবার প্রাতে আবার হাঁটিয়া সেখানে ফিরিতেন। এইরূপ দারিদ্র্য দুঃখের মধ্যে আই এ পরীক্ষা পাশ করিলেন। এই পরীক্ষায় বহরমপুর ডিভিসনে প্রথম স্থান অধিকার করেন ও মাসিক ২০৲ টাকা বৃত্তি পান। ছাত্রজীবনের প্রারম্ভ হইতেই স্কুলে কৃতী ছাত্র বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। ক্লাসের প্রথম স্থান অধিকার করিতেন এবং শিক্ষক ইহাঁকে স্কুলের আশা ভরসাস্বরূপ দেখিতেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষার কৃতিত্বে তাঁহার এই যশ বহু পরিমাণে বাড়িয়া গেল। পিতৃদেব বলিতেন বহরমপুরে পড়িবার সময় আমার মনের বিকাশের সময় ছিল। তাঁহার এই সময়কার অনেক বন্ধু পরবর্ত্তীকালে দেশের মধ্যে ধনী ও পদস্থ হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এখনও বিদ্যমান। সেই সুদূর অতীতে কৈশোরে খেলা ধূলার মধ্যে ইহাঁদের মধ্যে যে বন্ধুত্ব ও স্নেহের বন্ধন স্থাপিত হইয়াছিল তাহা চিরকাল অক্ষুণ্ণ ছিল। বাবা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলেও, পিতৃদেবের প্রতি তাঁহাদের স্নেহের ধারা কখনও শুকায় নাই। ভ্রাতার অধিক স্নেহে, গুরুর মত শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে, পিতৃদেবের সহিত ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি। সহাধ্যায়ীদের মধ্যে একজন বাবার বিশেষ প্রিয় ছিলেন। ইহার নাম স্বর্গীয় নীলমণি ভট্টাচার্য্য। ইনিও এখন পরলোকে।

বহরমপুর হইতে বি এ পড়িতে কলিকাতায় আসিলেন এবং English, Sanskrit ও Philosophy এই তিনটী বিষয়ে honours লইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন এবং ৩০৲ বৃত্তি পান। তাহার পর এম এ পড়িতে আরম্ভ করেন। কলিকাতা থাকিয়া যখন পড়িতেন, তিনি স্বহস্তে রান্না করিয়া খাইতেন। শরীরের মধ্যে প্রাণটী রাখিবার জন্য যাহা আবশ্যক তাহার অধিক এক পয়সাও খরচ করিতেন না। তাঁহার পাকের ব্যবস্থা ছিল বাজারের সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা ও মোটা চাউলের ভাত ও কলাইএর ডাল; ইহা ভিন্ন কখনও কখনও শাকের চচ্চড়ি খাইতেন। এই খাইয়াই তিনি বিদ্যালয়ের উচ্চতর পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এম এ পড়িবার সময় তাঁহার ধর্ম্মজীবনের পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়। শৈশব হইতেই মাতার দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামজনিত দুঃখ পিতৃদেবের প্রাণে গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল। তিনি তাঁহার সে দুঃখ

নিবারণের জন্য জীবনের প্রথম হইতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। যখন হইতে বৃত্তি পাইলেন, তাহা হইতে কিছু বাঁচাইয়া পরিবারের সাহায্যের জন্য টাকা পাঠাইতেন। মাতা ও পরিবারের দুঃখ নিবারণই তখন তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। তখন তাঁহার আকাঙ্ক্ষা, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া অর্থোপার্জ্জন করিবেন ও পরিবারের দুঃখ দূর করিবেন। তাঁহার কৃতিত্বের খ্যাতি যেরূপ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, এই পদ লাভ করা তাঁহার পক্ষে কিছুই শক্ত ছিল না। আজীবন দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া দুঃখ দৈন্যের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার পূর্ব্বমুহূর্ত্তেই, পরিবারস্থ সকলের অসন্তোষ আক্ষেপ ও ক্রন্দনের মধ্যে, সকলের প্রাণকে দগ্ধ করিয়া চলিয়া আসা কত বড় কঠিন কাজ, তাহা কল্পনা করা সম্ভব নয়। ব্রাহ্মসমাজে চলিয়া আসিবার দিনে ঠাকুরমার প্রাণে কি বাজ হানিয়াছিলেন, তাহা চিরজীবন স্মরণ রাখিয়াছিলেন, এবং তাঁহার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত গ্রন্থে লিখিয়াছেন 'যিনি শচী মাতার মত অসীম সহিষ্ণুতায় দারুণ মনোবেদনা সহ্য করিয়াছিলেন'। এতকাল তাঁহার মাতুল পরিবারের ভার লইয়াছিলেন। বাবা ব্রাহ্ম হইবেন শুনিয়া এবং তাঁহার শাসন অনুরোধ প্রভৃতির কিছুই ফল হয় নাই দেখিয়া, তিনি পরিবারের সকলের ভার পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহাদের সব বক্সীপুরে প্রেরণ করা হইল এবং বলিলেন, "অদ্য হইতে তোমার মা ও বাবার ভার আমি আর রাখিব না।" এইরূপ অসহায় ও বিপন্ন অবস্থাও তাঁহাকে তাঁহার সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিল না। পিতৃদেবের ধর্ম্মান্তর গ্রহণের কথা শুনিয়া তাঁহার অশীতিপর বৃদ্ধ মাতামহ (কর্ত্তা দাদা) অন্নজল ত্যাগ করিলেন। পিতৃদেব বৃদ্ধের শরীরের বল ও চক্ষুর জ্যোতি ছিলেন। ব্রাহ্ম হইবার সংবাদ পাইয়াই আত্মীয় স্বজন সকলেই কলিকাতায় তাঁকে ঘেরিয়া ফেলিলেন এবং প্রথমে শাসনে, পরে অনুরোধে বুঝাইতে ও ফিরাইতে অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুই হইল না। তাহার পর যখন শুনিলেন যে, তাঁহার বৃদ্ধ 'কর্ত্তা-দাদা' অন্নজল ত্যাগ করিয়া তাঁহার জন্য বসিয়া আছেন, এবং তিনি না গেলে খাইবেন না, তখন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, বাড়ী ফিরিলেন। বাড়ী যখন পৌছিলেন, রাত্রি ১২টা। তখনও বৃদ্ধ পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন। গাড়ীর শব্দ শুনিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হেম আসিয়াছে? কই হেম?' দৌহিত্রকে দেখিয়া তাঁহার আর আনন্দের সীমা নাই। তিনি তখন তাঁহার খাবার আনিতে আদেশ করিলেন এবং বলিলেন, 'এখন আমার শরীরে এত বল আসিয়াছে যে এখনই আমি বারো মাইল হাঁটিয়া যাইতে ও আসিতে পারি।' এইবার বাড়ীর সকলে সতর্ক হইলেন, এবং কোন প্রকারে পলায়ন করিতে যাহাতে না পারেন, সকলের দৃষ্টি তাঁহার উপর রহিল। সর্ব্বদাই কেহ না কেহ সঙ্গে থাকিতেন। ষ্টেশনে বলিয়া রাখা হইয়াছিল যাহাতে বাবাকে টিকেট না দেওয়া হয়। এইরূপ বদ্ধ অবস্থায় কয়েকদিন থাকিয়া, একদিন সুযোগ পাইয়াই ট্রেন ছাড়িবার ঠিক পূর্ব্বেই তাহাতে লাফাইয়া উঠিলেন। এইরূপে গৃহ হইতে পলায়ন করিয়া ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলেন। যাঁহাদের না দেখিলে বা যাঁহাদের স্নেহের বাণী না শুনিলে জীবন চলা ভার হয়, তাঁহাদের পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইতে যে কঠোর সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল, এবং যে ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষা ইহার পশ্চাতে ছিল, তাহার শক্তি কত প্রবল ছিল তাহা অনুমান করা কঠিন।

ইহার পর পিতৃদেবের জীবন ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে জড়িত। তিনি যখন হিন্দু ছিলেন, নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন, এবং যখন ব্রাহ্ম হইলেন, তখন সমগ্র প্রাণ দিয়াই তাহা গ্রহণ করিলেন। প্রথমে তাঁহার নববিধান সমাজের সহিত যোগ ছিল। পরে যখন বাবা সাধারণ সমাজে আসেন, শুনিয়াছি স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলিয়াছিলেন, "হেমকে শাস্ত্রী হাতে ধরিয়া লইয়া গেল! তাহাকে তোমরা রাখিতে পারিলে না? হেম কিন্তু খাঁটি হেম"। পিতৃদেব যখন সমাজে যোগ দিলেন, তিনি তাঁহার ভবিষ্যতের সকল ঐহিক উচ্চ আশা সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিলেন, এবং আপনার বলিয়া কিছু রাখিলেন না। ইহার পরের কর্ম্মজীবন অল্পাধিক পরিমাণে সকলেরই বিদিত। ১৮৭৭ সালে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন এবং সমাজের কাজে সম্পূর্ণ ভাবে আপনাকে দান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাহার পরই তাঁহাকে বাঁকিপুর সাধনাশ্রমে প্রেরণ করা হয়। রাম-মোহন সেমিনারী প্রতিষ্ঠিত হইবার পর প্রথমে যে চারজন এম এ পাশ করা শিক্ষক শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে পিতৃদেব একজন। তিনি তখন স্কুলে পড়াইতেন, টিউসানী করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেন, এবং আশ্রমের ভাণ্ডারী ছিলেন। টিউসানী করিয়া ৮০৲ ৯০৲ টাকা পাইতেন; তৎসমুদয় আশ্রমে দিতেন। তাহা হইতে তাঁহার পিতামাতার জন্য ১০৲ টাকা তাঁহাকে দেওয়া হইত। Savings Bank এ যাহা জমা ছিল, তাহাও তিনি আশ্রমে দিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি Manchester Scholarship লইয়া বিলাতে গমন করিলেন। এই বৃত্তিটী কিরূপে পাইলেন তাহার একটু ইতিহাস আছে। ব্রাহ্মসমাজ কমিটী বৃত্তিপ্রার্থীদের মধ্য হইতে রামমোহন রায় নামক একজন যুবকের সহিত অনেক বাদানুবাদ হয়। তাহাকে বৃত্তি দেওয়া যাইতে পারে কিনা কমিটী স্থির করিতে না পারিয়া, তাহার সকল চিঠিপত্র ও আবেদন বিলাতে প্রেরণ করেন, এবং তাহার সহিত পিতৃদেবের নামও 'as an alternative proposal' রূপে যুক্ত করিয়া পাঠান হয়। লণ্ডনের কমিটী সমস্ত পাঠ করিয়া বৃত্তিটী পিতৃদেবকে দেওয়াই স্থির করিলেন; সেই বৎসর আর যাইবার সময় না থাকায়, তাহার পরবর্ত্তী বৎসর বাবা বিলাতে গমন করেন। তখন হইতে প্রচার কার্য্যের জন্য আপনাকে প্রস্তুত করেন। প্রচারকরূপে তিনি St. Xaviour, St. Paul প্রভৃতি মহাত্মাদের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চলিতেন। কোথাও কিছু সম্বল নাই, কোন সঞ্চয় বা ব্যবস্থা নাই, পরিবারের দারুণ অভাবজনিত দুঃখের ছবি বুকে লইয়া, 'ভগবান আমার ভার গ্রহণ করিবেন' এই বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া, আগুনে ঝাঁপ দিলেন। ইহার পশ্চাতের শক্তি ও বিশ্বাসের বল কতখানি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিতে পারি না। বিলাতে বাসকালে

তিনি তাঁহার শিক্ষক, সহাধ্যায়ী ও বন্ধুদের অত্যন্ত আদর, শ্রদ্ধা ভক্তি ও সম্মানের পাত্র হইলেন। তাঁহাদের বন্ধুত্ব ও প্রীতি অদ্যাপি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। বিলাতে থাকিতে যাঁহাদের প্রভাব তাঁহার জীবনে বিশেষভাবে কাজ করিয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে Prof. Upton, Dr. Carpenter ও Dr. Drummond এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি সুবিখ্যাত পণ্ডিত Prof. MaxMuller, Rev. Bowie, Rev. Ion Pritchard প্রভৃতির শ্রদ্ধা ও আদরের পাত্র ছিলেন। তাঁহার সহাধ্যায়ীদের মধ্যে কেহ কেহ এখনও ইহলোকে আছেন। তাঁহাদের মধ্যে Rev. Miss Harrington ও Dr. Gublerএর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। Miss Harringtonএর সহিত আজীবন বাবার যে অকৃত্রিম বন্ধুত্ব ছিল তাহা আদর্শস্থানীয়। দেখা না হইলেও পৃথিবীর সুদূর প্রান্ত হইতে ইনি পিতৃদেবের সহিত চিঠির মধ্যে অনেক আধ্যাত্মিক তত্ত্বের বিষয়ে আলোচনা করিতেন। Dr. Gubler তাঁহার লিখিত পুস্তক পিতৃদেবকে উৎসর্গ করিয়াছেন। ইঁহাদের গৃহে বাবা কয়েকদিন মাত্র ছিলেন; পিতৃদেব যে তাঁহাদের একটি tea-pot উপহার করিয়াছিলেন তাহা তিনি অদ্যাপি বহুমূল্য সম্পদের মত যত্নে রক্ষা করিয়াছেন এবং ব্যবহার করিতেছেন। এই সংবাদ গত বৎসর তাঁহার এক পত্রে জানিতে পারিয়াছিলাম। বিলাতে থাকিবার সময়ে তিনি একটি রচনা লিখিয়া বিশেষ একটি পুরস্কার লাভ করেন। তাঁহাকে তখন সুলেখক বলিয়া সকলে জানিতে আরম্ভ করিলেন।

পিতৃদেব বাহিরের আড়ম্বর ভালবাসিতেন না। তিনি যখন বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করেন, পাছে বন্ধুরা তাঁহার আগমনে আনন্দোৎসব করেন, এইজন্য কাহাকেও কোন সংবাদ না দিয়া কলিকাতায় ফিরিলেন। স্বদেশে আসিয়াই তাঁহার প্রথম কার্য্যক্ষেত্র বাঁকিপুরে, এবং তথা হইতে বাড়ীতে পিতামাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। গৃহে তাঁহার 'কর্ত্তাদাদা' দৌহিত্রকে দেখিবার জন্যই যেন প্রাণ ধারণ করিয়াছিলেন। পিতৃদেবের স্বদেশপ্রত্যাবর্ত্তনের অল্পদিন পরেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

কলিকাতায় ফিরিয়াই পিতৃদেব অদম্য উৎসাহে কর্ম্মক্ষেত্রে নামিলেন। এখন হইতে তাঁহার সমগ্র চিন্তা ও শক্তি ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিসাধনে নিযুক্ত হইল। ব্রাহ্মসমাজকে কিরূপে জাগ্রত করিবেন, উপাসকমণ্ডলীকে কিরূপে শক্তিশালী করিবেন, এবং সর্ব্বোপরি যে মহান ধর্ম্ম ও আদর্শ জীবনে লাভ করিয়াছিলেন, তাহা ভারতের ধনী দরিদ্র ও জ্ঞানী মূর্খ নির্ব্বিশেষে সকলকে দান করিতে পারিবেন, ইহাই তাঁহার দিবারাত্রি চিন্তার বিষয় হইল। প্রচারক হিসাবে পিতৃদেবকে অনেক কাজ করিতে হইত। অপরদিকে স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া Bengal Depressed Class Mission গড়িয়া তুলিলেন। স্বর্গীয় পৃথীশচন্দ্র রায়, Dr. B. L Choudhury, প্রভৃতি তাঁহার সহকর্মী ছিলেন। ইহা ১৯০৮ সালের কথা। Lord Sinha ইহার প্রথম সভাপতি ও ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কোষাধ্যক্ষ ছিলেন ও শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র তাহার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। বাবা বহুবৎসর ইহার General Secretrry ছিলেন। কতবার স্বয়ং মালিয়াট প্রভৃতি স্থানে গিয়া পরিদর্শন করিয়া কাজ করিয়া আসিতেন। তাহার পর বহু বৎসর পর্য্যন্ত, যতদিন কার্য্য করিবার শক্তি ছিল, ইহার জন্য অনেক পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন All India Theistic Conference এর বহুবৎসর সম্পাদক হইয়া তাহার কার্য্য পরিচালনা করেন, এবং তাঁহারই চেষ্টায় ইহা একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হইয়া উঠিয়াছিল। দীর্ঘকাল ধরিয়া এবং শেষ পর্য্যন্ত Brahamo Samaj Committee র সম্পাদক ছিলেন।

কলিকাতার এই সকল কার্য্যভারের মধ্যেও তিনি বৎসরে ৯ মাস বাহিরে প্রচারার্থে থাকিতেন। মাদ্রাজ, বম্বে, পাঞ্জাব, হাইদ্রাবাদ, Central India প্রভৃতি সকল স্থানে, সমগ্র ভারতময় ঘুরিয়া, যেখানে পরিচিত কেহ আছেন সেই সকল স্থান যাহাতে একটি ব্রাহ্মসমাজের কেন্দ্র হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করিতেন। তাঁহার চেষ্টায় অনেক স্থানে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই প্রচারকার্য্য কিরূপ কষ্ট ও অসুবিধার মধ্যে চালাইতেন, তাহা একটি বিস্ময়কর ব্যাপার। প্রথম জীবন হইতে যেরূপ ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া অদম্য উৎসাহে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা দেখিলে মনে হয় যে ভগবান ইঁহাকে প্রচারক করিয়াই পাঠাইয়াছেন। ভগবানের ও ব্রাহ্মসমাজের কাজ করিতে করিতে তাঁহার জীবন যদি সাঙ্গ হয়, এবং ব্রাহ্ম-সমাজ ও জনসমাজের সেবায় যদি দেহের শেষ রক্তবিন্দু ক্ষয় করিতে পারেন, তাহা হইলে আপনাকে ধন্য ও জীবন কৃতার্থ বোধ করিবেন, এই তাঁহার আদর্শ ছিল। ব্রাহ্মসমাজ বলিতে তিনি কোন একটি দলের সমাজ বলিয়া মনে করিতেন না, একটি মহৎ আদর্শ বুঝিতেন এবং যেখানে সে আদর্শ ফুটিয়াছে, তাহাই ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত বলিয়া ধরিয়া লইতেন।

এই প্রচার কার্য্যে যোগদিতে পিতৃদেবকে কত প্রকার প্রলোভন হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে হইয়াছিল, তাহা এখানে লেখা সম্ভবপর নহে। তাঁহার দৈহিক সৌন্দর্য্য, অসাধারণ কৃতিত্ব, ত্যাগশীল জীবন ও মহৎ অন্তঃকরণ দেখিয়া কত ধনী, পদস্থ ও জমিদার তাঁহাকে জামাতারূপে লাভ করিতে লালায়িত হইয়াছিলেন। কিন্তু কেহ তাঁহাকে তাঁহার জীবনের আদর্শচ্যুত করিতে পারেন নাই। ইংলণ্ডে থাকিবার সময়েও এই প্রকার প্রলোভন হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

১৯০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পিতৃদেব স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, এবং নবেম্বর মাসের মেসেঞ্জারে লিখিত আছে যে তিনি আশ্রমের পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই সময়ে তিনি মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ ব্রাহ্মসমাজ লাইব্রেরী গৃহে থাকিতেন। এখন হইতে Messenger এর পরিচালনার ভারও তাঁহার উপরে পড়িল। প্রথম কয়েক বৎসর নামে Assistant Editor হইয়া ছিলেন, পরে Editor হইয়া বহু বৎসর পর্য্যন্ত ইহার কার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন। এই সময়ের Messenger

দেখিলে দেখিতে পাই, তিনি Brahmo Year Book করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর হইতেই তিনি প্রচারকার্য্য আরম্ভ করেন। যদিও ইহার অনেক বৎসর পরে ১৯০৮ সালে Ordained Missionary হন। তখন প্রতি বৎসর মাদ্রাজ অঞ্চলে প্রচারার্থ বাহির হইতেন। তাঁহার কার্য্যাবলী ও বক্তৃতা জনসাধারণ কিরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতেন, তাহা তখনকার কাগজ হইতে একটু উদ্ধৃত করিতেছি :—

Our energetic and devoted worker Babu Hemchandra Sarker is being much appreciated by the friends of the Thiestic cause all over the Madras Presidency. Reports are coming to us from almost all the places he has visited that his tour is giving a fresh stimulus to the struggling workers of the cause everywhere. The *Thiestic Light* says, Mr. Sarkar's visit has, by the will of God, been instrumental in deepening and strengthening the spirituality of our little congretion" etc. তাঁহার কিরূপ personality ছিল এবং জনসাধারণকে কিরূপ অনুপ্রাণিত করিতে পারিতেন, তাহা নিম্নলিখিত ঘটনায় জানা যায়। The Prayer Hall of the Southern India Brahma Samaj witnessed a ceremony of unique importance and solemnity on the morning of 23rd instant. It was the occasion of taking a vow of consistent and uncompromising Brahmo life by certain members of the Samaj. There was a special divine service conducted by Babu Hemchandra Sarker who preached a short sermon, "we walk by faith, not by sight." After the service, one by one six prominent members, some young, some old, came up and in touching words recalled the past experiences of their spiritual life and prayed for strength to keep their new resolve...

নূতন যাহারা প্রচার কার্য্যের জন্য আসিতেন, তাঁহাদের শিক্ষার জন্য পিতৃদেবেরই উদ্যমে ১৯০৭ সালে Theological College স্থাপিত হইয়াছিল। বর্দ্ধমানের মহারাজা ইহার president ছিলেন এবং বাবা ইহার সম্পাদক ছিলেন। এই কলেজ পিতৃদেবের উদ্যমে বহুকাল পর্য্যন্ত চলিয়াছিল, পরে চালাইবার লোকের অভাবে উঠিয়া গিয়াছে। দরিদ্র বালকদের অর্থ সাহায্যের জন্য একটি Needy Students' Fund করিয়াছিলেন। ইহাও পরে উঠিয়া গিয়াছে। বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিবার কিছুকাল পরেই মাতৃদেবীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়, এবং তখন হইতে তাঁর সহিত রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয় ও তথা হইতে প্রকাশিত 'মুকুল' পরিচালনার অনেক কার্য্যই পিতৃদেব করিতেন। মা যদিও সম্পাদিকা ছিলেন, কার্য্যকর্ম্ম সব বাবাই করিয়াছেন।

যেরূপ কষ্টের মধ্যে প্রচার কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ জানা নাই। The Lord is my shepherd, I shall not want' এই মন্ত্র লইয়া গৃহ হইতে বাহির হইতেন। কাহারও নিকট অর্থ চাহিতেন না। অর্থের কোনও ব্যবস্থাও ছিল না, থাকিবার কোন সংস্থান ছিল না। নূতন প্রদেশে, যাঁহারা তাঁহার ভাষা বা ভাব বুঝিত না—এইরূপ নূতন লোকের মধ্যে অনিশ্চিতের উপর নির্ভর করিয়া প্রচারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। ঐহিক সম্বলের মধ্যে ছিল তাঁহার ভাবপূর্ণ মুখ ও ব্যক্তিত্ব! যে সকল প্রদেশে ব্রাহ্ম বলিতে মেথর অপেক্ষা হীন ধারণা লোকে করিত, সেখানে প্রচারে প্রবৃত্ত হইলে কতপ্রকার নির্য্যাতন ভোগ করিতে হয় অনুমান করিতে পারা যায়। কোথাও কোথাও স্থানের অভাবে তাঁহাকে আস্তাবলে খড় বিছাইয়া তাহার উপর বিছানা করিয়া রাত্রি যাপন করিতে হইয়াছিল। মনের শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকিলেও শরীর আর সহ্য করিতে পারিল না। ১৯০৮ সালেই পিতৃদেব বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হন, এবং তখন তাঁহার জীবনের সংশয় হইয়াছিল। তখন হইতেই তাঁহার শরীর ক্রমশঃ ভাঙ্গিতে লাগিল। কিন্তু তিনি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত করিয়া গিয়াছেন। যতদিন চলাফেরার শক্তি ছিল প্রচার কার্য্য করিয়াছেন এবং সে শক্তি যখন চলিয়া গেল, গৃহে বসিয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। শতবার্ষিক মহোৎসবোপলক্ষে যে সকল পুস্তক ছাপাইবার কথা ছিল, শেষদিন পর্য্যন্ত তাহার পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। ১৯১৩ সালে দীর্ঘকালের প্রচারের পর পাঞ্জাবের কার্য্যক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। সেই উপলক্ষে পাঞ্জাবের বন্ধুগণ তাঁহাকে যে অভিনন্দন পত্র দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রচারের উদ্যম, ঐকান্তিকতা উল্লিখিত আছে।

* "We can better realise than describe the solace that can be imbibed in your company. One is sure to find in you an untiring person, ever ready to serve humanity, inspite of weak health and circumstances. You will perhaps wonder to hear from us that the several occasions on which you conducted divine service and preached sermons, in Hindi, had a singular effect on our minds. It seemed as though ideas, in their original form, flowed direct, from your heart to ours. To use a scientific term they were in a "nascent condition." Their effect was, perhaps, more lasting, than it would have been, had you arrayed them in flowers of rhetoric. We shal allways keep before our mind's eye your frequently suggested watchwords :—

"For right is to follows right"
"There's wisdom in scorn of consequence."
"Lord is my shephard, I shall not want."

(ক্রমশঃ)

ব্রাহ্মসমাজ

মাঘোৎসব—প্রেমময়ের অপার করুণায় আমাদের প্রিয় মাঘোৎসব পুনরায় সমুপস্থিত। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে ত্র্যধিকশততম মাঘোৎসব সম্পন্ন করিবেন, এরূপ স্থির করিয়াছেন। আবশ্যক হইলে ইহার কিছু পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে। ব্যাকুল হৃদয় বিশ্বাসিগণের সম্মেলনের উপর উৎসবের সফলতা বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। তাই কার্য্যনির্ব্বাহক সভা উৎসবে যোগদান করিবার জন্য সকলকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিতেছেন।

১লা মাঘ, ১৪ই জানুয়ারী শনিবার—প্রাতে ব্রাহ্মপরিবারে ও ছাত্রছাত্রীভবনে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণার্থ উপাসনা ও প্রার্থনা সন্ধ্যায়—ঐ

২রা মাঘ, ১৫ই জানুয়ারী রবিবার—প্রাতে -ঐ। সন্ধ্যায় উদ্বোধন, আচার্য্য—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

৩রা মাঘ, ১৬ই জানুয়ারী সোমবার—প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত মথুরানাথ নন্দী। সন্ধ্যায় বক্তৃতা—বক্তা শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

৪ঠা মাঘ, ১৭ই জানুয়ারী মঙ্গলবার—প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র সোম। সন্ধ্যায় বক্তৃতা—বক্তা ডাঃ কালিদাস নাগ।

৫ই মাঘ, ১৮ই জানুয়ারী বুধবার—প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত। সন্ধ্যায়—সঙ্গত সভার উৎসব।

৬ই মাঘ ১৯শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার—মহর্ষি স্মৃতিদিবস—প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ; সন্ধ্যায় স্মৃতিসভা—সভাপতি স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায়। বক্তা—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসু।

৭ই মাঘ, ২০শে জানুয়ারী শুক্রবার—প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী। সন্ধ্যায়—তত্ত্ববিদ্যা-সভার উৎসব উপলক্ষে বক্তৃতা; বক্তা—পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, বিষয়—প্রেমালোকে ব্রহ্মলোক প্রকাশ।

৮ই মাঘ, ২১শে জানুয়ারী শনিবার—প্রাতে মহিলাদিগের উৎসব। পুরুষদিগের জন্য সিটিকলেজে উপাসনা। সন্ধ্যায়—বার্ষিক সভা (কেবল সভ্যদিগের জন্য)।

৯ই মাঘ, ২০শে জানুয়ারী রবিবার প্রাতে যুবকদিগের উৎসব; মধ্যাহ্নে—যুবকদিগের আলোচনা সভা; অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায়—বরাহনগর শ্রমজীবিগণের নগর কীর্ত্তন। সন্ধ্যায় উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য।

১০ই মাঘ, ২৩শে জানুয়ারী সোমবার—প্রাতে কলিকাতা উপাসকমণ্ডলীর উৎসব। আচার্য্য শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী। মধ্যাহ্নে নবদ্বীপচন্দ্র স্মৃতিসভা; সভাপতি—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র। বক্তা—শ্রীযুক্ত সরোজেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্তা অবন্তী ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় নগর কীর্ত্তন। সন্ধ্যায়—উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র।

১১ই মাঘ, ২৪শে জানুয়ারী মঙ্গলবার সমস্তদিনব্যাপী উৎসব প্রত্যূষে—কীর্ত্তন। প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। মধ্যাহ্নে উপাসনা—আচার্য্য শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু। তৎপরে পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রভৃতি; অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় ইংরাজীতে উপাসনা, আচার্য্য—শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায়; সন্ধ্যায় উপাসনা, আচার্য্য পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ।

১২ই মাঘ, ২৫শে জানুয়ারী বুধবার—প্রাতে সাধনাশ্রমের উৎসব। আচার্য্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। মধ্যাহ্নে প্রচার বিষয়ে আলোচনা, সভাপতি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত আলোচনা উত্থাপন করিবেন। সন্ধ্যায় বক্তৃতা—বক্তা শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ।

১৩ই মাঘ, ২৬শে জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার—প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু। অপরাহ্ণ ৩টায় বালক-বালিকা সম্মিলন। সন্ধ্যায়—ছাত্রসমাজের উৎসব উপলক্ষে বক্তৃতা। বক্তা ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র।

১৪ই মাঘ, ২৭শে জানুয়ারী শুক্রবার—প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী বি, এ। অপরাহ্ণ ৪টায় মেরীকার্পেণ্টার হলে রবিবাসরীয় নীতি বিদ্যালয়ের উৎসব। সন্ধ্যায় উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায়।

১৫ই মাঘ, ২৮শে জানুয়ারী শনিবার—প্রাতে উপাসনা—অপরাহ্ণ—লাইব্রেরীর দ্বারোদ্ঘাটন। সন্ধ্যায় ইংরাজীতে উপাসনা, আচার্য্য পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ।

১৬ই মাঘ, ২৯শে জানুয়ারী রবিবার—প্রাতে উপাসনা আচার্য্য শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন; সন্ধ্যায় শান্তিবাচন—আচার্য্য শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ।

উপাসনাদি সমস্ত কার্য্য প্রাতে ৭ ঘটিকায় ও সন্ধ্যায় ৬॥ ঘটিকায় আরম্ভ হইবে।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ৫ই জানুয়ারী কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত সুধাংশু-মোহন বসুর পত্নী রমলা বসু দীর্ঘকাল রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়া স্বামী, তিন কন্যা, বৃদ্ধ পিতামাতা ও বহু আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবদিগকে শোকসাগরে ভাসাইয়া ৪২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি মনস্বিনী ও মধুর প্রকৃতির মহিলা ছিলেন। অনেক স্থলেই তাঁহার অভাব অনুভূত হইবে।

বিগত ৫ই জানুয়ারী পরলোকগত হেমচন্দ্র সরকার মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য এবং পালিতা কন্যা কুমারী শকুন্তলা রাও ও ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ সরকার জীবনীপাঠ ও প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে কন্যা উল্টাডাঙ্গার শিবনাথ সাধন-কুটীর নির্ম্মাণের জন্য পরলোকগত কানাইলাল সেন যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন তাহা সুসম্পন্ন করিয়া দিবার

এবং হেমবাবুর অপ্রকাশিত গ্রন্থাদি প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। বিগত ৮ই জানুয়ারী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও সাধনাশ্রমের পক্ষ হইতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়। তাহাতেও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। কলিকাতার বাহিরেও সকল ব্রাহ্মসমাজে উক্ত দিবস শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে।

বিগত ২৬শে ডিসেম্বর বেনারস নগরীতে শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা রাধিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় পরলোক গমন করেন। বিগত ৫ই জানুয়ারী কলিকাতা নগরীতে তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ আচার্য্যের কার্য্য ও পুত্র সংক্ষিপ্ত জীবনীপাঠ ও প্রার্থনা করেন উপলক্ষে সাধারণ বিভাগে ২৲ টাকা, প্রচার বিভাগে ২৲ টাকা, দুঃস্থ ব্রাহ্মপরিবার ভাণ্ডারে ২৲ ও সাধনাশ্রমে ২৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে।

বিগত ৬ই জানুয়ারী মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত রসোরা গ্রামে উপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ পত্নীকে অসহায় অবস্থায় রাখিয়া ৬৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ভক্তিমান ও সেবাপরায়ণ লোক ছিলেন।

বিগত ৯ই জানুয়ারী রায় সাহেব কমললোচন দাস তাঁহার কর্ম্মস্থল বর্দ্ধমানের অন্তর্গত এণোরা গ্রামে হৃদ্‌রোগে হঠাৎ পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি অতি নিষ্ঠার সহিত গৌহাটী ও অন্যান্য ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়া গিয়াছেন এবং চরিত্রগুণে বহু লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চিরশান্তিতে রাখুন ও আত্মীয়স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

শুভ বিবাহ—বিগত ১১ই জানুয়ারী কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত অময়চন্দ্র হালদারের কন্যা কল্যাণীয়া প্রকৃতি ও শ্রীমান পান্নালাল ভট্টাচার্য্যের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ১২ই জানুয়ারী কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ সরকারের দ্বিতীয়া কন্যা কল্যাণীয়া লতিকা ও শ্রীযুক্ত কেদারনাথ হাজরার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান গৌরহরির শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন আচার্য্যের কার্য্য করেন।

গত ২৮শে ডিসেম্বর ঢাকা অনাথ-আশ্রমের পালিতা কন্যা কল্যাণীয়া মানকুমারী দের শুভবিবাহ নদীয়া জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণনগরনিবাসী শ্রীমান মৃত্যুঞ্জয় বসুর সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসু আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন।

প্রেমময় পিতা নবদম্পতিদিগকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

প্রচার—শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী গত ৩রা ডিসেম্বর মুর্শিদাবাদ গমন করেন। মুর্শিদাবাদ ব্রাহ্মসমাজে রবিবারে উপাসনা এবং সোমবারে "ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের সত্যরূপ" বিষয়ে বক্তৃতা করেন এবং একটি পারলৌকিক অনুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য করেন। তৎপর রাজসাহী গমন করিয়া নিম্নলিখিতভাবে কার্য্য করেন—রাজসাহী ব্রাহ্মসমাজে দুই দিন উপাসনা ও "ধর্ম্মসকলের একত্বের জ্ঞান" বিষয়ে একদিন বক্তৃতা, রাজসাহী কলেজে "গীতায় ঈশ্বরতত্ত্ব ও সাধনা" বিষয়ে বক্তৃতা; বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজে একদিন উপাসনা; শ্রীযুক্তা নিরুপমা বসুর নিমন্ত্রণে তাঁহার গৃহে স্থানীয় মহিলাগণের সম্মিলনে উপাসনা ও উপদেশ দান; শ্রীযুক্ত পি চৌধুরীর গৃহে একদিন উপাসনা করেন। তৎপর বগুড়ায় গমন করিয়া বগুড়া ব্রাহ্মসমাজে শনিবারে "মানবে ঈশ্বরের প্রেম ও আত্মদান" সম্বন্ধে বক্তৃতা ও রবিবারে উপাসনা করেন। এতদ্ব্যতীত বগুড়া ব্রাহ্মসমাজে একদিন প্রার্থনা ও পরলোকগত প্যারীশঙ্কর দাশগুপ্তের পারিবারিক উপাসনা-গৃহে প্রার্থনা করেন। তথা হইতে রঙ্গপুর গমন করিয়া রামমোহন ক্লাব-গৃহে ক্লাবের সভাপতি ও সম্পাদকের উদ্যোগে "রাজার পুস্তকসমূহের মর্ম্ম" বিষয়ে বক্তৃতা এবং রঙ্গপুর ব্রাহ্মসমাজে "ধর্ম্মের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ব্রাহ্মসমাজে রবিবারে উপাসনা ও অন্য আর একদিন প্রার্থনা করেন, ব্যক্তিগতভাবে ধর্ম্মালোচনা এবং স্থানীয় সমাজে 'বর্ত্তমান অবস্থায় যাহা করা প্রয়োজন' সে বিষয়ে পরামর্শ ও ও যথাশক্তি সাহায্য করেন। তৎপর তিনি দিনাজপুর গমন করিয়া স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজে একদিন উপাসনা, একদিন "সংসার ও ধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা ও একদিন পরলোকগত প্রচারক হেমচন্দ্র সরকার ও আচার্য্য ললিতমোহন দাসের মৃত্যু উপলক্ষে উপাসনা করেন।

গোয়ালপাড়ার অন্তর্গত নলবাড়ী নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামদাস কাছারী কয়েক বৎসর হইল ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গত নবেম্বরের মধ্যভাগ হইতে ডিসেম্বরের প্রায় মধ্যভাগ পর্য্যন্ত যে প্রচার করিয়াছেন, তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে। তিনি ১৫ই নবেম্বর ভীমাজুলী নামক একটি গারো গ্রামে গিয়া অনেক লোকের সহিত ধর্ম্মালোচনা করেন। ১৮ই লাউসী গ্রামে গিয়া বহু লোকের সহিত ধর্ম্মালোচনা এবং রবিবারের দিন উপাসনা করেন। এই উপাসনায় গারো, কাছারী এবং কয়েকজন হিন্দুও যোগ দিয়াছিলেন। তৎপর বারদা ও দারকা গ্রামে গিয়া ২১শে ও ২২শে সন্ধ্যা ও সকালবেলা গারো ও রাভাদিগের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ২৩শে লাউসী পাড়ায় রাভা ও কাছারীদিগের গৃহে গিয়া প্রচার করেন। ২৬শে নবেম্বর হইতে ৩রা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত (দ্বিতীয়) নলবাড়ীর চতুর্দ্দিকে কাছারীদিগের গ্রামে গিয়া প্রচার করেন। ৬ই ডিসেম্বর পুনরায় লাউসী গ্রামে গিয়া প্রচার করেন। ১০ই বড়মাটিয়া গ্রামে গমন করেন। সেখানে প্রায় দেড় বৎসর হইল ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তথায় গিয়া রবিবার ১১ই ডিসেম্বর উপাসনা করেন।

গত ২৭শে ডিসেম্বর কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় ও শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মেদিনীপুর জেলার হিজলী গ্রামে গমন করিয়া শ্রীযুক্ত রসিক লাল রায়ের ভবনে উপস্থিত হইয়া পারিবারিক উপাসনা করেন। শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। ২৮শে ডিসেম্বর প্রাতঃকালে ওখান হইতে বলরামপুর গমন করিয়া স্বগীয় সীতানাথ বক্সীর বার্ষিক শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রাতঃকালে বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রপাঠ করেন। অপরাহ্নে অতুলবাবু "আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতান্তে বরদাবাবু কথকতা করেন। বলরামপুর হইতে পুনরায় হিজলী আসিয়া ২৯শে সকালে অতুলবাবু পারিবারিক উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় কলিকাতা ফিরিয়া আসিয়া নিমতা গমন করিয়া স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে আচার্য্যের কার্য্য করিয়া, তৎপর কথকতা করেন।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাগ কর্ত্তৃক ২৯শে পৌষ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।—সম্পাদক শ্রীবরদাকান্ত বসু, বি-এ

Registered No. 65

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতি র্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ
১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫৫ ভাগ
২০শ সংখ্যা।

১৬ই মাঘ, রবিবার ১৩৩৯, ১৮৫৪ শক.
ব্রাহ্মসংবৎ ১০৪
29th January, 1933.

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০
অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩.

প্রার্থনা।

স্নেহময়ী জননী, উৎসবের মধ্যে তোমার করুণাধারা ত প্রচুর পরিমাণেই বর্ষণ করিতেছ! আরও কত করুণা বর্ষিত হইবে জানি না। তুমি ত প্রথম হইতেই সম্পূর্ণরূপে তোমার অনুগত হইয়া নূতন উৎসাহ উদ্যমে জীবনকে কল্যাণ ও মহত্ত্বের পথে চালিত করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতেছ। আমাদের ডাকিয়া আনিয়া, আমাদের জীবনে ও সমাজে নানা রূপে তোমার জীবন্ত কার্য্যের বিবিধ পরিচয় দিয়া, আমাদের উপর গুরুতর দায়িত্বই প্রদান করিয়াছ। মৃত্যুর মধ্য দিয়া বিশেষ ভাবে অমর জীবনের জন্যই আহ্বান করিতেছ। এবার আমাদের জন্য যে-সকল অমূল্য সম্পদ্ রাখিয়াছ, তাহারও অনেক আভাস প্রদান করিতেছ। আমরা তোমার অপার কৃপার দানসকল উপযুক্ত রূপে গ্রহণ করিতে পারিতেছি কি না তুমিই জান। তুমি প্রাণে আশা জাগাইতেছ, তোমার কৃপায় আমরা এবার নব জীবন লাভ করিতে সমর্থ হইব, আর পূর্ব্বের ন্যায় মৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকিব না। আমাদের ত্রুটি দুর্ব্বলতা সমস্তই তুমি জান। তুমি ভিন্ন আর কেহ আমাদিগকে সে-সকল হইতে মুক্ত করিতে পারে না। তোমার কৃপা ভিন্ন আমাদের অন্য কোনও সম্বলই নাই। তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে তোমার প্রেমসাগরে ভাল করিয়া নিমজ্জিত হইতে সমর্থ কর। তোমার করুণাধারা সমগ্র হৃদয় মন পাতিয়া গ্রহণ করিবার উপযুক্ত করিয়া লও। তুমি কৃপা করিয়া আমাদের জীবনগতি পরিবর্ত্তিত করিয়া দেও। আমরা এবার সকলে সম্পূর্ণরূপে তোমার হইয়া যাই। তোমার ইচ্ছাই সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউক। আমরা তোমার হইয়া ধন্য ও কৃতার্থ হই। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

ত্র্যধিক-শততম মাঘোৎসব

মাঘোৎসবের প্রস্তুতির জন্য অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও শ্রীযুক্ত অমৃতকুমার দত্ত প্রভৃতি কতিপয় বন্ধুর নিষ্ঠাপূর্ব্বক চেষ্টা যত্নে ১লা পৌষ হইতে সমগ্র মাস নগরের বিভিন্ন অংশে উষা-কীর্ত্তন ও উপাসনা প্রার্থনাদি হইয়াছে। এক দিবস সহরের বাহিরে নিমতা গ্রামে ও অপর এক দিবস আন্দুল গ্রামেও যাওয়া হইয়াছিল। যদিও আশানুরূপ সংখ্যক লোক এই কার্য্যে অগ্রসর হইতেছেন না, তথাপি যাঁহারা নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ইহাকে এ পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা সকলেরই বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

এবার উৎসবের আয়োজনের মধ্যেই আমাদের অনেক প্রিয়জন অমরলোকে চলিয়া গেলেন। উৎসবের মধ্যেও একজন আহূত হইলেন। মৃত্যু ও রোগ আমাদিগকে আমাদের অসহায়তা বিশেষভাবেই স্মরণ করাইয়া দিল। তাই অনন্যগতি হইয়া আমাদিগকে শরণাগতবৎসলের শরণ লইতে হইল। করুণাময়ের করুণাধারা উৎসবের মধ্যে প্রচুর পরিমাণেই বর্ষিত হইতেছে, আমাদিগকে সমগ্র মন প্রাণের সহিত তাঁহার হাতে অর্পণ করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতেছে। আমরা কে কি পরিমাণে তাঁহার নিকট হইতে নূতন জীবন ও গতি লাভ করিতে সমর্থ হইতেছি, তিনিই জানেন। উৎসবের প্রকৃত বিবরণ প্রদান করা সম্ভবপর নহে। আমরা বাহিরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও উপদেশাদির মর্ম্ম যতটা সম্ভব প্রদান করিয়াই আমাদের কর্ত্তব্যপালনে সচেষ্ট হইতেছি।

১লা মাঘ (১৪ই জানুয়ারী) শনিবার—অদ্যকার দিন ব্রাহ্মপরিবারে ও ছাত্র-ছাত্রীনিবাসসমূহে ব্রাহ্ম-সমাজের কল্যাণার্থ উপাসনা প্রার্থনাদির জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই উপলক্ষে অনেক গৃহ পত্র পুষ্পদ্বারা সুসজ্জিতও করা হইয়াছিল।

২রা মাঘ (১৬ই জানুয়ারী) [illegible] অদ্যকার প্রাতঃকালও উক্ত কার্য্যের জন্ত নির্দ্দিষ্ট ছিল। ব্রহ্ম-মন্দিরে, নিয়মিত সাপ্তাহিক উপাসনার পর সমাজের পক্ষ হইতে পরলোকগত ললিতমোহন দাসের আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পাদিত হয়। সায়ংকালে উৎসবের উদ্বোধন উপলক্ষে সংকীর্ত্তন ও উপাসনা। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশ নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

প্রতি মাঘোৎসবে আমরা সারা বৎসরের কত সুখ দুঃখ, কত উত্থান পতন, কত জয় পরাজয় নিয়ে দয়ালের চরণতলে আসি। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের কত আনন্দ ও দুঃখ, আশা ও নিরাশা নিয়ে আসি; আবার, সমগ্র সমাজের কত আনন্দ ও দুঃখ নিয়ে, কত সঙ্কল্প কত শোক ও কত বেদনা নিয়ে দয়ালের চরণে বসি।

ব্রাহ্মসমাজ ও পরলোক।

এ বৎসর আমরা কি-ভাব নিয়ে এই মাঘোৎসবে প্রবেশ কর্‌ব? এবার আমাদের অনেকেরই মনে সকলের উপরে জেগে র'য়েছে আমাদের শোকদুঃখগুলি। এস ভাই বোন, তার কথাই এবার আগে ভাবি। আমরা আমাদের প্রিয় ব্রাহ্মসমাজ-বাড়ী খানিকে এ বৎসর কি চক্ষে দেখ্‌চি? আমাদের কি মনে হ'চ্ছে যে ব্রাহ্মসমাজ ক্রমে ক্রমে শ্মশানপুরীতে পরিণত হ'য়ে যাচ্ছে? শ্মশানে যেমন চারিদিকে কেবল মৃত্যুর দৃশ্য দেখ্‌তে পাওয়া যায়, এবং মানুষের হাহাকার ধ্বনি শুন্‌তে পাওয়া যায়, ব্রাহ্ম-সমাজকে কি আমরা সেই চক্ষে দেখ্‌ব? সংসারের সাধারণ মানুষের মত', আমরা কি মৃত্যুকে কেবল জীবনের অবসান ব'লেই দেখ্‌ব, আর কেবল মৃতদের জন্য শোকে অবসন্ন হব?

তা নয়, ভাই বোন্! সেই দয়াল নিজ দয়াগুণে আমাদের এই ব্রাহ্মসমাজ-বাড়ীকে এমন করে গ'ড়েছেন যে, আমরা এখানে সর্ব্বদাই পরলোককে নিয়ে কারবার করি। আমাদের এ বাড়ীতে আমরা সর্ব্বদাই পরলোকগত আত্মাগণকে নিয়ে চলি বলি, উঠি বসি। অশরীরী সাধু ভক্তগণকে নিয়ে আমাদের নিত্য কারবার। তাঁরা আমাদের মধ্যে না বস্‌লে আমাদের গৃহসংসার পবিত্র হয় না, আমাদের উপাসনা সম্পূর্ণ হয় না, আমাদের উৎসব সম্পূর্ণ হয় না। ব্রাহ্মসমাজের দৈনিক জীবনে তাঁরা নিত্য উপস্থিত; এখানকার কাজকর্ম্মের উপরে তাঁদের দৃষ্টি পড়ে; আমাদের সকল প্রয়াসে আমরা তাঁদের আশীর্ব্বাদ, তাঁদের অনুপ্রাণন চেয়ে চেয়ে সর্ব্বদা চলি। আমাদের খ্রীষ্টীয় ভাইয়েরা, বিশেষতঃ রোমান্ ক্যাথলিক ভাইয়েরা, পরলোকগত সাধু আত্মাগণের সঙ্গ ও সান্নিধ্যে খুব বিশ্বাস করেন। তাঁদের যে ল্যাটিন বন্দনা গানটি (Te Deum laudamus) সর্ব্বাপেক্ষা গম্ভীর, যাহা গীত হ'লে তাঁদের বিশাল মন্দিরে উপবিষ্ট উপাসকগণের চিত্ত সকলের চেয়ে বেশী উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে, সে গানটির মধ্যে অনেক বার prophet martyr ও apostleগণের উজ্জ্বল দলের কথা আছে। যাঁরা ধর্ম্মের অগ্নিগর্ভ বাণী উচ্চারণ ক'রে, অথবা ধর্ম্মের জন্ত মৃত্যুকে বরণ ক'রে, অথবা মানুষকে ধর্ম্মপথে টেনে আন্‌বার জন্য জীবন উৎসর্গ ক'রে, পরলোকে চ'লে গিয়েছেন, যুগযুগান্তরের সেই সকল সাধুভক্তকে প্রতিদিন উপাসনার সময়ে নিকটে উপস্থিত ব'লে অনুভব করা,—ঐ খ্রীষ্টীয় ভাইদের একটি বিশেষ সাধন। ইহা বিনা তাঁদের ধর্ম্মসাধন পূর্ণ হয় না। ব্রাহ্মসমাজ এ বিষয়ে তাঁদের অনুবর্ত্তী। জগতের সকল দেশের সকল যুগের সাধুভক্তগণ, বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজের প্রবর্ত্তকগণ, অগ্রণীগণ, আমাদের কাছে অতি সত্য। ব্রাহ্ম-সমাজ এমন এক স্থান, যেখানে আমরা তাঁদের নিয়ে ঈশ্বরচরণে বসি, তাঁদের বাণী শ্রবণ করি। বিশেষতঃ যখন ব্রাহ্মসমাজের সম্মুখে নব নব কর্ত্তব্য উপস্থিত হয়, দেশ হ'তে উত্থিত নব নব আহ্বান ধ্বনিত হয়, অথবা যখন ব্রাহ্মসমাজের পথে নব নব বাধা, নব নব সংগ্রামের উদয় হয়, তখন সেই অশরীরী সাধু ভক্তগণ, সেই অগ্রণীগণ ব্যাকুল হ'য়ে আমাদের দিকে তাকান্। তাঁরা আমাদের অনুপ্রাণিত উৎসাহিত করেন। তাঁরা বলেন, দেখি, এবার আমাদের পৃথিবীস্থ প্রিয় মানুষগুলি কেমন খাটে, কর্ত্তব্যের নব নব আহ্বানে কেমন জেগে ওঠে!

পরলোক আমাদের কাছে এত সত্য, তাই ব্রাহ্মসমাজ এমন স্থান যেখানে মৃত্যু আমাদের মধ্যে নব প্রাণ সঞ্চার করে, যেখানে মৃত্যু আমাদের উৎসবে নূতন সজীবতা প্রদান করে। বিগত তের চৌদ্দ বৎসরের মধ্যে এই ব্যাপার আমরা কত বার দেখ্‌লাম। মনে কি পড়ে না, ভাই বোন্, আমাদের আচার্য্য শিবনাথ পৃথিবী ছেড়ে যাবার পর প্রথম যেবার আমরা মাঘোৎসবে বস্‌লাম, সেবার আমাদের মধ্যে তাঁকে কত উজ্জ্বলভাবে উপলব্ধি করেছিলাম? সেবার হ'তে যেন তাঁর সান্নিধ্যের অনুপ্রাণন মাঘোৎসবে আমরা আরও বেশী ক'রে লাভ কর্‌চি। আমাদের নবদ্বীপচন্দ্র, আমাদের আদিনাথ, এবং আমাদের আরও কত ধর্ম্মপ্রাণ ত্যাগী বিশ্বাসী ব্রহ্মভক্ত, দেহত্যাগ ক'রে তাঁদের আত্মার সংস্পর্শ দিয়ে যেন আমাদের আত্মাকে আরও অধিক বেষ্টন ক'রে র'য়েছেন। তাঁদের এক এক জনের প্রয়াণের পর আমাদের মাঘোৎসবে আমরা সেই দয়ালের দয়া আরও ভাল ক'রে অনুভব করেছি। সাধু ভক্ত ত্যাগী বিশ্বাসিগণের দেহত্যাগ ব্রাহ্মসমাজে অতি উজ্জ্বল ঘটনা। সমগ্র জীবন ঈশ্বরের সেবানলে, ঈশ্বরের প্রেমানলে ইন্ধন-রূপে সমর্পণ ক'রে, শ্রদ্ধেয় হেমচন্দ্র সরকার ও ললিতমোহন দাস, এঁরা দুজন অল্পদিন পূর্ব্বে চ'লে গিয়েছেন। এঁদের জীবন, এবং এঁদের মৃত্যু, দুইই দয়ালের দয়ার জলন্ত নিদর্শন। যাঁরা জীবিত থেকে ঈশ্বরের মহিমাকে জয়যুক্ত কর্‌লেন, যাঁরা মৃত্যুর দ্বারা ঈশ্বরের মহিমাকে জয়যুক্ত কর্‌লেন, ঈশ্বরের এমন কত উজ্জ্বল সাক্ষীর দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ পরিপূর্ণ। খ্রীষ্টীয় জগতে এক এক জন সাধুভক্তকে বিরোধীরা জীবদ্দশায় অগ্নিতে দগ্ধ কর্‌ত, আর তাঁদের সঙ্গীরা অনুপ্রাণিত হ'য়ে ঈশ্বরের জয়ধ্বনি কর্‌তেন। যাঁদের জীবন দেখে উল্লসিত হ'য়ে বল্‌তে ইচ্ছা হয় 'ধন্য দয়াল!', যাঁদের মরণ স্মরণ ক'রে সতেজে বল্‌তে ইচ্ছা হয় 'জয় দয়াল!'; এমন কত মানুষের দৃষ্টান্তে ব্রাহ্মসমাজের অতীত ও বর্ত্তমান পরিপূর্ণ। বাইবেলে বর্ণিত আছে, ইস্রায়েল বংশীয়েরা যখন ইজিপ্ট হ'তে আসেন, তখন ভগবান তাঁদের পথ দেখাবার

জন্য কয়েকটি অগ্নিস্তম্ভ (pillars of fire) উত্থিত ক'রেছিলেন। এই দুই ভাইয়ের দেহ যে যে দিন চিতায় সমর্পণ করা হ'ল, চিতার অগ্নিশিখার দিকে চেয়ে চেয়ে আমার মানসচক্ষে বাইবেলে বর্ণিত সেই অগ্নিস্তম্ভের ছবিটি উদয় হচ্ছিল। ভাই বোন্, তোমরা আজ অনুভব কর, ব্রাহ্মসমাজ ভগবানের এইরূপ বহু অগ্নিস্তম্ভে উজ্জ্বল।

ব্রাহ্মসমাজ এমন স্থান, যেখানে শুধু সাধুভক্তদের দেহত্যাগের দ্বারা নয়, সাধারণ মানুষের সংসারের শোকদুঃখের দ্বারাও উৎসবের চমৎকার উপাদান রচিত হয়। আমি যে বৎসর ব্রাহ্মসমাজে এসে, কলিকাতার এই মন্দিরে মাঘোৎসবের প্রবাহের মধ্যে প্রথম বার বসি, সেবারকার একটি কথা চিরস্মরণীয় হ'য়ে র'য়েছে। ১১ই মাঘের প্রাতঃকালের উপাসনার পর একজন বর্ষীয়ান্ ব্রাহ্ম দণ্ডায়মান হ'য়ে এই সাক্ষ্য দিলেন যে, "আমার বারোটি পুত্র একে একে পৃথিবী ছেড়ে চ'লে গিয়েছে। শোকের শেল যেন আমার বুকে বারোটি ছিদ্র ক'রে দিয়েছিল। ব্রাহ্মসমাজে আসার পর, দয়াময় তাঁর অমৃত রস দিয়ে আমার বুকের সেই বারোটি ছিদ্র পূর্ণ ক'রে দিয়েছেন।" আমি যখন এই সাক্ষ্য শ্রবণ করি, তখন আমি ১৫ বৎসরের বালক মাত্র। কিন্তু এ জীবনে দীর্ঘকালে নিজের অনেক শোকের আঘাতের সময়ে, এবং অপরের অনেক শোকে সান্ত্বনা দিবার সময়ে, সেই অপূর্ব্ব সাক্ষ্য স্মরণ ক'রেছি। আমরা আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, সে সাক্ষ্য অতি সত্য। আজ ডেকে বলি, ও গো পুত্রকন্যাহারা পিতা মাতা, ও গো পিতৃমাতৃহারা সন্তান, ও গো পতিহীনা নারী, ও ভাই জীবনের সঙ্গীহারা পুরুষ,—একবার এস, আমরা সাক্ষ্য দিই যে সেই দয়াল আমাদের শোকদুঃখের মধ্য দিয়ে জীবনে তাঁর কত স্নিগ্ধ সান্ত্বনা, কত পবিত্র অনুপ্রাণন, কত অমৃতময় অনুভূতি, দান করেছেন। ব্রাহ্মসমাজ এমন স্থান, যেখানে আমাদের শোকদুঃখগুলি আমাদের উৎসবের অতি পবিত্র উপকরণ হয়; যেখানে শোকদুঃখগুলি পরমজননীর স্নেহস্পর্শের পুষ্পমালা দিয়ে আমাদের প্রাণকে বেষ্টন করে।

সংক্রামক ব্রহ্মকৃপা ও আত্মদান।

এ বৎসর মৃত্যুর কথা মনের মধ্যে জেগে রয়েছে ব'লে প্রথমেই এই প্রসঙ্গ করা গেল যে, মৃত্যুকে ব্রাহ্মসমাজে কি ভাবে গ্রহণ করা হয়। এখন ভাবি, ব্রাহ্মসমাজটা কেমন স্থান, কিসের স্থান। এখানে সব চেয়ে বেশী কি-কাজ হয়? উৎসবের সময়ে ব্রাহ্মসমাজের কোন্ স্বরূপটি, কোন্ লক্ষণটি, আমরা সব-চেয়ে বেশী ক'রে মনে রাখ্‌ব? ব্রাহ্মসমাজকে এদেশের ধর্ম্মসংস্কার ও সমাজসংস্কারের একটি ব্যবস্থা ব'লেই কি দেখ্‌ব? অথবা কি শুধু সত্যধর্ম্ম বিস্তারের একটি স্থায়ী আয়োজন ব'লে দেখ্‌ব? না; আজ এই উৎসবের দ্বারে উপস্থিত হবার সময় ব্রাহ্মসমাজকে শুধু ঐভাবে দেখ্‌ব না। ব্রাহ্মসমাজ এমন স্থান, যেখানে আমরা মায়ের চরণতলে খুব ঘনিষ্ঠ হ'য়ে, খুব কাছে সান্নিধ্যের ভিতরে বসি। ব্রাহ্মসমাজের যত কাজ, আত্মায় আত্মায় স্পর্শ লাগানো তার মধ্যে সব চেয়ে বড় কাজ। 'উপাসনা' কথাটি আমাদের একটি অমৃতময় কথা। 'উপাসনা' অর্থই হ'ল কাছে বসা। ব্রাহ্মসমাজে আমরা কার কাছে বসি? আমরা পরমজননীর খুব কাছে বসি, আবার পরস্পরেরও খুব কাছে বসি। পরস্পরের এমন কাছে বসি যে, একজনের প্রাণের সুখদুঃখের তরঙ্গ অপরের প্রাণে গিয়ে আঘাত করে; একজনের প্রাণের শুভসংকল্প অপরের প্রাণে প্রবেশ করে; একজনের অন্তরের আত্মোৎসর্গের ভাব অপরে সংক্রান্ত হয়।

চিকিৎসকেরা জানেন, মানুষের শরীরে এবং বাহিরের হাওয়াতে কি কি অবস্থা উপস্থিত হ'লে সংক্রামক রোগগুলি ব্যাপক আকার ধারণ করতে পারে। ব্রাহ্মসমাজ এমন এক স্থান যেখানে আত্মা হ'তে আত্মাতে পবিত্রতা, দৃঢ়তা, ত্যাগ, সংযম, বিশ্বাস, আত্মোৎসর্গ, এ সকল সংক্রান্ত হয়। উৎসবে আমরা কি দেখ্‌তে পাই? একদিকে সেই দয়ালের দয়া যেন সংক্রামক হ'য়ে মানুষের জীবনকে স্পর্শ করে; একজনের হৃদয়ে সেই দয়ার স্পর্শ প্রথমে লাগে, তার পরে আরও দশ জনকে তাহা স্পর্শ করে। তেম্‌নি আবার, মানুষের যে ব্রহ্মচরণে আত্মদান, তাও এ সময়ে সংক্রামক হ'য়ে দাঁড়ায়। একজনের হৃদয় হ'তে অনুতাপের ক্রন্দন প্রথম উত্থিত হয়; পরে আর দশজনের হৃদয়ে সেই কান্না ওঠে। আমাদের উৎসব এই সংক্রামক ব্রহ্মকৃপা ও সংক্রামক আত্মদানেরই ব্যাপার।

এই সংক্রামক ব্রহ্মকৃপা ও সংক্রামক আত্মদানের ব্যাপারটির মধ্য দিয়েই তো আমরা ব্রাহ্মসমাজে এসে প'ড়েছি। নিকটস্থ কোন এক ভাইয়ের প্রাণে ব্রহ্মকৃপার ও আত্মসমর্পণের স্রোত প্রবাহিত হ'য়েছে; সে স্রোত এসে আমাদেরও প্রাণে লেগেছে। যারা প্রাচীন সমাজ হ'তে ব্রাহ্মসমাজে এসেছ, তাদের আজ বলি, যত বৎসর আগেই এসে থাক না কেন, সে ব্যাপারটি যতই পুরাতন হ'য়ে গিয়ে থাকুক না কেন, আজ সেই সংক্রামক ব্রহ্মকৃপা ও সংক্রামক আত্মদানের ব্যাপারটি খুব ভাল ক'রে অন্তরে অনুভব কর। এই ব্রাহ্মসমাজে কার কাছ থেকে যে কার ছোঁয়াচ লাগে, সে এক অপূর্ব্ব ব্যাপার। সব সময়ে যে কোনও বিশেষ ব্যক্তির কাছ থেকে, বা কোনও বড় এক জনের কাছ থেকে এই ছোঁয়াচ লাগে তাও নয়। এ নিগূঢ় আত্মিক স্পর্শের ব্যাপারের কথা ভাব্‌লে আশ্চর্য্য হ'তে হয়। আমরা অনেকেই জীবনে কোন না কোন দিন সেই ঘন ব্রহ্মকৃপার, সেই সংক্রামক ব্রহ্মকৃপার, স্পর্শ লাভ ক'রেছি। আজ আমরা অতীত জীবনের সেই দিনগুলি স্মরণ করি।

যারা নিজেরা ব্রাহ্মসমাজে আস নাই, যারা ব্রাহ্মসমাজেই জন্মেছ, তাদের আজ বলি, তোমরাও ঐ সংক্রামক ব্রহ্মকৃপা ও সংক্রামক আত্মসমর্পণের ব্যাপারটি হ'তে দূরে থেকো না। তোমাদের বাবা মার জীবনে সেই সংক্রামক ব্রহ্মকৃপা কেমন ক'রে লীলা ক'রেছিল, তাঁদের জীবনগুলি এক দিন কেমন ব্রহ্মস্পর্শে অনুপ্রাণনময় ও অগ্নিময় হ'য়েছিল,—তোমরা সেই পুণ্যকাহিনী তাঁদের কাছ থেকে উৎসুক হ'য়ে শুনো; শুনে অনুপ্রাণিত হ'য়ো। এই জীবনবেদের, এই জীবনপুরাণের স্পর্শ হ'তে, হে ব্রাহ্মসমাজের পুত্র কন্যাগণ, তোমরা আপনাদিগকে

বঞ্চিত রেখো না। তোমাদের প্রত্যেক পরিবারে, প্রত্যেক বংশে, যাঁরা যাঁরা প্রথম ব্রাহ্মসমাজে এসেছিলেন, তাঁদের জন্য তোমরা গৌরব কর। ভারতের নরনারী গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষিদের নাম নিয়ে কত গৌরব করে। হে ব্রাহ্মসমাজের পুত্র কন্যাগণ, তোমাদের পরিবারকে ব্রাহ্মসমাজে নিয়ে এসে যাঁরা বংশের নবগোত্র-প্রবর্ত্তক হ'লেন, সেই সকল বংশীয়দের জন্য তোমরা গৌরব কর। তাঁদের পুণ্যময় জীবনকাহিনী পাঠ কর, আলোচনা কর, বল' ও শোন। তাঁদের জীবনে ঐ সংক্রামক ব্রহ্মকৃপার ও সংক্রামক আত্মসমর্পণের যে লীলা প্রকাশিত হয়েছে, তাকে হৃদয়-ফলকে চির উজ্জ্বল ক'রে রাখ।

যারা ব্রাহ্মসমাজে এসেছ, আর যারা ব্রাহ্মসমাজে জন্মেছ, উভয় দল মিলে আজ এই ব্রাহ্মসমাজে বিধাতার লীলা দেখ। ক্রমশঃ তো এই ব্রাহ্মসমাজে প্রথম দল ক'মে আসচে। দ্বিতীয় দলকে বলি, আপনার লোকদের জীবনে, আপনার সমাজের ইতিবৃত্তে, বিধাতার উজ্জ্বল লীলা দেখ্‌তে শেখ। তোমরা কি ইতিহাস প'ড়ে মানবসমাজের বৃহৎ বৃহৎ ব্যাপারে ভগবানের বিধাতৃত্ব দেখ্‌তে শিখ্‌ছ? তবে জেনো, ব্যক্তিগত জীবনে তা আরো পরিস্ফুট। তোমরা কি সাধু ভক্তদের জীবনে দয়ালের দয়ার প্রভাব দেখ? তবে জেনো, সাধারণ মানুষের জীবনে, আপনার লোকদের জীবনে তা আরো পরিস্ফুট। তোমরা কি জগতের প্রাচীন ধর্ম্মবিধানসকলে বিধাতার হাত দেখ্‌তে পাও? তবে বলি, আমাদের এই ব্রাহ্মধর্ম্মবিধানে, এবং তোমার আমার বংশীয়দের জীবনে, তা আরও উজ্জ্বল।

এতক্ষণ যে-ঘনিষ্ঠতার কথা, আত্মায় আত্মায় যে-স্পর্শের কথা, যে সংক্রামক ব্রহ্মকৃপা ও আত্মদানের কথা বল্‌লাম, তা-ই ব্রাহ্মসমাজের আসল ব্যাপার, কেন্দ্রীয় ব্যাপার। ব্রাহ্মসমাজে আর যা কিছু ঘটে, তা যেন পরিধির ব্যাপার; সে সব এর বাহিরে বাহিরে। এই ঘনিষ্ঠতা, এই সংক্রামকত্ব, যে-সময়ে যে-ঋতুতে অধিক প্রবল হয়, তারই নাম উৎসব। আজকাল যেমন কলিকাতায় নগরাধ্যক্ষেরা বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন, বসন্ত রোগ প্রবল ভাবে সংক্রামক হবার ঋতু উপস্থিত,—তেম্‌নি, উৎসব হ'ল সেই ঋতু, যখন ব্রাহ্মসমাজে এই ব্রহ্মকৃপার ও আত্মসমর্পণের সংক্রামকত্ব অধিক প্রবল হ'য়ে ওঠে। উৎসবে নূতন কিছু হয় না; ব্রাহ্মসমাজের আসল যে ভাব, আসল যে স্বরূপ ও লক্ষণ, তাই এ সময়ে ঘনতর ও প্রবলতর হয়। আমরা বৎসরের অন্য সময়ে ভাল ক'রে বুঝি না যে আমরা একটা মণ্ডলী; মনে রাখি না যে আত্মায় আত্মায় ঠেকাঠেকি ক'রে বস্‌বার জায়গাই হ'ল ব্রাহ্মসমাজ। উৎসবের সময়ে অন্য সব কথা দূরে ফেলে, অন্য সব চিন্তা পশ্চাতে রেখে, হৃদয়কে এই অনুভবে পূর্ণ কর। মনকে বলাও, এই ব্রাহ্ম-সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ আমার আপনার জন। এঁদের দেখে আমি সুখী হই; এঁদের কথা ভেবে আমি সুখী হই। এঁরা পাশে আছেন ব'লে আমি ধন্য। যদি কারো সঙ্গে কারো মনোমালিন্য থাকে, অথবা যদি কারো অন্তরে কোন কার্য্য-পদ্ধতি নিয়ে কোন ক্ষোভ জন্মে থাকে, এ উৎসবের দ্বারে এসে আগেই মন থেকে তা দূর কর। সকলে সকলের কাছে সব অপরাধের জন্য ক্ষমা চাও। আমি সর্ব্বাগ্রে ক্ষমা চাই। আমি সব চেয়ে বেশী অপরাধী। সেবকরূপে দাসরূপে আমার যার প্রতি যত কর্ত্তব্য ছিল, তার মধ্যে প্রায় প্রত্যেকেরই প্রতি কত যে ত্রুটি হ'য়ে গিয়েছে! তা ছাড়া প্রেমাপরাধও যে কত হ'য়ে গিয়েছে! সে সকল অনুভব ক'রে আজ বড় ছোট সকলের চরণ ধ'রে আমি ক্ষমা চাই। আজ ক্ষমা চেয়ে ও ক্ষমা দিয়ে, তবে আমরা উৎসবের দ্বারে দাঁড়াব।

এ বৎসর আমাদের প্রাণ শোকার্ত্ত ব'লে আমরা আরও ভাল ক'রে ক্ষমা চাইব। যারা সত্য-সত্য শোকার্ত্ত, তাদের প্রাণগুলি অধিক কোমল হয়। তাদের কথাবার্ত্তায় চাল-চলনে গাম্ভীর্য্য আসে। তারা চপলভাবে কথা কয় না, কর্কশ ব্যবহার করে না। ভাল ভাব ভাল প্রভাব তাদের মনকে অধিক স্পর্শ করে। যাদের শোকটা বাহিরের প্রকাশ মাত্র, যাদের প্রকৃতিতে গভীরতা নাই, তারা দুদিনেই শোককে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে, পূর্ব্বের ন্যায় লঘুতায় কলহে কর্কশতায় মত্ত হয়। হে ব্রাহ্মসমাজ, এ বৎসর তুমি কি সত্য-সত্যই শোকার্ত্ত? ব্রাহ্মদের মন কি এ বৎসর সত্য সত্যই শোকের অশ্রুতে সিক্ত ও কোমল হ'য়েছে? তবে আমাদের পক্ষে এ বৎসর উৎসব খুব সফল হবার কথা। তবে আমরা খুব সহজে ক্ষমা চাইতে পার্‌ব, খুব সহজে পায়ে ধর্‌তে পার্‌ব, খুব সহজে অনুতপ্ত হ'য়ে প্রভুর পদতলে ও ভাইবোনের পদতলে পড়্‌তে পার্‌ব।

জীবনের মূল্য; খাঁটি জীবন।

উৎসবের সম্মুখীন হ'য়ে আমরা একবার ভাবি, ব্রাহ্মসমাজে আমরা সব চেয়ে অধিক মূল্য কোন্ বস্তুকে দিতে পারি। পৃথিবীতে জ্ঞানের মূল্য আছে, প্রতিভার মূল্য আছে, কর্ম্মশক্তি ও কর্ম্মব্যবস্থার মূল্য আছে। ভগবান্ ব্রাহ্মসমাজকে এ সকল বস্তুও প্রচুর পরিমাণে দান ক'রেছেন। ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয়ে, উপাসকের সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ বিষয়ে, ধর্ম্মসাধন বিষয়ে, ধর্ম্মরাজ্যে কোন্ বস্তু প্রধান কোন্ বস্তু অপ্রধান এই প্রশ্নে,— জ্ঞানের আলোক ব্রাহ্মসমাজ যেমন উজ্জ্বল ক'রে জেলে দিয়েছেন, ভারতে আজ পর্য্যন্ত অন্য কেহ তা পারেন নি। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সঙ্গে দলবদ্ধ সুশৃঙ্খল কার্য্যের সামঞ্জস্য সাধন ক'রে এত দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত এমন সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠান সকলকে দণ্ডায়মান রাখ্‌তে ও সতেজ কর্ম্মে নিযুক্ত রাখ্‌তে ব্রাহ্মসমাজ যেমন সফল হ'য়েছেন, ভারতে আজ পর্য্যন্ত অন্য কেহ তা পারেন নি। ভারতের ভবিষ্যৎ কল্যাণের বিষয়ে যে সর্ব্বতোমুখীন আদর্শ, যে সুদূর-প্রসারী কর্ম্মসূচী, যে সাহসিক কল্পনা ব্রাহ্মসমাজে আছে, এমন আর কাহারও মধ্যে নাই। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের বিশেষত্ব কি এই সকলেতেই সীমাবদ্ধ? তা নয়। ব্রাহ্মসমাজ এমন স্থান, যেখানে জ্ঞান প্রতিভা কর্ম্মব্যবস্থা কর্ম্মকল্পনা কর্ম্মশক্তি, সব থাকে পশ্চাতে; মানুষের জীবন ও চরিত্র থাকে সর্ব্বপ্রথম স্থানে। ব্রাহ্মসমাজ এমন স্থান, যেখানে জীবন ও চরিত্র অপেক্ষা, ঈশ্বরের ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ ও ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস অপেক্ষা, প্রবলতর

কোনও শক্তি জগতে বিদ্যমান আছে ব'লে কেহ মানে না, কেহ জানে না, কেহ বিশ্বাস করে না, কেহ দেখে না। এ সমাজ এমন স্থান, যেখানে প্রভুর চরণে জীবন লুটিয়ে দিয়েই মানুষ বড় হয়।

এইজন্য, ভাই বোন্, উৎসবে আমাদের সর্ব্বপ্রধান কথা,—ঈশ্বরের হাতে নূতন ক'রে জীবন দান; জীবন পরিবর্ত্তন, ও জীবন পরিবর্ত্তনের জন্য ব্যাকুলতা; জীবন কিসে প্রভুর আরও অনুগত হয় সেজন্য কাতরতা ও ক্রন্দন। আমরা কি এ উৎসবে অন্য কোন কাজ কর্‌ব না? তা বল্‌চি না। দয়াল দয়া ক'রে আমাদের হাতে যত বড় বড় কাজের ভার দিয়েছেন, যত বড় বড় প্রতিষ্ঠান রচনা ক'রে দিয়েছেন, তার কথাও বল্‌ব; তার হিসাবও কর্‌ব। তা না কর্‌লে অপরাধ হবে; ঈশ্বরের করুণা এবং আমাদের দায়িত্ব উভয়ই বিস্মৃত হওয়া হবে। কিন্তু এসব স্মরণ করা অপেক্ষা, এ সকলের হিসাব করা অপেক্ষা, এ উৎসবে আমরা অনেক বেশী পরিমাণে আর একটি কাজ কর্‌ব। সে কাজটি কি? সেটি হ'ল, ঈশ্বরের চরণে প'ড়ে তাঁর কাছে খাঁটি হবার জন্য ব্যাকুল ক্রন্দন। জীবনে যে যে বিষয়ে এখনও তাঁর অনুগত হওয়া হয় নি, জীবনে যে যে বিষয়ে এখনও তাঁর হাতে ধরা দিচ্চি না, তাঁর আদেশকে তাঁর আদর্শকে এড়িয়ে যাচ্চি, সেই সেই বিষয়ে তাঁর হাতে নূতন ক'রে আত্মসমর্পণ। এ জন্য হৃদয়ভেদী ক্রন্দন ও প্রবল প্রতিজ্ঞা। যে যে বিষয়ে জীবনে এখনও খাদ আছে, ময়লা আছে, তা নিঃশেষে দূর করা,—ষোল আনা খাঁটি হওয়া। ব্রাহ্ম হওয়া মানেই খাঁটি হওয়া। বল্‌তে ইচ্ছা হয় যে, 'ব্রাহ্ম' কথার এ ছাড়া যেন অন্য অর্থ না থাকে। এক বার এ উৎসবে ভাল ক'রে তাঁর দিকে চোখে চোখে তাকাই। আমার দৈনিক জীবনযাত্রা, আমার সময়ের ব্যবহার, আমার অর্থের ব্যবহার, আমার অর্থোপার্জ্জন, আমার আমোদ-প্রমোদ, আমার আলাপ, আমার অবসর বিনোদন ও অবসর-বিনোদনের জন্য পাঠ, আমার অন্তরের গোপন চিন্তা ও গোপন সুখলালসা,—এ সকলের মধ্যে যদি কিছু এমন থাকে, যাতে ঈশ্বরের নিষেধ আছে অথচ আমি তা ক'রেই যাচ্চি, তবে এই উৎসবে তাকে জীবন হ'তে উৎপাটিত কর্‌তেই হবে। উৎসবে করণীয় প্রধান কাজই হ'ল জীবনকে নূতন ক'রে লওয়া, জীবনকে খাঁটি করা। শাস্ত্রী মহাশয় যখন ব্রাহ্মসমাজে আস্‌বার জন্য নিজ পিতার কোপে পতিত হ'য়েছিলেন, সে সময়ে তাঁর এক জ্ঞাতি ভ্রাতাকে তিনি ব'লেছিলেন, "ভাই, আমি ধর্ম্মে ভেজাল রাখ্‌তে পার্‌ব না।" সেই পরম খাঁটি মানুষটি সারা জীবনে এই খাঁটি হবার ও খাঁটি থাক্‌বার সাধন ক'রেছিলেন; তিনি আপনাকে এই সাধনের অনলে নিরন্তর দগ্ধ ক'রে উজ্জ্বল হ'য়েছিলেন। আমাদের এ উৎসবটা চরিত্রের খাদ, জীবনের খাদ দগ্ধ কর্‌বার সময়। দগ্ধ হব না, পুড়্‌ব না, পুড়িয়ে গালিয়ে চরিত্রের খাদ বাহির ক'রে দিব না, অথচ উৎসব কর্‌ব, উৎসবে শুধু আমোদ-আহ্লাদ ক'রেই চ'লে যাব,—এই অভিপ্রায় যদি কেহ ক'রে থাক, তবে তাকে বলি, "নিরস্ত হও! এমন কাজ ক'রো না, ক'রো না, ক'রো না! নিজের উৎসব মাটি ক'রো না, অপরের উৎসব মাটি ক'রো না। ব্রাহ্মদের যে সময়ে সব চেয়ে নিজ জীবন সম্বন্ধে ব্যাকুল হবার কাতর হবার কথা, 'প্রাণ থাকে কি যায়, তবু নূতন মানুষ হবই' এই ব'লে ঈশ্বরের চরণে ভেঙ্গে পড়্‌বার কথা,—সেই সময়ে লঘুভাবে এতে কেহ প্রবেশ ক'রো না।"

এইজন্য, উৎসবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ, আমাদের খাঁটি মানুষগুলি। ব্রহ্ম-অগ্নিতে জ্ব'লে যাদের জীবন ও চরিত্র নির্ম্মল ও উজ্জ্বল হ'য়েছে, সেই মানুষগুলি। উৎসবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদান, চরিত্র-জ্যোতি। আমাদের উৎসব হয় কাদের নিয়ে? আমাদের রামমোহন, আমাদের দেবেন্দ্রনাথ, আমাদের কেশবচন্দ্র, আমাদের শিবনাথকে নিয়ে। যখন এঁদের জীবনজ্যোতি, এঁদের জীবনে ও চরিত্রে প্রকাশিত ব্রহ্মজ্যোতি আমরা ভাল ক'রে দেখি, তখনই উৎসব আরম্ভ হয়।

১৯৩৩ সাল ও রামমোহন।

এ বৎসর তো সারা বৎসরই আমাদের রামমোহনকে নিয়ে উৎসব কর্‌তে হবে। এই ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দটি তাঁর মৃত্যুর শতবার্ষিকের বৎসর। তাঁর সেই জ্বলন্ত আত্মোৎসর্গের জ্যোতি দিয়ে এ বৎসরের প্রত্যেকটি মাসকে, পার্‌লে প্রত্যেকটি দিনকে, উজ্জ্বল ক'রে রাখ্‌তে হবে। যেমন কোন কোন সময়ে লোকেরা বলাবলি করে, "ওরে ভাই, আজকাল ভোরে শুকতারাটা দেখেছিস্? কেমন উজ্জ্বল হ'য়েছে! এত উজ্জ্বল তো অন্য সময়ে দেখি না!" তেম্‌নি এই ১৯৩৩ সালে সারাটি বৎসর ধ'রে আমরা বলাবলি ক'র্‌ব, আমাদের মনের আকাশে ভারতের নবজীবনের ঐ শুকতারাটি, রাজা রামমোহনের জীবন ও আদর্শটি, যেন অতি উজ্জ্বল হ'য়ে জ্বল্‌তে থাকে।

আমরা সারা বৎসর ধ'রে রামমোহনের কথা ভাব্‌ব, তাঁকে নিয়ে মাত্‌ব, তাঁকে নিয়ে অনুপ্রাণিত হব। ব্রাহ্মসমাজের কাজের মধ্যে যে কাজগুলি খুব ছোট, খুব তুচ্ছ, এমন কোনও কাজে ডাক পড়্‌লে কি আমাদের মন সঙ্কুচিত হয়, সে কাজ কর্‌তে অনিচ্ছুক হয়? তবে এস, ভাবি সেই রাজা রামমোহন রায়ের কথা, যিনি ছাপাখানার ময়লা ও কালীর মধ্যে ঢুকে, টাইপ বসাবার কাজটিও নিজের হাতে ক'রেছেন, এবং ঐ কাজটি হাতে ধ'রে কম্পোজিটারদের শিখিয়েছেন। সর্ব্বোন্নত আত্মোৎসর্গ এবং নিম্নতম কার্য্যে আত্মনিয়োগ, (loftiest self-consecration and meanest drudgery), এই উভয়কে কেমন ক'রে জীবনে একত্র কর্‌তে হয়, তা তাঁর কাছ থেকে শিখি, এস। ব্রাহ্মসমাজের জন্য দুটি টাকা খসাতে কি আমাদের প্রাণ কাঁপে? মনে কি ভয় হয় যে টাকা বেশী দিয়ে ফেল্‌লে শেষে গতি কি হবে? তবে এস, সারা বৎসর ধ'রে ভাবি সেই মানুষটিকে, যিনি নিজের উপার্জ্জিত সমুদয় টাকা নিঃশেষে ঢেলে দিয়েছিলেন ঈশ্বরের কাজের জন্য, এবং তার ফলে যিনি শেষ জীবনে বিদেশে অর্থকষ্টের মধ্যে পড়্‌তেও সঙ্কুচিত হন নি। ছোট ছোট বিষয়ে মান অভিমানে খোঁচা লাগ্‌লে কি আমাদের মন চায় যে ঈশ্বরের কাজ থেকে স'রেই দাঁড়াই? তবে এস, সারা বৎসর ধ'রে সেই মানুষটির কথা ভাবি, যিনি নিজের অর্থে পুষ্ট হিন্দু

কলেজ থেকে নিজের নাম তুলে নিয়েছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ কি আজ রাজা রামমোহন রায়ের নাম নেবার যোগ্য আছে? আত্মোৎসর্গে কি তাঁর নাম নেবার যোগ্য আছে? ত্যাগে শ্রমে কি তাঁর নামে পরিচিত হবার যোগ্য আছে? মনের মহত্বে ও হৃদয়ের কোমলতায় কি তাঁর নামের যোগ্য আছে? ব্রহ্মের পূজার জন্য সেই উচ্ছ্বসিত অনুরাগ কি ব্রাহ্মসমাজ দেখাতে পারে? আমরা কিসে তাঁর নাম নেবার যোগ্য হ'তে পারি, এ বৎসর সেই সাধনা করি, এস। এস, এ বৎসরে ব্রাহ্মসমাজের জন্য শ্রম অর্থ সেবা, সব ভাল ক'রে ঢেলে দিয়ে রামমোহনের নাম নেবার যোগ্য হ'য়ে উঠি। যদি আমরা দশটি মানুস, যদি পাঁচটি মানুষও, এই ১৯৩৩ সালে তাঁর ভাবে অনুপ্রাণিত হ'তে পারি, ব্রাহ্মসমাজ ধন্য হ'য়ে যাবে।

উৎসব যেন সমগ্র সমাজের দীক্ষার সময়। যেমন ব্যক্তিগত জীবনে দীক্ষা আছে, তেমনি সমগ্র সমাজের পক্ষেও দীক্ষা আছে। আবার যেমন ব্যক্তিগত জীবনে ঈশ্বরচরণে আত্মসমর্পণ ক'রে ক'রে দীক্ষার সঙ্কল্পটিকে বার বার নবীভূত ক'রে নিতে হয়, সমাজের পক্ষেও তেমনি। এস ভাই বোন্, এই মাঘোৎসবে আমরা আমাদের নিজেদের দীক্ষাকে নবীভূত ক'রে লই; আবার, মণ্ডলীবদ্ধ হ'য়ে সমগ্র মণ্ডলীর দীক্ষাকে নবীভূত ক'রে লই। আমাদের শোক তাপ আমাদিগকে নবদীক্ষা দান করুক। বিশেষতঃ ঈশ্বরের ত্যাগী সন্তানদের মৃত্যু আমাদিগকে নবদীক্ষা দান করুক। ব্রাহ্মসমাজ যে পরম জননীর চরণে ঘনিষ্ঠ হ'য়ে বসবার স্থান, এখানে যে কত বার ব্যাকুলাত্মাদের প্রতি তাঁর দয়া, এবং তাঁর চরণে ব্যাকুলাত্মাগণের জীবনসমর্পণ, উভয়ই সংক্রামক হ'য়ে স্বর্গের দৃশ্য রচনা ক'রেছে,—তার স্মৃতি, তার অনুভূতি এ বৎসরে আমাদিগকে নব দীক্ষা দান করুক। এ উৎসবে আমাদের প্রাণে খাঁটি হবার জন্য নূতন সঙ্কল্প জাগুক্। রাজা রামমোহন রায়ের জলন্ত জীবন ও চরিত্র এ বৎসরে আমাদিগকে নবদীক্ষা দান করুক। এই ভাবে সকলে মিলে, অতি কাতর অতি দীন হীন অতি অকিঞ্চন হ'য়ে, উৎসবপতির দ্বারে করাঘাত করি।

প্রার্থনা

হে প্রভু, হে উৎসবপতি, আমরা তোমার দ্বারে এসেছি। আমরা কারা? আমরা তোমার সেই অধম সন্তান, সেই অযোগ্য পুত্র কন্যা, যারা তোমার উজ্জ্বল সাধু ভক্তগণের নামের গৌরবটি নিতে চাই, কিন্তু নিজেদের দিতে জানি না। আমরা তোমার সেই-সব অযোগ্য সন্তান, যারা তোমার ধর্ম্মকে ম্লান ক'রে নিস্তেজ ক'রে রেখেছি; যারা সুখ সম্পদ মান অভিমান আমোদ আহ্লাদকে বড় ক'রেছি, আর তোমার আদর্শকে ছোট ক'রেছি। কিন্তু এই অধম আমরাও আশা করুচি যে এ উৎসবে আমাদের হৃদয়গুলি অনুতাপে দগ্ধ হবে, বিগলিত হবে। তোমার যে করুণা দিয়ে বার বার কত মৃতকে নব জীবন দিয়েছ, সেই করুণা আমরাও লাভ করুব। দয়াল, দয়াল, দয়াল! উৎসবের দ্বার খোল; আমাদিগকে ভিতরে লও; তোমার দয়ার কোলে লও। আরো দুঃখ দিতে যদি হয়, আরো দণ্ড দিতে যদি হয়, তাও দিও; কিন্তু আমাদের আবার ভাঙ্গ ক'রে তোমার কাছে টেনে লও। আশা ভক্তির সহিত তোমাকে প্রণাম ক'রে তোমার উৎসব দ্বারে আমরা প্রতীক্ষা করি।

৩রা মাঘ (১৬ই জানুয়ারী) সোমবার—

প্রাতে উপাসনা। শ্রীযুক্ত মথুরানাথ নন্দী আচার্য্যের কার্য্য করেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের পরম হিতৈষী ভগবদ্ভক্ত শ্রীযুক্ত J. T. Sunderland সাহেবের Because Men are not Stones নামক উপাদেয় গ্রন্থের God and Human Sorrow (ঈশ্বর ও মানবীয় দুঃখ) শীর্ষক উপদেশটি অবলম্বনে লিখিত নিম্ন প্রকাশিত উপদেশ প্রদান করেন :—

মানবীয় দুঃখের একটা সঙ্ঘবন্ধন বা একপ্রাণতাসাধন শক্তি আছে। অতি অল্প লোকেই প্রথম জীবনে ইহার অস্তিত্ব বুঝিতে কি অনুমান করিতে পারে। কিন্তু প্রথম বুঝিতে না পারিলেও, কোন না কোন সময় ইহা সুস্পষ্ট হইয়া তাহার নিকট প্রকাশিত হয়। কখনও ধীরে ধীরে ইহা প্রকাশিত হয়, আবার কখনও অকস্মাৎ নিরাশা কি প্রিয়জনবিয়োগের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হয়। সকল জীবনে কি অধিকাংশের জীবনে ইহার প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী।

জন্মগত, জাতিগত, পাণ্ডিত্যগত, অবস্থাগত কি ধর্ম্মগত যে সঙ্ঘবন্ধন আছে, এ সকলের চেয়ে দুঃখের ভিতর দিয়া যে একপ্রাণতা জাগে তাহা অনেক বিস্তৃত ও গভীর। এরূপ সর্ব্বব্যাপী ও প্রভাবশালী শক্তি আর নাই।

দুঃখের মত মানুষের জাতি, গর্ব্ব এবং অবজ্ঞার গণ্ডি ভেঙ্গে দিতে পারে এমন আর কিছুই নাই। আমাদের প্রাণ-সংহারক শত্রুরও বেদনা এবং শোক আমাদের চিত্তে সমবেদনা জাগ্রত করে। দুঃখক্লিষ্ট অসভ্য লোক আমাদের ভ্রাতৃবৎ মনে হয়। এমন কি প্রজাপীড়ক রাজা, যে নিজের প্রজাগণকে অত্যাচার করিয়া সকলের অত্যন্ত ঘৃণার পাত্র হইয়াছে, তাহাকেও লোকে ক্ষমা করে, যখন তাহার জীবনে বিপদ ও দুঃখ আসে।

গভীর দুঃখের সময় ধনী দরিদ্রের, সাদা কালোর, উচ্চপদস্থ নিম্নপদস্থের, খ্রীষ্টান অখ্রীষ্টানের ও শিক্ষিত অশিক্ষিতের যে ভেদাভেদ, সব বিদূরিত হ'য়ে যায়। বাহিরে মানুষে মানুষে যে ভেদ তাহা যেন নদীর প্রবহমান স্রোতের মত। এ-সকলের নীচে, সমস্ত বিশ্বব্যাপী মানবে মানবে অন্তঃসলিলা এক সাধারণ মানবত্বের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। সাধারণ জীবনযাত্রার সময় সৌভাগ্য আমাদের জীবন-তরণীকে তুচ্ছ ভাবে পরিচালিত করিয়া এদিকে ওদিকে প্রবাহিত করে ও আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করে সত্য, কিন্তু যখন দুঃখের বোঝা তরণীকে আরো নিমজ্জিত করিয়া অন্তঃসলিলা স্রোতের সংস্পর্শে আনয়ন করে ও তাহার লুক্কায়িত শক্তি অনুভব করিতে সক্ষম করে; তখন আমরা সকলে ভাসিয়া একদিকে চলি। তখন আমরা পরস্পর ভাই ভাই।

একদা পেরি নগরীর রাজপথ দিয়া একদল ফরাসী সৈন্য তাহাদের সামরিক নিশান উড্ডীয়মান করতঃ রণবাদ্য বাজাইতে বাজাইতে দ্রুত চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময় একটি রাস্তার মোড়ে একটি বৃদ্ধা, শোকার্ত্তা রমণীকে তাহারা দেখিতে পাইল। তিনি তাঁহার শিশু সন্তানের মৃতদেহ নিয়া যাইতেছিলেন। তাহাকে দেখিয়া সৈন্যদলের প্রত্যেক সৈনিক তাহাদের মাথার টুপি খুলিয়া দণ্ডায়মান হইল এবং তাহাকে চলিয়া যাইতে দিল। দুঃখের সমপ্রাণতাসাধনশক্তির ইহা একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সেই সৈন্যদলের প্রত্যেক কর্ম্মচারী ও প্রতি সৈনিক এই কার্য্য দ্বারা ইহাই স্বীকার করিলেন যে এই শোকার্ত্তা বৃদ্ধা—যাহার সঙ্গে কাহারও পরিচয় নাই—তাহাদের বোন।

কোন সম্প্রদায়ের গৃহে গৃহে গমন কর, এবং মৃদু ও সদয় ভাবে সহানুভূতিপূর্ণ অন্তঃকরণে সেই গৃহবাসীদিগের অন্তর্নিহিত গভীর অনুভূতি ও লুক্কায়িত ভাবসকলের অনুসন্ধান কর, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে, অধিকাংশ গৃহের 'নির্জ্জন কক্ষে একটি অস্থিকঙ্কাল' 'skeleton in the closet' আছে, যাহা কেহই জানে না। মানবের জীবন এবং অভিজ্ঞতা যেমন বিভিন্ন তেমনি ইহার প্রকৃতিও বিসদৃশ। কিন্তু প্রায় প্রতি পরিবারেই কাহারও না কাহারও প্রাণে প্রিয়জনবিয়োগের কি নিরাশার, কি আশাভঙ্গের, কি একাকিত্বের, কি অনুতাপের কি ভবিষ্যতের আকুলতার জন্য দুঃখ বর্ত্তমান রহিয়াছে দেখিতে পাইবে।

এই দুঃখের প্রকৃতি বিচিত্র। এক পরিবারে স্বামী স্ত্রী সন্তানের মৃত্যু একটি শূন্যস্থান রেখে গেছে এবং যাদের জন্য শোক করিতে করিতে শোকের উৎস নিঃশেষিত হইয়াছে।

অন্য পরিবারে কোন প্রিয়জন যিনি কিছুদিন পূর্ব্বে সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন, তিনি ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া গৃহের এক নিভৃত কক্ষে যেন নীরব মৃত্যুর দোলায় দুলিতেছেন

অপর পরিবারে একটি ক্ষীণকায় শিশু—মনমুগ্ধকর, নির্ম্মল ও অতি প্রিয়, কিন্তু এমন কাহিল যে পিতামাতার মনে সর্ব্বদাই একটা আশঙ্কা জাগ্রত রহিয়াছে যে কোন্ সময় তাঁহাদের প্রিয়ধন চ'লে যান।

অন্য এক গৃহ হইতে স্বামী, ভ্রাতা কি অপর কোন প্রিয় জন সেই মহাযুদ্ধে গমন করিয়া আর গৃহে ফিরিলেন না—Flanders দেশে সমাধিস্থ হইয়া রহিলেন। অথবা যাহারা ফিরিলেন তাহারাও পঙ্গু ও বিকলাঙ্গ হইয়া রহিলেন।

কোন পরিবারে স্বামী এবং পিতা যিনি এক সময় সৎ ও সাধুজীবন যাপন করিয়া পরিবারের আশা ও আনন্দের কারণ ছিলেন, এখন অল্পে অল্পে পানাসক্ত হইতেছেন।

অপর পরিবারে একটি ছেলে কুসঙ্গের প্রভাবে নানাবিধ কুকর্ম্মে লিপ্ত হইয়া প্রিয়জনের অসীম দুঃখের কারণ হইয়াছে।

কোন পরিবারে অসুখকর বিবাহ, কোন পরিবারে দারিদ্র্য, কোন পরিবারে পাপতাপ, এরূপ কত ভাবে দুঃখ আপনার রাজত্ব বিস্তার করিয়াছে।

দুঃখের সর্ব্বব্যাপিত্ব বুদ্ধের জীবনের এই আখ্যায়িকাটি হইতে অতি সুন্দরভাবে প্রমাণিত হইতেছে। সেই ঘটনাটি এরূপ—

কৃশা নামে একটি রমণী তাহার একমাত্র পুত্র হারাইয়া সেই মৃতসন্তান বক্ষে লইয়া মহাত্মা বুদ্ধের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন যে, 'আমি তোমার মৃত পুত্রকে বাঁচাইয়া দিতে পারিব, যদি তুমি আমাকে কিছু সর্ষপ আনিয়া দিতে পার, এমন গৃহ হইতে যে গৃহে কেহ কখনও মরে নাই।' বুদ্ধের সেই আদেশ শুনিয়া সেই রমণী গৃহে গৃহে সর্ষপের অনুসন্ধান করিলেন এব তাহা প্রতি গৃহেই পাইলেন। কিন্তু এমন কোন গৃহ পাইলেন না, যে গৃহে মৃত্যু ঘটে নাই। সকল গৃহ হইতে সেই শোকসন্তপ্তা মাতা একই উত্তর পাইল। সকলেই তাহাকে বলিল যে 'এমন গৃহ নাই যেখানে মৃত্যু ঘটে নাই।' এরূপ ব্যর্থ সন্ধানের পর সেই মহিলা যখন মৃত পুত্রকে বক্ষে ধারণ করিয়া মহাত্মা বুদ্ধের নিকট ফিরিতেছিলেন, তখন তাহার প্রাণে এক নূতন আলো প্রকাশিত হইল, তিনি তখন বুঝিতে পারিলেন যে শোক তাহার একার নহে। তিনি তখন মহাত্মা বুদ্ধকে বলিলেন, 'প্রভো, আমি মনে করিয়াছিলাম যে আমার মত এমন শোকার্ত্ত আর কেহ নাই, কিন্তু এখন বুঝিতে পারিতেছি সকলেই আমার মত শোকার্ত্ত এবং এমন কোন গৃহ নাই যে গৃহে মৃত্যু পদার্পণ করে নাই। এই কথার পর, তিনি তাহার মৃত সন্তানের সৎকার করিয়া প্রাণে শান্তি লাভ করিলেন।

আমরা মনে করি দুঃখটা বৃদ্ধ ও বয়স্কদিগের জন্য, কিন্তু এটা একটা ভ্রান্ত ধারণা। জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই দুঃখের আগমন ঘটে। ছোটদের নিকট দুঃখ একটি নূতন অভিজ্ঞতা তাহারা দুঃখ সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত থাকে না। তাহারা দৃঢ় ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা লাভ করে নাই, যাহা পরে তাহাদের জীবনে আসিবে। তাহারা দুঃখের গভীর উদ্দেশ্য তখনও বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু তাহাদের বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন তাহাদের জ্ঞান বর্দ্ধিত হইবে, তখন হয়ত তাহারা দুঃখের রহস্য বুঝিতে সমর্থ হইবে।

মানবীয় দুঃখের দ্বারা গঠিত ভ্রাতৃমণ্ডলীর কোন বিশেষ নিদর্শন বা পরিচায়ক চিহ্ন নাই। ইহা মানুষের কোন আইন কানুন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে, সকল দেশেই, ইহার সভ্যেরা অবস্থিতি করিতেছেন।

অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে পুরুষ বেশ দৃঢ় ভাবে, কি যে রমণী হাস্যমুখে, চ'লে যাচ্ছেন এবং যাদের কথা তুমি একটুও ভাব না, তাহারা হয়ত জীবনের অনেক দুঃখের মধ্য দিয়া এই অবস্থা লাভ করেছেন। যেমন কোন মহিলা কোঁকড়ান চুলের গুচ্ছ দ্বারা কপালের কি মাথার অশোভন ক্ষত চিহ্ন আচ্ছাদন করিয়া রাখেন, তেমনি মহৎ পুরুষ ও মহিয়সী মহিলারা অনেক কষ্ট করিয়া হাস্যমুখে ও আনন্দপূর্ণ বাক্য দ্বারা তাহাদের জীবনের দুঃখের ক্ষতগুলি ঢেকে রাখেন।

সাধারণতঃ মানবের গভীর দুঃখ অতি অল্প লোকেই

জানিতে পারে। জড় জগতের ক্ষমতাশালী শক্তিসকলের ন্যায়, মানব জীবনের গভীরতম দুঃখসমূহও নির্ব্বাক। এ সকল দুঃখের কথা কেহ কাহাকে বলিতে পারে না, তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা যেন দুষ্প্রাপ্য। আমরা দুঃখ সহ্য করি এবং শান্ত হইয়া অবস্থিতি করি। দুঃখের সমবেদনাও এরূপ নীরব হওয়া প্রয়োজন। ইহার প্রকাশ বাচাল বাক্যে নহে, কিন্তু ইহার অভিব্যক্তি অশ্রুজলে, সদয় সংযততায় ও অকপট আলিঙ্গনে।

মানব প্রকৃতির একটি চমৎকার ও শোকাবহ ঘটনা এই যে, যাহারা আমাদের খুব ঘনিষ্ঠ তাহাদিগকেও অনেক সময় আমরা খুব ভাল করিয়া জানি না। অনেকের সঙ্গে বহু বৎসর যাবৎ আমাদের প্রতি দিনই দেখা হয়, তবু তাহাদিগকে আমরা জানি না। আমরা মনে করি আমরা তাহাদিগকে জানি, কিন্তু ইহা আমাদের ভ্রান্ত ধারণা। আমরা শুধু তাহাদের বাহির জানি, কিন্তু খাঁটি পুরুষ কি রমণীকে জানি না। অপিচ যাহারা বহু বৎসর আমাদের একসঙ্গে বাস করেছে তাহাদের জীবনের আভ্যন্তরিক কথাও আমরা এত অল্পই জানি যে, মনে হয় তাহারা যেন অন্য দেশের লোক।

ভাই বোন একত্র বাস করে ও একসঙ্গে বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু তাহারা পরস্পরে গভীর আনন্দ ও নিরানন্দের সরিক নয়। তাহাদের পরিচয় অতি হাল্কা ও ভাসা ভাসা। ইহা কি কম ক্ষতির বিষয়!

এরূপ স্বামী ও স্ত্রী আছেন, যাহারা সারা জীবন অপরিচিতই থাকেন। Thomas Carlyle তাঁহার পত্নী-বিয়োগের পর যে কারুণ্যপূর্ণ ও হৃদয়বিদারক স্বীকারোক্তি করেছেন, তাহা কি আমরা পাঠ করি নাই? ইহা দ্বারা আমার উপরের উক্তির সত্যতা সপ্রমাণিত হয়। কার্লাইল তাঁহার লেখা পড়ার কাজে এত ব্যস্ত থাকিতেন যে, তিনি অনন্যসংলগ্ন হইয়া কাহারও সঙ্গে মিশিতেন না। এজন্য তাঁহার স্ত্রীও স্বতন্ত্র হইয়াই বাস করিতেন। ইহাতে তাঁহার হৃদয় একবারে ভেঙে পড়িল। তাঁহার মৃত্যুর পর কার্লাইল বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি নিজের কি ক্ষতি করিয়াছেন ও স্ত্রীর প্রতি কি অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু নিষ্ফল ক্রন্দন ভিন্ন এই অন্যায়ের তখন আর কোন প্রতীকার রহিল না। এজন্য তিনি নিদারুণ অনুশোচনা করেছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে জরাজীর্ণ দেহে তিনি নিয়মিত ভাবে পত্নীর সমাধিস্থলে তীর্থযাত্রীর মত যাত্রা করিতেন এবং সেই গ্রাম্য শান্ত গোরস্থানে লোকচক্ষুর অগোচরে হাঁটু গাড়িয়া বসিতেন ও দুঃখপূর্ণ প্রাণের আবেগে, যে পবিত্র স্থানে তাহার স্ত্রী চিরনিদ্রিতা সেখানে, বার বার চুম্বন করিতেন। ইহা অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় যে, যাহার প্রাণ এমন সত্য প্রেমে পূর্ণ ছিল, তিনি তাঁহার প্রেমাস্পদকে জীবন্ত প্রেম স্পর্শ হইতে বঞ্চিত করতঃ প্রেমোপবাসে ক্লিষ্ট করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দিলেন।

অনেক পিতা মাতা আছেন যাঁহারা তাঁহাদের সন্তানদিগকে জানেন না, এবং এমন সন্তানেরও অভাব নাই যাহারা পিতামাতাকে ভাল করিয়া জানে না। ইহা কি দুঃখের বিষয় এবং ইহাতে জগতের কত ক্ষতি হইতেছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। অনেক পিতা মাতা আছেন যাঁহারা সন্তানদিগের জীবনে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন না। সন্তানেরা বয়প্রাপ্ত হওয়া মাত্র মন্দ ভাবে জীবন পরিচালিত করে এবং যাহাদের কথা ও উপদেশবাক্য শ্রবণ করা উচিত তাহাদিগকে অগ্রাহ্য করে। ইহার কারণ কি? কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া অধিকাংশ স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শৈশবে সন্তানেরা পিতা মাতা হইতে দূরে থাকে। তাঁহারা ভুলে যান যে, সন্তানদের জীবনে সুখ দুঃখ আছে, তাহাদের জীবনে সমস্যা, আশা, নিরাশা, আকাঙ্ক্ষা আছে, তাহাদের অদৃশ্য একটি আত্মিক জীবন আছে, যে জীবনে তাহারা জনক জননীর প্রেম ও সহানুভূতি চায়। তাঁহারা সন্তানের শৈশব জীবন হইতে আপনাদিগকে দূরে রাখেন, যখন তাহাদের জীবনে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করা সহজ হইত। এরূপ করাতে সন্তান ও মাতা পিতার মধ্যে এমন দূরত্ব ঘটে যে, তাহা আর কোন প্রকারে ঘুচে না।

প্রতি মানব আত্মায়ই একটি নিভৃত কক্ষ আছে, যাহা তাহার জীবনের পবিত্রতম গৃহ। এই আত্মমন্দিরেই ভগবান বাস করেন, যখন মানুষ স্বেচ্ছায় হৃদয়দ্বার খুলিয়া সযত্নে তাঁহাকে বরণ করিয়া লয়। এখানেই সকল প্রিয়তম ও পবিত্রতম প্রেমের বসতি। ইহাই মানুষের অদেহী প্রিয়জনদিগের মন্দির এবং পবিত্রতম সুখ দুঃখের নির্জ্জন আগার। কবি সত্যই বলেছেন—

"The heart knoweth its own bitterness;
And a stranger does not intermeddle with its joys"

হৃদয় তাহার নিজের দুঃখের কথা জানে, কোনও অপরিচিত বা বাহিরের লোক ইহার আনন্দে হস্তক্ষেপ করে না।

দুঃখের বিষয় বিস্তৃত ভাবেই উপরে বলা হইয়াছে। ইহার বিভিন্ন প্রকৃতি এবং কি ভাবে দুঃখ সমস্ত মানুষের জীবন পূর্ণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছে, একথা বলিতে গিয়া ইহারও আভাস দেওয়া হইয়াছে যে, দুঃখ নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারময় নহে। এই অন্ধকারের সঙ্গে জ্যোতির আভাও মিশ্রিত এবং দুঃখের মধ্যে গভীর মঙ্গল উদ্দেশ্যও নিহিত রহিয়াছে—যাহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না। যতই আমরা দুঃখ এড়াইতে চাই না কেন, তাহার হাত হইতে কিন্তু আমরা মুক্তি লাভ করিতে পারি না। মানব জীবনের কল্যাণসাধনে রৌদ্র বৃষ্টি প্রভৃতির ন্যায় দুঃখেরও প্রয়োজন আছে।

এখন আমরা দুঃখ সম্বন্ধে কয়েকটি সাধু বাক্য উদ্ধৃত করিব। Jean Ingelow বলেছেন—

"Sorrows humanize the race."
দুঃখ মানব জাতির হৃদয় কোমল করে।
বাইবেল গ্রন্থের Epistle to the Hebrewsএ আছে
"Men are made perfect through suffering."
মানুষ দুঃখের ভিতর দিয়া পূর্ণতা লাভ করে।

যীশু বলেছেন,

"Blessed are they that mourn"—শোকার্ত্তরা ধন্য

Dante বলেছেন, 'Sorrows marry us to God.'

দুঃখ আমাদিগকে ভগবানের সঙ্গে পরিণীত করে।

একজন প্রাচীন সাধু বলেছেন,

"Thus saith the Lord, I have seen thy tears; behold I will heal thee."

প্রভু পরমেশ্বর বলেছেন, আমি তোমার অশ্রু দেখিয়াছি, আমি তাহা মুছাইয়া দিব।

মানবের দৃষ্টিকে অন্তর্মুখীন করিতে এবং চরিত্রকে সম্পদশালী করিতে দুঃখের মত আর কিছু নাই।

আমাদের মনে জিজ্ঞাসার উদয় হইতে পারে যে, দুঃখ ভিন্ন কি আর কোন উপায়ে ভগবান মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতিবিধান করিতে পারিতেন না? ইহার উত্তরে এই মাত্র বলা চলে যে, অসীম ও অনন্ত জ্ঞানশালী বিধাতার ব্যবস্থার বিচার করা আমাদের মত অল্পজ্ঞানীর সাধ্যাতীত।

মৃত্যু মানবকে দেহমুক্ত না করিলে, তাহার পক্ষে বর্ত্তমান জীবনের অপর পার্শ্বে স্থিত আত্মিক জীবন লাভ করা অসম্ভব হইত। দুঃখ মৃত্যুর নিত্য সহচর। প্রিয়জনেরা যখন চ'লে যান, তখন তাঁদের সঙ্গে যে বিচ্ছেদ ঘটে তাহাতে অতি অল্পদিনের জন্য হইলেও দুঃখ হয়। ব্যাধি, পীড়া ও দেহের ক্ষয় হইতেই দেহ বিনষ্ট হয়। আমরা সসীম জীব, আমাদের জ্ঞান ও শক্তি সীমাবদ্ধ, কাজেই আমাদের ভুল করা, কি আকস্মিক বিপদে পড়া স্বাভাবিক। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, দুঃখ বিপদে পড়া আমাদের মত সসীম জীবের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী। অতএব আমরা যে অভিযোগ করি যে ভগবান দুঃখকে আমাদের জীবনের সঙ্গী করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বিরুদ্ধে এই বলা হয় যে, তিনি আমাদিগকে সসীম জীব করিয়াছেন অর্থাৎ আমাদিগকে আদৌ সৃজন করিয়াছেন।

অতএব মানব জীবনের পক্ষে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী ও প্রয়োজনীয়। এই প্রয়োজন কঠোর ও পাশব নহে। কোন একটি শ্রেষ্ঠ শক্তি মানুষের উপর এই বোঝা চাপাইয়াছেন এবং ইহার মধ্যে কোন মঙ্গল নাই, অতএব মানবকে ইহা বহন করিতে হইবে, তাহা নহে। ইহা হিতকারী প্রয়োজন, পরম কল্যাণের নিদান।

যে জীবনে দুঃখ পাইল না, সে জীবনের উপরিভাগেই রহিল, তাহার বালকত্ব ঘুচিল না। সে জীবনের বিশাল সমস্যার কথা, কঠোর সংগ্রাম ও প্রলোভনের কথা—যাহাতে মানব আত্মাকে আলোড়িত করে—কি জানে? মানব জীবনে যে-সব আদর্শ ধ্রুবতারার মত উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশিত হয়, এবং যাহা লাভ করিতে অক্ষম হইয়া মানুষ অসন্তোষ অনুভব করে, তাহার কথাই বা কি জানে?

সংগ্রাম এবং সংযম ভিন্ন চরিত্র উন্নত হয় না, এবং আধ্যাত্মিকতা জীবনে ফুটে উঠে না। অত্যধিক দুঃখের ভিতর দিয়াই মানুষ সংগ্রামে অগ্রসর হয় ও সংযম অবলম্বন করে।

যদি মানুষ পশুবৎ জীবন যাপন করিতে ইচ্ছুক হইয়া উচ্চ ও মহৎ আকাঙ্ক্ষাসমূহকে বিকশিত না করে, তাহা হইলে সে দুঃখের হাত হইতে কতক পরিমাণে বিমুক্ত থাকিতে পারে। কিন্তু এরূপ জীবনে পরিতৃপ্ত না হইয়া যদি উন্নত দেব জীবন চায়, তাহা হইলে তাহাকে ক্লেশ বরণ করিয়া নিতেই হইবে। দুঃখ ক্লেশের দ্বারাই মানুষ দেবপ্রসাদ লাভ করে।

একজন সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক Europe এর একজন বিখ্যাত গায়িকার কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছিলেন যে, 'তাহার শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ হবার জন্য শুধু একটি গভীর দুঃখেরই অভাব রহিয়াছে।' আমি ইহা খুব সত্য বলিয়া মনে করি। বাস্তবিক জগতের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ কি করিয়া যে মানব চিত্তকে স্পর্শ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন তাহার কারণ তাহাদের চিত্ত দুঃখপরশে উন্নত ও পবিত্র হয়েছিল। কবি বলেছেন:

> "The mark of rank in nature
> Is capacity for pain;
> 'Tis the anguish of the singer
> Makes the sweetness of the strain

প্রকৃতিরাজ্যে দুঃখ বহনের ক্ষমতাই আভিজাত্যের পরিচায়ক চিহ্ন। গায়কের গভীর দুঃখই সঙ্গীতকে সুমধুর করে।

এমার্সনের একজন বন্ধু তাঁহার বিষয়ে নিম্ন লিখিত আখ্যায়িকাটি বলিয়াছিলেন:—

'একদিন আমি Emerson এর সঙ্গে কোন কলেজ-প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলাম। সেখানে আমাদের উভয়ের পরিচিত একটি যুবক সেই কলেজে দুটি বিষয়ে শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করিয়াছে দেখিতে পাইলাম। ইহাতে আমি নিজে আনন্দিত হইয়া Emerson এর নিকট আনন্দ প্রকাশ করিলাম যে, আমাদের পরিচিত যুবকটী এমন সম্মান লাভ করিয়াছেন। উত্তরে তিনি বলিলেন, আমি জানি যে এই যুবকটি বেশ ভাল। তবে এখন যদি ইহার উপর কোন বিপদ আসে অর্থাৎ যদি কোন কারণে সে তাহার সহপাঠিদের বিরাগভাজন হয়, কি তাহার পিতার ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতিতে তাহার আর্থিক কষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার সর্ব্ববিধ কল্যাণ হইবে।' তখন আমি জানিতাম না কিন্তু পরে জানিতে পারিয়াছি যে, Emerson এর এই উক্তি তাঁহার নিজের জীবনের পরীক্ষিত সত্য। আট বৎসর বয়সে Emerson পিতৃহীন হন। পিতৃহীন হইয়া তিনি গভীর দারিদ্র্যে পতিত হন; তখন তাহার মা নানাবিধ দুঃখ কষ্ট ও সংগ্রামের ভিতর দিয়া সন্তানকে খুব ভাল শিক্ষা দিয়াছিলেন। Emerson বিশ্বাস করেন যে, তাহার জীবনের যাহা কিছু ভাল তাহার মূলে তাঁহার বাল্য জীবনের দুঃখের সংগ্রাম।

যুক্তরাজ্যের (United States এর) সভাপতি Garfield, যিনি বাল্য জীবনে দুঃখ কি তাহা পূর্ণ মাত্রায় বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তিনি বলেছেন যে 'প্রতি দশ জন যুবকের মধ্যে নয় জনেরই জীবনের শ্রেষ্ঠ বিকাশ দুঃখের ভিতর দিয়া হয়।'

তুমি যে-সকল যুবকদিগকে জান তাহাদিগের মধ্যে কাহারা জীবনে মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে? তাহারা ধনী পিতার সন্তান নহে, যাহারা ভোগবিলাসের ভিতর দিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছে, কিন্তু তাহারা দুঃখ দারিদ্র্য কষ্ট সংগ্রাম ও ত্যাগের ভিতর দিয়াই মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছে।

যুবকদিগের সম্বন্ধে যাহা সত্য, যুবতীদিগের সম্বন্ধেও তাহাই ঠিক। এখানে একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি।

এক সমৃদ্ধ পরিবারে দুটি কন্যা ছিলেন। তাহারা উভয়েই সুখ স্বচ্ছন্দতার ভিতর বর্দ্ধিত ও একই ভাবে শিক্ষিত। উপযুক্ত বয়সে দুজনেরই বিবাহ হইল। একজন খুব ধনী পরিবারে বিবাহিত হইয়া, সুখ স্বচ্ছন্দ, আরাম আমোদ ও ভোগবিলাসের জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। অপর কন্যাটিরও সম্পন্ন গৃহেই বিবাহ হইয়াছিল; কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্যের খারাপ অবস্থায় তাহার বিত্ত বিভব সব চলিয়া গেল। কন্যার স্বামী নানা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করিতে করিতে অল্পদিন পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। কন্যাটি সন্তান সন্ততি নিয়ে বিধবা হইলেন। এতদিন সুখ স্বচ্ছন্দতায় ভিতর বর্দ্ধিত হইয়া বর্ত্তমান দুঃখের অবস্থায় তাহার জীবন ভাবনা চিন্তায় পূর্ণ হইল। কিন্তু এ সকল প্রতিকূল অবস্থায় নিপতিত হইয়া তিনি দমে গেলেন না। সন্তানদিগের শিক্ষা প্রভৃতি সকল গুরুতর কর্ত্তব্যের ভার সাহসের সহিত মাথায়

তুলিয়া নিলেন। সন্তানগণকে অন্ন বস্ত্র দিয়া পালন করিতে হইবে এবং তাহাদিগকে শিক্ষিত করিয়া সৎ ও সাধু জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, এই সংকল্প গ্রহণ করিলেন। এবং ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আত্মহারা হইয়া দীর্ঘকাল নানা প্রকার দুঃখ, দারিদ্র্যের ভিতর দিয়া কি অমানুষিক পরিশ্রমে নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্মের সফলতা প্রদান করিতে সক্ষম হইলেন।

এরূপ ভাবে ত্রিশ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। কন্যাদ্বয় এখন ৫০ বৎসরের মহিলা। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে—তাঁহাদিগের বিবাহিত জীবনের প্রারম্ভে—তাঁহাদের চরিত্রের যে সাদৃশ্য ছিল এখন কি তাহা আছে? না, এখন আর তাহা নাই। যাঁহার জীবনে দায়িত্ব ও দুঃখের সমাবেশ হইয়াছিল, অন্য ভগ্নীর চেয়ে তাঁহার ললাটে অধিকতর চিন্তার রেখা ও মস্তকে অধিকতর পক্ক কেশ দেখা দিয়েছে সত্য, কিন্তু চরিত্রে ও সর্ব্ববিধ স্ত্রী-জনোচিত সদ্‌গুণে তিনি বহুগুণে শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। তাঁহার কার্য্যপ্রণালী শান্ত, স্বর মৃদু ও মধুর, অন্তঃকরণ উদার ও কোমল। তাঁহার সমস্ত প্রকৃতি যেন দুঃখের আঘাতে মোলায়েম পরিপক্ক ও রসাল হইয়াছে। তাঁহাকে দেখিলে এই কথাই বলিতে ইচ্ছা করে যে, সত্যই তিনি ভগবানের মহীয়সী রমণী। তাঁহার সন্তানেরা জননীর চরিত্রের মহত্ত্ব ও শৌর্য্যে অনুপ্রাণিত হইয়া সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে যাইতেছে। তাহাদিগের পরিচিত সকলেই তাহাদিগকে শ্রদ্ধা করে।

অন্য ভগ্নী, যাঁহার বাহ্য সম্পদের কোন অপ্রতুল ছিল না এবং যাঁহার সমস্ত জীবন রবিকরোদ্ভাসিত দীর্ঘ দিনের মত আনন্দ ও প্রমোদে অতিবাহিত হইয়াছে, তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে কি দেখিতে পাই? দেখি, তিনি লঘুচিত্ত ও স্বার্থপর রমণী। তাঁহার চিত্ত প্রশস্ত হয় নাই, আধ্যাত্মিক ভাব প্রাণে জাগে নাই এবং তাঁহার চরিত্র গভীর কি মনোরম হয় নাই, তাঁহার সন্তানেরাও মায়ের মত হাল্কা ও স্বার্থপর হইয়া সংসারে প্রবেশ করিতেছে।

এক পরিবারে প্রতিপালিত, সমান প্রকৃতিবিশিষ্ট এই যে ভগ্নীদ্বয়, যাঁহাদের জীবনের প্রারম্ভে ভবিষ্যৎ জীবনের পরিণতি সম্বন্ধে তুল্য সম্ভাবনাই ছিল, তাঁহাদের এই জীবনের বৈষম্যের কারণ কি? ইহার উত্তর অতি সহজ। চরিত্রের বিকাশে সংগ্রামের প্রয়োজন। যথা সময়ে ও যথাস্থানে দুঃখের মেঘ ও উর্ব্বরতা-সম্পাদনকারী অশ্রুবৃষ্টি (Tear rain) ভিন্ন অন্তঃকরণের উত্তম পুষ্পের বিকাশ ও শ্রেষ্ঠ ফলের প্রকাশ হয় না।

কথিত আছে যে সম্পূর্ণ অন্ধকারের মধ্যেই পক্ষীগণকে মিষ্টতম সঙ্গীত করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। ঠিক্ সেইরূপ মানব জীবনের কাঠিন্য ও দুঃখ যে অন্ধকার সৃজন করে, তাহা হইতেই মানব কণ্ঠে পবিত্রতম সঙ্গীত ধ্বনিত হয়।

অনলের উত্তাপে যেমন ধাতু বিশুদ্ধ হয়, তেমনি দুঃখের আগুনেই মানব আত্মার আবর্জ্জনা বিদূরিত হয়। অতএব ভীত হইও না, কিন্তু

"Let thy gold be cast in the furnace,
 Thy red gold, precious and bright;
Do not fear the hungry fire
 With its caverns of burning light;
And thy gold shall return more precious,
 Free from each spot and stain;
For gold must be tried in fire,
 And hearts must be tried by pain"

তোমার রক্তবর্ণ, উজ্জ্বল মূল্যবান স্বর্ণ চুল্লীতে নিক্ষেপ কর। দহনকারী আলোকে পূর্ণ ক্ষুধিত অগ্নির গর্ত্তকে ভয় করিও না। তোমার স্বর্ণ সমস্ত মলিনতা ও কলঙ্ক হইতে মুক্ত হইয়া অধিকতর মূল্যবান আকারে তোমার নিকট ফিরিয়া আসিবে—কেন না, স্বর্ণকে অগ্নিতে এবং হৃদয়কে দুঃখ বেদনাতে পরীক্ষিত হইতেই হইবে।

দুঃখের শ্রেষ্ঠতম সার্থকতার কথা আমার এখনও বলা হয় নাই। ইহা আমাদিগকে অপরের সহায়তা করিবার উপযুক্ত করে। মানুষ দুঃখের অভিজ্ঞতা হইতে যে শিক্ষা লাভ করে, তাহাতেই তাহার প্রতিবেশীর প্রকৃত উপকার কি সাহায্য করিতে সক্ষম হয়। আত্মিক বিষয়ের অনুশাসন এই যে, যে নিজে বেদনা পেয়েছে শুধু সে-ই অন্যের দুঃখ উপশম করিতে পারে। তাহার পক্ষে সমবেদনা সহজ ও স্বাভাবিক হয়, অন্যথা তাহা অসম্ভব।

একজন শোকার্ত্ত অপর একজন শোকসন্তপ্ত ব্যক্তিকে লিখ্‌ছেন—

"I could not comfort you a year ago,
 But God since then has let me understand;
Now, when I see your tears so often flow
 I do not speak, I only take your hand,
  And then you know
I, too, have walked thro' sorrow's weary land.

2. God gives me power to comfort you at last,
To calm the bitterness of your despair;
So let your burden now on me be cast,
For all you feel to-night my heart can share.
  My grief is past
In the new joy of having yours to bear!"

Marjarie Crosbie.

এক বৎসর পূর্ব্বে আমি তোমাকে সান্ত্বনা দিতে পারিতাম না। কিন্তু ভগবান তাহার পর হইতে আমাকে বুঝিতে দিয়াছেন। এখন, যখন আমি তোমাকে এত সময় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে দেখি, তখন কোনও কথা বলি না, শুধু তোমার হাতখানা ধরি, আর তখন তুমি বুঝিতে পার যে আমিও দুঃখের শ্রান্তিকর পথ দিয়া চলিয়া আসিয়াছি; ভগবান অবশেষে তোমাকে সান্ত্বনা দিবার ও তোমার নিরাশার ঘোর দুঃখ প্রশমিত করিবার শক্তি আমাকে দিয়াছেন। অতএব এখন তোমার বোঝা আমার স্কন্ধে চাপাইয়া দেও। কেননা, অদ্য রজনীতে তুমি যাহা কিছু অনুভব করিতেছ, আমার হৃদয় তাহার অংশভাগী হইতে পারে। তোমার দুঃখ বহন করিবার আনন্দে আমার দুঃখ চলিয়া গিয়াছে।

আমাদের দেশী কবিও এই ভাবই প্রকাশ করিয়াছেন—তাঁহার বিখ্যাত কবিতায়—

চির সুখী জন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত-বেদন বুঝিতে পারে?
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশী-বিষে দংশেনি যারে॥

জগতের অভাব ও দুঃখের অভিজ্ঞতা ভিন্ন কিছুতেই মানব চিত্তে মানুষের প্রতি গভীর সহানুভূতির উদ্রেক হয় না, যাহা সর্ব্ববিধ সেবার কার্য্যে এত প্রয়োজনীয়। তাই বিশ্বের প্রায় সর্ব্ববিধ কল্যাণ কর্ম্মে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারাই সে সব কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন যাঁহারা দুঃখের বিদ্যালয়ে শিক্ষিত। ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত যে মহাত্মা যিশু মানব হিতকারীদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য। ইহার কারণ এই যে, তিনি পাপ তাপ ও দুঃখের সঙ্গে পরিচিত হইয়া জগতে মূর্ত্তিমান দুঃখরূপেই পরিগণিত হইয়াছেন। যেহেতু তাঁহার প্রাণ সমবেদনায় পূর্ণ, এজন্যই তিনি মানব চিত্তে রাজত্ব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছেন, এবং তাঁহার বাণী উনিশ শত বৎসর ধরিয়া মানুষের হৃদয় রাজ্যে পুলক সঞ্চার করিয়াছে।

যিশুর সম্বন্ধে যাহা সত্য প্রত্যেকে মানুষের সম্বন্ধেও তাহাই ঠিক্। দুঃখ না পেলে সমবেদনা জাগে না, এবং সমবেদনার অভাবে কল্যাণ কর্ম্মও জীবন্ত হয় না। Sufferers may not always be saviours but saviours are always sufferers, দুঃখ যারা পেয়েছে তাহারা সকল সময় দুঃখ অপনোদনে

অক্ষম হইতে পারে, কিন্তু দুঃখের শান্তিকারিরা সর্ব্বক্ষেত্রেই দুঃখভোগী।

এই পৃথিবীতে আমাদের গৃহে গৃহে পরিবারে পরিবারে ও আশে পাশে কত দুঃখ দৈন্য, শোক তাপ! ভগবান আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমরা দুঃখের আগুনে বিশুদ্ধ হইয়া যথা সাধ্য তাহা দূর করিতে সমর্থ হই।

সায়ংকালে "ব্রাহ্মসমাজের বার্ত্তা" বিষয়ে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

(ক্রমশঃ)

পরলোকগত হেমচন্দ্র সরকার

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দারুণ রোগের তাড়নায় তাঁহার শরীর শীঘ্র ক্ষয় হইতে লাগিল। শরীর রক্ষার জন্য পরিবারের সকলের আগ্রহ ও চেষ্টায় কার্সিয়াং একটি বাড়ী করা হইল। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে পিতৃদেব তাঁহার আপনার গৃহের জন্য এই স্থানটি পছন্দ করিলেন। ইহা কেবল স্বাস্থ্যের নিবাস না করিয়া, সাধনের ক্ষেত্র করিবেন, এই আশা ও উদ্দেশ্য লইয়াই এই স্থানটী নির্ব্বাচন করিলেন, এবং মাতৃদেবীর মৃত্যুর পরে একটী Trust Deed করিয়া তাহা সাধনাশ্রমের প্রচারক, কর্ম্মী এবং অন্যান্য ভক্ত, যাঁহারা সাধন ভজন করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের ব্যবহারের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। হিমালয় পর্ব্বত ও সমুদ্র তীর, এই উভয় স্থান তাঁহার সাধনের অনুকূল স্থান ছিল। তাই পাহাড়ে যেরূপ একটি সাধন-ক্ষেত্র করিলেন, সেইরূপ গোপালপুরে সমুদ্র-তীরে আর একটি গৃহ রাখিয়া গিয়াছেন।

দারিদ্র্যপীড়িত পরিবারের সাহায্যার্থে তাঁহার চেষ্টায় Brahmo Samaj Co-operative Credit Society স্থাপিত হয়। ইহার প্রথম সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র সেন এম এ, বি এল, ও পিতৃদেব শেষ পর্য্যন্ত তাহার president ছিলেন।

প্রচারক ও প্রচার কার্য্যের সাহায্যের জন্য একটি All-India Mission Fund করিয়াছিলেন; ইহা হইতে নূতন যাঁহারা প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইতেন এবং সমাজ হইতে যাঁহাদের সাহায্য পাওয়া যাইত না, তাঁহাদের সাহায্য করা হইত। ইহা পরে লুপ্ত হইয়াছে। ১৯১৮ সালে পিতৃদেব সাধনাশ্রমের তত্ত্বাবধায়ক হইলেন। তখন হইতে তিনি সাধনাশ্রমে অধিক সময় কাটাইতেন ১৯১৯ সালে মাতৃদেবীর মৃত্যুর পর সাধনাশ্রমে বাস করিতে আরম্ভ করেন। তখন তাঁহার শরীর এত রুগ্ন যে, আমরা তাঁহাকে হারাইবার ভয়েই বিশেষ চিন্তিত ও ব্যস্ত ছিলাম। এখন হইতে সাধনাশ্রম বাবার গৃহ হইল। সাধনাশ্রমের অধ্যক্ষ হইয়া ইহার উন্নতি সাধনে অনেক যত্ন করিয়াছিলেন। ভারতের নানা স্থানে আশ্রমের শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আশ্রমের মহৎ আদর্শ সর্ব্বদা প্রাণে জাগ্রত রাখিবার জন্য মাসের প্রথমে উৎসব হইত এবং প্রত্যহ সাধনার্থীদের ক্লাস হইত। 'ধর্ম্মের জন্য আসিয়াছি' বা 'ব্রাহ্মসমাজের কাজ করিতে চাই' বলিয়া যাঁহারা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন, তাঁহাদের কাহাকেও তিনি ফিরাইতেন না। কিছুদিন শিক্ষাধীন রাখিয়া পরীক্ষা করিয়া যখন কিছুই করিতে পারিতেন না, তখন দুঃখের সহিত বিদায় দিতেন। তাঁহার এই মহত্ত্বের অপব্যবহার অনেকে করিয়াছেন, এবং ইহার জন্য অনেকে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতেও ছাড়েন নাই।

তাঁহার শেষ জীবনের আর তিনটী কাজ শিবনাথ-স্মৃতিভবন, শতবার্ষিক মহোৎসব ও Parliament of Religions. শিবনাথ-স্মৃতিভবন নির্ম্মাণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে ভারতের সকল স্থানে দ্বারে দ্বারে গিয়া ভিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং প্রায় একলক্ষ টাকা স্বাক্ষরও করাইয়াছিলেন। ভগ্ন দেহে ইহার জন্য যে পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে একেবারে মৃত্যুর দ্বারে আনিয়া ফেলিল। ইহার পরেও তিনি শতবার্ষিক মহোৎসব, অনেক বাধা ও প্রতিকূলতার মধ্যে, সম্পন্ন করিলেন। উৎসবান্তে ভারতের সমগ্র জগতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া Parliament of Religions সম্পন্ন হয়। আমেরিকায় Chicagoতে ইহার প্রথম অধিবেশন হয়। তাহার পরে ভারতে—যাহাকে পিতৃদেব Land of all Religions বলিতেন—ইহার দ্বিতীয় অধিবেশন হয়।

সুদূর পশ্চিমে পৃথিবীর এক প্রান্তে বসিয়া পিতৃদেবের এই কার্য্যকলাপ দেখিয়া তাঁহার ধর্ম্মবন্ধুগণ মুগ্ধ হইলেন, এবং তাঁহাকে Doctor of Divinity উপাধি দ্বারা ভূষিত করিতে ইচ্ছুক হইলেন। ইহার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন পিতৃদেবের অকৃত্রিম বন্ধু Rev. J. T. Sunderland। শতবার্ষিক মহোৎসব আগষ্ট মাসে আরম্ভ হয়; তাহার ছয় মাস পূর্ব্বেই D. D. উপাধি দেওয়া স্থির হইয়া যায়। D. D. উপাধির যে Diploma তাহার তারিখ জুন ১৯২৮। সেই বৎসর অক্টোবর মাসে Meadville Theological Schoolএর president Dr. Southworth কলিকাতায় আসেন। তাঁহারা কলিকাতায় একটি Special Convocation করিয়া D. D. উপাধি দান করেন। এই উপলক্ষ্যে তাঁহারা পিতৃদেবের গুণাবলী ও কার্য্যাবলীর বিষয়ে বক্তৃতা করেন। পৃথিবীর এক প্রান্তে বসিয়া ইঁহারা তাঁহাকে যেরূপ সূক্ষ্মভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহার দশ অংশের এক অংশও আমরা নিকটে থাকিয়া বুঝিতে পারি নাই। তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি।

"Hemchandra Sarkar, preacher, lecturer, editor, author, organiser, social reformer, missionary; possessing as preacher the ability to inspire your fellow-men with the love of righteousness and to bring them into the presence of the Eternal; as a writer, gifted with the power of lucid and forceful expression and of interpreting with fairness and sympathy varions religious movements and tendencies; as a missionary passionately devoted to the task of bringing the emancipating principles of the Brahmo Samaj into the religious life of India for the enrichment, not only of India but also of the world; and ever ready to undertake the most arduous journeys to any part of India in response to an appeal for service; you have given yourself for more than a generation to the varied work of religious leadership with the self forgetting devotion which has characterised not only the great Rishis and Gurus of your race but also the saints and martyrs of every faith. And in the midst of these labours you have found time, to the lasting detriment of your health, for organising and carrying on work among the depressed classes.

Beholding from a distance the apostolic zeal with which you entered into the work of your illustrious predecessors and have helped to perpetuate and strengthen the institution they founded, observing the fortitude with which, in spite of difficulties and discouragements and serious physical

infirmity, you have proceeded with your great task, your brethren of the Faculty and Board of Trustees of Meadville Theological School have conferred upon you the Honorary Degree of Doctor of Divinity and have authorised me to hand you this diploma in the same; and never in the history of the school has this degree been more worthily bestowed.

১৯২৯ সালে সর্ব্বসম্মতিক্রমে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি-রূপে নির্ব্বাচিত হইলেন; এবং তখন হইতে বিগত বৎসর পর্য্যন্ত সভাপতিরূপে কার্য্য করিয়াছেন। ১৯২৬ সালে তাঁহার দৃষ্টিশক্তি চলিয়া যায়। তখন হইতেই দৃষ্টিহীন হইয়াই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। দৃষ্টিশক্তি চলিয়া যাইবার পর তিনি বই লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার অনেক বই অন্ধ হইবার পরে লেখা। তাঁহার স্মৃতিশক্তি, দূরদর্শিতা ও লিখিবার শক্তি অসাধারণ ছিল। অপরদিকে তাঁহার মন শিশুর মত শুভ্র ও সরল ছিল। তিনি কিরূপ জ্ঞানপিপাসু জ্ঞানী ছিলেন তাঁহার পুস্তক পাঠ করিলেই তাহার আভাস পাওয়া যায়। তাঁহার লিখিত Religious Evolution আমেরিকার একটি কলেজে পাঠ্যপুস্তক হইয়াছে। পিতৃদেব স্বভাবতঃ বিনয়ী ছিলেন, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার তেজস্বিতা ও নির্ভীকতার চরম দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। যাহা সত্য ও ন্যায় বুঝিয়াছিলেন তাহা অকুতোভয়ে ও নির্ভীকচিত্তে করিয়া গিয়াছেন। এবং তাহাতে কাহার মানরক্ষা হইল কি না হইল, তাহা ভাবিবার জন্য পশ্চাৎ ফিরিয়া কখনও দেখিতেন না। তাঁহার ধর্ম্মজীবন কোন্ স্তরে উঠিয়াছিল তাহা লিখিবার ক্ষমতা আমার নাই। তাঁহার 'জীবন তরঙ্গে' ধর্ম্মজীবনের সংগ্রাম বর্ণিত আছে। জীবনের শেষের দিক দেখিতাম, পিতৃদেব স্নানের পর যখন উপাসনায় নিমগ্ন থাকিতেন, তখন তাঁহার মুখ আশ্চর্য্য অপার্থিব জ্যোতিতে পূর্ণ হইত। ইহা দেখিয়া আমার এক বন্ধু বলিয়াছিলেন, "তোমার পিতার মুখ ব্রহ্মতেজে উদ্ভাসিত। তিনি আর অধিক দিন এ দেশে থাকিবেন না। এখন হইতে প্রস্তুত হও।" শেষের দিকে, বিশেষতঃ গত এক বৎসর, তাঁহার ভবিষ্যতের দৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছিল। যেরূপে চলিয়া যাইবেন তাহা বহু পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন। তিনি অজ্ঞাত ভবিষ্যতের কথা এত সঠিক বলিয়া দিতেন যে, আমি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতাম। এই সময়ে পিতৃদেবের শরীরের অবস্থা এত শোচনীয় হইয়াছিল যে তিনি অধিকাংশ সময় শুইয়া থাকিতেন। ইংলণ্ড ও আমেরিকা হইতে আগত বন্ধুরা তাঁহার ভগ্ন গৃহে তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন এবং বলিতেন, 'We have came to see the great man in bed'. পিতৃদেব বিছানা হইতে হাত বাড়াইয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতেন। ইহার পর পৃথিবীর নানা স্থান হইতে কত ধনী, ত্যাগী ও reformer পিতৃদেবকে দেখিবার জন্য আমাদের এই জীর্ণ গৃহে আগমন করিয়াছেন, তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া তৃপ্ত হইয়া গিয়াছেন! পৃথিবীর দ্রষ্টব্য বস্তুর মধ্যে পিতৃদেবও যেন একজন।

গত ২৩শে ডিসেম্বর তিনি দেহত্যাগ করেন। তাহার পূর্ব্বে তিন মাস ধরিয়া শয্যাগত ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার জ্বর হইয়াছিল; ক্ষীণদেহ তাহা আর সহ্য করিতে পারিল না। আমাদের কাহারও প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার মহাপ্রস্থানের সময় হইল। সুদীর্ঘ কর্ম্মপূর্ণ জীবন সমাপ্ত হইল।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ

ব্রাহ্মসমাজ

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ২২শে জানুয়ারী কলিকাতা নগরীতে ব্রাহ্ম কর্ম্মী বাবু গোলোকচন্দ্র দাস মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে ৭২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি যখন যেখানে ছিলেন নানাপ্রকারে ব্রাহ্ম-সমাজের সেবা করিয়াছেন, এবং দীর্ঘকাল তত্ত্ববিদ্যা সভার সম্পাদক ও অধ্যক্ষ সভার সভ্য ছিলেন। এবার মৃত্যু আমাদের অনেক নিষ্ঠাবান কর্ম্মীকেই আমাদের নিকট হইতে লইয়া যাইতেছে। ইঁহাদের স্থান পূরণ হওয়া কঠিন।

বিগত ১৪ই জানুয়ারী পরলোকগতা রমলা বসুর আদ্য-শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ব্রজকুমার নিয়োগী আচার্য্যের কার্য্য, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী শাস্ত্র পাঠ, পিতা শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনী বর্ণন ও প্রার্থনা, এবং স্বামী শ্রীযুক্ত সুধাংশুমোহন বসু প্রার্থনা করেন।

বিগত ১৫ই জানুয়ারী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে পরলোকগত ললিতমোহন দাসের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং পণ্ডিত শ্রীনাথ চন্দ লিখিত নিম্ন প্রকাশিত পত্র পাঠ করিবার পর জীবনী বর্ণন করেন। (তাহা পরে প্রকাশিত হইবে।) ঐ তারিখে ও অন্য দিবসে নানা স্থানে তাঁহার ও হেমবাবুর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে।

"একই সময়ে দুইটী অমূল্য রত্ন হারাইয়া গরিব ব্রাহ্মসমাজ আরও গরিব হইয়া পড়িল। হেমচন্দ্রের শোকাশ্রু সংবৃত না হইতেই, সমাজের নিঃস্বার্থ সেবক ও মাতৃভূমির সুসন্তান মহাপ্রাণ ললিতমোহনও অসময়ে চলিয়া গেলেন। তিনি যেমন শ্রেষ্ঠ আচার্য্য ও একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন, তেমনি জননী জন্মভূমির জন্যও সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়া, ধর্ম্মের ভিত্তিতে রাজনীতির প্রতিষ্ঠা করিতে অশেষ দুঃখ বহন করিয়া গিয়াছেন। এক কথায় বলা যায়, তিনি যেমন খাঁটি ব্রাহ্ম তেমনি খাঁটি স্বদেশী ছিলেন। একাধারে এরূপ বিচিত্র মিলন সচরাচর দেখা যায় না।

স্বদেশের ভাবী আশাস্থল যুবকমণ্ডলীর সর্ব্ববিধ কল্যাণ-সাধনে তিনি তন্ময় হইয়াছিলেন—এই মহাব্রত পালনের জন্য কোনরূপ দুঃখ কষ্ট স্বীকার করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। ময়মনসিংহের শরচ্চন্দ্রের ন্যায় তিনিও "পরার্থে সর্ব্বমুৎসৃজেৎ" এই মহাবাক্য জীবন দিয়া সার্থক করিয়া গেলেন।

আমাদের ললিতমোহন যেমন সুবক্তা তেমনি সুলেখক ছিলেন। তাঁহার "ধর্ম্মসাধন" ও অনেকগুলি উপদেশ ধর্ম্মার্থী-দিগের চির সহায় হইয়া থাকিবে। তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত তাঁহার লিখিত "নিবেদন" সকলেই আগ্রহ করিয়া পড়িতাম। উহাতে তাঁহার গভীর আধ্যাত্মিকতা ও কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এই লেখাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে তাঁহার বড়ই ইচ্ছা ছিল। আশা করি ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার এই অভিলাষ পূর্ণ করিবেন।

এই সকল সদাত্মার আদর্শ জীবন স্মরণ করিলে মন উন্নত হয়, নিরুৎসাহে উৎসাহ হয়; আবার নিজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইতে হয়। প্রার্থনা করি, ইঁহাদের পুণ্য জীবনের দৃষ্টান্ত সার্থক হউক, ইঁহাদের পদাঙ্কানুসরণে ভাবী বংশ উন্নত হইয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করুক। স্বর্গে এবং পৃথিবীতে পিতার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চিরশান্তিতে রাখুন এবং আত্মীয় স্বজনদিগের শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাগ কর্ত্তৃক ২১শে মাঘ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।—সম্পাদক শ্রীবরদাকান্ত বসু, বি-এ

Registered No. 65

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥
ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ
১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫৫ ভাগ
২১শ সংখ্যা।

১লা ফাল্গুন, সোমবার ১৩৩৯, ১৮৫৪ শক,
ব্রাহ্মসংবৎ ১০৪
13th February, 1933.

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০
অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে প্রেম-স্বরূপ, তোমার অপার স্নেহের দান ত তুমি অজস্র ধারেই নিত্য বর্ষণ করিতেছ! বিশেষ ভাবে উৎসবের মধ্যে তোমার কত করুণাই আমরা উপভোগ করিয়াছি! কিন্তু তুমি জান, আমরা সকলে তাহা ভাল করিয়া গ্রহণ করিতে ও সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারি নাই। যাহা একটু রাখিতে পারিয়াছি, তাহাও যে কখন চকিতে হারাইয়া ফেলিব, জানি না। তাই উৎসবান্তেও তোমার কৃপার ভিখারী হইয়াই তোমার নিকট উপস্থিত হইতেছি। তুমি অসীম স্নেহভরে যাহা দিয়াছ তাহা যাহাতে আমরা সযত্নে রক্ষা করিতে পারি, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে সে শক্তি ও আগ্রহ আকাঙ্ক্ষা প্রদান কর। আমরা যেন আর উদাসীন হইয়া মৃতের ন্যায় জীবনপথে না চলি, নূতন উৎসাহে, নূতন বলে, নূতন ভাবে সর্ব্বদা উন্নতি ও কল্যাণের দিকে অগ্রসর হইতে পারি। আমাদিগের উপর তুমি যে-সকল গুরুতর দায়িত্ব প্রদান করিয়াছ তাহা যেন আমরা কখনও ভুলিয়া না যাই, পরন্তু সমগ্র মনপ্রাণের সহিত তাহা সম্পন্ন করিয়া যেন ধন্য ও কৃতার্থ হইতে পারি, তোমার কার্য্যও যেন একটু অগ্রসর করিতে সমর্থ হই। তোমার সেবকগণ একে একে চলিয়া যাইতেছেন, আমাদেরও কাহার আহ্বান কখন আসিবে জানি না। জীবনের অবশিষ্ট সময় যাহাতে আমরা সম্পূর্ণরূপে তোমার অনুগত হইয়া চলিতে পারি, আপনাদের সকল কর্তৃত্ব অহঙ্কার বিসর্জন দিয়া তোমার কার্য্য করিতে পারি, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগের সকলকে সে বুদ্ধি ও শক্তি প্রদান কর। আমাদের প্রতি জীবনে ও সমগ্র সমাজে একমাত্র তোমার ইচ্ছাই জয়যুক্ত হউক। তোমার ইচ্ছাই সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ হউক।

ত্র্যধিক-শততম মাঘোৎসব

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৪ঠা মাঘ (১৭ই জানুয়ারী) মঙ্গলবার—প্রাতে উপাসনা। শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র সোম আচার্য্যের কার্য্য করেন। তিনি "দেশ, যুগধর্ম্ম জংযুক্ত হইতেছে" এই বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। তাঁহার উপদেশের মর্ম্ম পরে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

সায়ংকালে ডাক্তার কালিদাস নাগ "জাতীয় ও অন্তর্জাতীয় সমাজ" বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রার্থনা করেন।

৫ই মাঘ (১৮ই জানুয়ারী) বুধবার—প্রাতে উপাসনা। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। "সমাজের জীবনী-শক্তি কোথায়" বিষয়ে তাঁহার প্রদত্ত উপদেশ নিম্নে প্রকাশিত হইল:—

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃপরস্তাৎ"

অজ্ঞান-অন্ধকারের পরপারে, জড় জগতের পরপারে, স্থূল সসীম বিষয় ব্যাপারের পরপারে—দৃশ্যমান জীবনের পরপারে—তপস্বী কি দেখ্‌লেন,—যা পেয়ে জীবনের সকল বাসনার তৃপ্তি হ'ল—জ্ঞানপরিতৃপ্ত, কৃতাত্মা, বীতরাগ ও প্রশান্ত হলেন, মৃত্যুঞ্জয়ী হলেন। এ জগতের কিছুই সেই জাগ্রত আত্মাকে অবরুদ্ধ করতে পারলে না, সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠিত হ'ল। সে কি জ্যোতির্ম্ময় দৃশ্য, কি অমৃতময় চিত্র দেখেছিলেন—যার তুলনায়, এ জগতের ধন মান ভোগবিলাস, সব তুচ্ছ হ'য়ে গিয়েছিল? কত হাজার বছর ধ'রে সেই দিব্য জ্যোতি ভারতের এখানে সেখানে প্রচ্ছন্ন ছিল,—তাইতে

কত ত্যাগ, সংযম, শুদ্ধতা এনেছিল, কত দর্শন, গীতা, সাধন-প্রণালী, কত মত, কত পথ নির্গত হয়েছিল, কত হৃদয়মন্দিরে গোপনে আলোক বিতরণ করেছিল! কত কাল পরে আবার সেই জ্যোতি জগতের সকলের চিরন্তন পরমধনরূপে এই ব্রাহ্মসমাজে প্রকাশিত হয়েছে!

যুবরাজ অমিতাভ, ভোগবিলাসের মধ্যে বাস করতে করতে বাহিরে দেখ্‌লেন জরা মৃত্যু,—অন্তরে দেখ্‌লেন অস্পষ্ট অদৃশ্য কি যেন নাই, কি যেন চাই,—শুন্‌লেন কি এক আহ্বান,—চল্লেন সব ভোগ ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ ক'রে, তার সন্ধানে। বহু সাধনের পর যে বস্তু পেলেন, সে কি বস্তু? একটা আলোক, একটা আদর্শ, একটা ভাব—বিষয়ের রাজ্যের উপরে, ভোগ-বিলাসের ঊর্দ্ধে, বিশ্বশান্তি বিশ্বমৈত্রী, ব্রহ্মবিহার—অনির্ব্বচনীয় কি একটা আছে,—কোটি কোটি জীবন তার অস্পষ্ট আভাসে নিয়মিত হচ্ছে,—সহস্র সহস্র নরনারী, দেশে দেশে যুগে যুগে, সেই আদেশের আকর্ষণে ছুটেছে। সে ভোগবিলাস নয়, আর একটা কিছু।

মহাত্মা যিশু স্বর্গরাজ্য, পিতার প্রেমের শাসনের রাজ্য, অপরাধী সন্তানকে সস্নেহে বুকে ধরার রাজ্য, অন্তরে দেখেছিলেন,—সেই রাজ্যের শোভায় মুগ্ধ হ'য়ে, মত্ত হ'য়ে, তাতেই নিজে বাস করবার জন্য, এবং জগদ্বাসীকে সেই রাজ্যের প্রজা করবার জন্য,—জীবন উৎসর্গ করলেন। সে যে কি বস্তু, তা এখনও স্পষ্ট হ'ল না; কিন্তু সেই অদৃশ্য ভাব, সেই আদর্শ হাজার হাজার মানুষকে বিষয়বাসনা ও ভোগবিলাসের রাজ্য হ'তে আকর্ষণ ক'রে, মহা ত্যাগের ও পুণ্যের সাধনায় লিপ্ত করেছে।

মহাত্মা মহম্মদ, গুরু নানক, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি সকলেই, সাধারণ মানুষ ছিলেন; কিন্তু অন্তরে কি একটা দেখ্‌লেন, যার সঙ্গে তুলনায় এই দৃশ্যমান জগৎ, এই জনসমাজ বড় বিসদৃশ বোধ হ'ল। প্রভুর হুকুম, পরম গুরুর বাণী, প্রিয়তমের সঙ্গে প্রেম-যোগ, এ কি বস্তু যা না হ'লে সব তুচ্ছ! এ কি বস্তু বলা যায় না। কিন্তু এই অদৃশ্য, অনির্ব্বচনীয় ভাব, এই আদর্শ—হাজার হাজার লোককে উন্নত জ্ঞান প্রেম ও পবিত্রতার জীবনে আকর্ষণ করেছে।

দেশে দেশে, যুগে যুগে, দু'দশ জন মানুষ, অন্তরে কি এক আলোক, কি এক দৃশ্য দেখেছেন, কি বাণী শুনেছেন,—যার সন্ধান বাইরে খুঁজে পাওয়া যায় না, সাধারণ মানুষ যা ধরতে পারে না, বুঝ্‌তে পারে না, সংসারের কত পাকা লোক যাকে পাগলামী ব'লে উড়িয়ে দিয়েছে, কত রাজ-শক্তি যাকে চূর্ণ করতে চেষ্টা করেছে; তবু সেই সকল ভাব, সেই সকল আদর্শ, সেই সকল অদৃশ্য দৃশ্য—মানব-সমাজের নিত্য কল্যাণের শ্রেষ্ঠ উপাদান রূপে, মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ্ ও শক্তি রূপে দিন দিন স্পষ্টতর হ'য়ে উঠ্‌ছে, এবং স্বীকৃত হচ্ছে।

জগতের দুর্গতি দেখে প্রশ্ন ওঠে,—জনক, যাজ্ঞবল্ক, সিদ্ধার্থ, ঈশা, মহম্মদ, নানক, চৈতন্য কেন জন্মেছিলেন, জগত যদি না উন্নত হবে? কারণ, মানবসমাজের সর্ব্বত্র কি বিপরীত অবস্থা! কোথায় ব্রাহ্মী-স্থিতি, কোথায় বিশ্ব-মৈত্রী, কোথায় বিশুদ্ধা ভক্তি, কোথায় প্রেম-যোগ, কোথায় শুদ্ধ শান্ত জীবন, কোথায় স্বর্গরাজ্য, প্রেম, ক্ষমা, ভ্রাতৃভাব, পিতার আদেশে আত্মসমর্পণ?

জগতের সর্ব্বত্র, মানবসমাজের সকল বিভাগ, ব্রহ্ম-বিবর্জ্জিত, অপ্রেমের কাড়াকাড়ি ও মারামারিতে পূর্ণ, ভোগ-বিলাসের তাড়নায় নরনারী ক্ষিপ্ত, ধ্বংসের পথে ধাবমান।

কেন এমন হ'ল? এর প্রতিকার কি?

এ ত নূতন ঘটনা নয়! জগতে, মানবসমাজে, বহু বার, নানা দেশে, এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হয়েছে,—অশান্তি মানুষকে অস্থির করেছে, সুখ শান্তি হরণ করেছে; বড় বড় রাজ্যের ও ধর্ম্মসমাজের পতন হয়েছে।

তার এক কারণ—ধর্ম্মের গ্লানি, এবং প্রতিকারের এক উপায়—ধর্ম্ম শক্তির আবির্ভাব।

এ পুরোণো কথা? একবারে অতি আধুনিক ইংরেজ গ্রন্থকারের কথা বলি,—তিনি ধর্ম্মাচার্য্য ন'ন, সমাজসমস্যা সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তাশীল ব্যক্তি—J. G. Brooks. তিনি একখানি বইএ লিখেছেন,

"We do not look to the New York Chamber of Commerce for language of the pulpit.—but the report of that Chamber on Industrial problems makes its first appeal to the moral factor; this, it says, outweighs all physical factors. The British Commission on Industrial Unrest finds no way out except in a new spirit, a more humane spirit."

বিষয় বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও, পাকা ব্যবসাদারী বুদ্ধি ও তৎপরতা যথেষ্ট নয়। 'moral factor' 'new sprit' চাই, নীতি এবং প্রীতি চাই। কিন্তু তা আসে কি ক'রে?

নীতি এবং প্রীতি বাইরের বস্তু নয়, অন্তরের অনুভূতি, অদৃশ্য ভাব, অদৃশ্য আদর্শ—তা টাকা দিয়ে কেনা যায় না, প্রখর বুদ্ধির দ্বারা পাওয়া যায় না, কোন সভার নির্দ্ধারণ-লভ্যও নয়। নীতি ও প্রীতি, শুদ্ধতা ও প্রেম পেতে হ'লে, অদৃশ্য রাজ্যের মহাজনদের কাছেই যেতে হয়, তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করতে হয়। অদৃশ্য মূলধন এবং অদৃশ্য ভাববস্তু-সকল নিয়ে কারবার করতে হয়।

মানব-সমাজে পরস্পর-বিরোধী দুই ভাব কাজ ক'রে থাকে। এক ভাব অদৃশ্য রাজ্যের দিকে মানুষকে আকর্ষণ করে, অপর ভাব স্থূল ও অনিত্য বিষয়-রাজ্যে মানুষকে আবদ্ধ করে।

অদৃশ্য অতীন্দ্রিয় মহৎ বিশুদ্ধ ভাবে ও উচ্চ আদর্শে অনুরাগ মানুষকে এবং জাতিকে মহৎ করে। স্থূল এবং অনিত্য বিষয়ে আসক্তি মানুষকে হীন, এবং সমাজ ও জাতিকে দুর্ব্বল ও পতিত করে।

অদৃশ্য মহৎ ভাব ও উন্নত আদর্শ চালক হ'লে, বিষয় কর্ম্মও উন্নত ও মার্জ্জিত হয়। বিষয়াসক্তি প্রবল হ'লে

উন্নত মহৎ ভাবসকলকে ম্লান করে; এবং ক্রমশঃ জীবন অধোগতিপ্রাপ্ত হয়। বিষয়াসক্তির ফল প্রথমে নৈতিক অবনতি, তার পর প্রীতির অভাব বশতঃ একতার হ্রাস, এবং তা হ'তে দুর্ব্বলতা ও নির্জ্জীবতা। তার ফল দুঃখ দুর্গতি অশান্তি।

কোন সমাজ বা কোন দেশের মধ্যে, যখন কোন মহৎ ভাব ও উন্নত আদর্শ, সেই সমাজ বা দেশকে পরিচালিত করে, তার সমস্ত কাজকর্ম নিয়মিত করে, তখন সেই ভাব ও আদর্শই তার প্রকৃত জীবন, প্রকৃত শক্তি।

পূর্ব্বে উক্ত অসাধারণ ব্যক্তিগণ, কোন একটি মহৎ ভাব ও উন্নত আদর্শকে অন্তরে লাভ ক'রে, তার অধীন ও অনুগত হয়েছিলেন ব'লেই যুগ যুগ ধ'রে, শত শত বিপ্লব মাঝে, মানব-সমাজের আলোকস্তম্ভ স্বরূপ হ'য়ে রয়েছেন।

এই সকল মহৎ ভাব ও উন্নত আদর্শ দুই আকারে মানব-সমাজে সঞ্চারিত হয় ও রক্ষা পায়।

প্রথম—কোন দেশ বা সমাজের অতীত ইতিহাসে সেই মহৎ ভাবের অনুসরণের যত গৌরবময় দৃষ্টান্ত তার প্রতি সতেজ শ্রদ্ধা; শত বীরের বীরত্ব, সত্যের জন্য যত ত্যাগ, ভগবানের ভক্তের যত ব্যাকুলতা, সেবায় আত্মসমর্পণ, সে সকলের প্রতি জীবন্ত অনুরাগ; এবং বর্ত্তমানকালে সেই সকল জীবনের প্রভাবে সমাজের মধ্যে যত উন্নত রুচি, যত বিশুদ্ধ আনন্দসম্ভোগের ব্যবস্থা, উন্নত সমাজব্যবস্থা ও অনুষ্ঠানাদি, যত গভীর শোক দুঃখের মধ্যে সেই স্বর্গীয় ভাবের প্রকাশ, সেই সকলের সঙ্গে সকলের হৃদয়ের সংস্পর্শ; এবং ভবিষ্যতে সেই মহা ভাব ও আদর্শের পূর্ণতর সফলতা সম্বন্ধে সকলের অন্তরে উচ্চ আশা।

এই সমস্ত একত্র হ'য়ে, সমাজ বা জাতির একটি আদর্শ চিত্র আমাদের অন্তরে অঙ্কিত করে। এই অতীত উজ্জ্বল শ্রদ্ধা ও অনুরাগ, বর্ত্তমানের উন্নত প্রভাবের সম্ভোগ ও সংস্পর্শ এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা একত্র মিলিত হ'য়ে যে অদৃশ্য আদর্শ চিত্র, ভাবচিত্র অঙ্কিত হয়, তা জীবন্ত বস্তু, একটা মহা শক্তি। এই শক্তি, এই vision, দেশ সমাজ মণ্ডলীর এই আধ্যাত্মিক স্বর্গীয় চিত্র—মানুষকে চালায়, খাটায়, ভাবে বিভোর করে, পাগল করে। এই চিত্র ভাবরাজ্যের বস্তু, কিন্তু বিষয় সম্পদ্ স্ত্রী পুত্রাদি অপেক্ষা কম বাস্তব নয়।

এই আন্তরিক আদর্শ চিত্র মানব জীবনে, সমাজের জীবনে, জাতীয় জীবনে মহা শক্তি, সত্য জীবনী-শক্তি।

দ্বিতীয়তঃ—সমাজের সঙ্ঘবদ্ধ জীবনে বদ্ধমূল এই আদর্শ চিত্র ও তার প্রভাব হ'তে, নানা উন্নত ভাব ব্যক্তিগত জীবনের পরিচালকরূপে ফুটে ওঠে; সেগুলি যখন সহজে সকলে স্বীকার করে, তখন এই শক্তি সর্ব্ব সাধারণকে উন্নত করে, সমাজকে শক্তিশালী ও মনোহর করে। যেমন—সত্যনিষ্ঠা, সাধুতা, ভ্রাতৃভাব ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা প্রভৃতি; এই সকল যে কোন উন্নত বিশুদ্ধ মহা ভাব ও আদর্শের অন্তর্গত। কিন্তু যখন কোন মহা ভাব ও আদর্শের প্রথম ও প্রধান সাধকগণের দৃষ্টান্তের ফলে, সমাজের সাধারণ নর-নারীর অন্তরে এমন একটা বিশুদ্ধ নৈতিক বায়ু প্রবাহিত হয় যে, সত্যনিষ্ঠা, সাধুতা, ভ্রাতৃভাব প্রভৃতি স্বভাবতঃই তাদের মনকে মুগ্ধ করে, এবং তার বিপরীত ভাব ও আচরণ মনকে ক্লিষ্ট করে, তখন সাধারণ লোকও সহজেই অনুভব করে,—আমাদের এমন করতে নাই,—মিথ্যা চালাকী, কর্ত্তব্যে অবহেলা, ঝগড়া বিবাদ, পরনিন্দা, এ সব বড় নীচ বিষয়, এ সব আমাদের করতে নাই, এ সবে ধর্ম্মের, সমাজের, বংশের, ও আমার নিজের আত্মার অপমান হবে, অধোগতি হবে। এই ভাবও আধ্যাত্মিক শক্তি।

সকলেরই ব্যক্তিগত রুচি প্রবৃত্তি, পারিবারিক সুখ দুঃখ আছে। কিন্তু যখন ঐ সকল উচ্চ ভাব এমন প্রবলভাবে সমাজে বর্ত্তমান থাকে এবং জীবনকে নিয়মিত করে যে, ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি, পারিবারিক সুখ দুঃখ, ধন সম্পদ, মান সম্ভ্রম—সব তার কাছে ছোট হ'য়ে যায়; বহু লোক সর্ব্বস্ব দিয়ে এই মহৎ ভাবসকলের অনুবর্ত্তী হয়,—এই আদর্শ রক্ষার জন্য,—ধর্ম্মের ও সমাজের গৌরব রক্ষার জন্য, ধন মান প্রাণ সব দেয়—তখন সেই সমাজ সত্য জীবনে জীবিত।

কোন মহা ভাব বা উন্নত আদর্শ, যখন মানবচিত্তে স্থান পায়, তখন সেই ভাব সেই আদর্শ তার সকল কাজে, সকল আকাঙ্ক্ষায় প্রবেশ করে,—ধর্ম্ম, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র-জীবনের সকল বিভাগকে নিয়মিত করে। সেই ভাবের প্রেরণায়, নব সাহিত্য, নব শিল্প সৃষ্ট হয়, নব নব পথে মানব-জীবন ধাবিত হয়।

ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন শ্মশানের ন্যায় ভারতে, এক শত তিন বছর পূর্ব্বে, রামমোহন যে মহা ভাবের প্রেরণার অধীন হ'য়ে যে ব্রহ্মমন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করেছিলেন, যে আদর্শের নেশায় বিভোর হ'য়ে একাকী, এই মৃত্যুসমাকীর্ণ মানবসমাজে অমৃতের বীজ বপন ক'রে গেলেন, সেই মহা ভাব, সেই আদর্শ যে কতদূর বিকশিত ও বিস্তৃত হ'য়েছে, তা আমরা সকলেই জানি। তা নিয়ে আমরা গৌরব করি, তার জন্য ভগবানকে কৃতজ্ঞতা দিই।

কিন্তু আমরা কি সেই মহা ভাব ও উন্নত আদর্শের গৌরব রক্ষা করতে পারছি? আমাদের ব্রাহ্মসমাজের—দৈন্য ও দুর্ব্বলতার কথা বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। সকল বিভাগে দৈন্য ও দুর্ব্বলতা সুস্পষ্ট। উৎসব-ক্ষেত্রেও তা স্পষ্টতর।

আবার নব জীবন, নব শক্তি লাভ করতে হ'লে, তার উৎস কোথায়? ব্রাহ্মসমাজের কোথাও, কোন যুগে কি সেই ভাব, সেই আদর্শ মহাশক্তিরূপে পরিণত হ'য়েছিল? মরাকে বাঁচিয়েছিল, খোঁড়াকে চলিয়েছিল, বোবাকে বলিয়েছিল?

ভগবৎকৃপায় সেরূপ যুগ এসেছিল, এবং সেই উজ্জ্বল জীবন্ত চিত্রসকল অনুপ্রাণনসঞ্চারকারী শক্তিরূপে বর্ত্তমান আছে। আদর্শ কখনও সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করা যায় না; তার অনুরূপ হ'তে প্রয়াস করা যায়—সেই প্রয়াসেই আদর্শ জীবিত থাকে, এবং নবজীবন দান করে।

জগতের সকল দেশের সকল ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষগণের

বাণীর সার বাণী রামমোহন ঘোষণা করেছিলেন, "ভাব সেই একে," এবং "ভালবাস তাঁর সন্তানগণকে।" তখন তাঁর কথা কেও বোঝেই নাই। যখন সে বাণী যুবক দেবেন্দ্রনাথের অন্তরে প্রবেশ করল, তখন কি হ'ল? সত্যস্বরূপের আধ্যাত্মিক প্রত্যক্ষ অর্চনা কর্‌বার অধিকারী সকলে,—এই এক মহা ভাবের প্রেরণায় শত বন্ধন হ'তে মুক্ত, স্বাধীন আত্মার কি জীবন্ত ভাব! স্বাধীনতার স্পর্শ পেয়ে ভয় অবসাদ কেটে যেতে লাগ্‌ল। নব জীবন, নব উদ্যম ফুটে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। যাঁরা সে ভাব, সে বাণী অন্তরে পেলেন, তাঁদের মধ্যে যেন নব যৌবন সঞ্চার হ'ল!

রোগমুক্ত বালকের পক্ষে একটি সামান্য ফুলও যেমন কত যেন সম্ভোগের বস্তু ব'লে মনে হয়, তেমনি, সাক্ষাৎ পরম পিতার পরিচয় পেয়ে, স্বাধীনতার আভাস পেয়ে, সকলের পক্ষে জীবন এক নূতনতর সম্মানের বিষয়, অতি বড়, অতি মহৎ, গভীর ও উচ্চতর সম্ভোগের বিষয় হ'য়ে উঠ্‌ল। কাব্য, কবিতা, সাহিত্য, কথা বার্ত্তা, পোষাক, হাসি তামাসা, সব উন্নত ও মার্জ্জিত হ'তে লাগ্‌ল। সে-সকলের মূলে একটা মহা ভাব—আদর্শ জীবন, আদর্শ সমাজ, আদর্শ দেশ, আদর্শ রাজ্যের মানসচিত্র,—সব সেই একের অনুগত, একের ভাবে অনুরঞ্জিত —সেই চিত্রে অনুরাগ। সেই ভাবের, সেই আদর্শের গৌরব-রক্ষা, তার রাজ্যবিস্তার—এই হ'য়েছিল সকলের আকাঙ্ক্ষা, তাতে সকলে—কয়জন মাত্র—একপ্রাণ। সে কি মহা ভাব!

তা হ'তে ক্রমশঃ এসে পড়্‌ল কত দুঃসাহসের কাজ, কত ত্যাগ, কত আত্মবিসর্জ্জন, কত সংযম, শুদ্ধাচার! এক এক জনের জীবন যেন এক একটি কাব্য হ'য়ে উঠ্‌ল। সে সময় সমাজের বাতাসে উন্নত জীবনের প্রবাহ বইতে লাগ্‌ল, উচ্চ শিক্ষার একটা স্রোত এসে পড়্‌ল।

জ্ঞানালোচনায়—"তত্ত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকার" প্রথম যুগের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ কর্‌ছি। তার সঙ্গে "ব্রহ্মবিদ্যালয়।" জ্ঞানের সকল বিভাগ নব আলোকে উদ্ভাসিত হ'য়েছিল।

ধর্ম্ম সাধনে—মহর্ষির ঐকান্তিকতা, কেশবচন্দ্রের ব্যাকুলতা, এবং সঙ্গতের অন্তরঙ্গ যুবকদলের অনুরাগ—দেখ্‌বার বস্তু। সকল বিষয়ে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠতম, পবিত্রতম ভাব ও আদর্শের অনুগমন। অন্তর ও বাহির, বিশ্বাস ও ব্যবহার, আদর্শ ও আচরণ এক করা। কি নিষ্ঠা, কি ত্যাগ, কি উৎসাহ, কি প্রসন্নতা, ভোগবিলাসে কি অবহেলা!

সমাজসংস্কারে, পরিবারসংস্কারে—রীতি নীতি ধর্ম্মানুষ্ঠান সংস্কারে—কি সাহস, কি সংগ্রাম, কি সত্যানুরাগ!

ব্রহ্মনিষ্ঠ জীবন, ব্রহ্মনিষ্ঠ সমাজ ও পরিবার—এই এক ভাব, এক আদর্শ, সকলকে পেয়ে বসেছিল। সমস্ত বিষয়কে reform, reorganize, spiritualize, uplift করার জন্য, নিজেরা উন্নত হ'য়ে অপরকে উন্নত কর্‌বার জন্য পাগল!

এই যে আদর্শে অনুরাগ—এতে তাঁরা কেবল ভাবুক হন নাই, মহাকর্ম্মীও হয়েছিলেন।

বিদ্যালয় স্থাপন, দোকান পরিচালন, শিল্পের উন্নতি, রাজনীতির চর্চ্চা প্রভৃতি সকল বিষয়েই, সে যুগের ব্রাহ্মগণ ঐ মহাভাবের প্রেরণায়, নব জীবন, উন্নত ও বিশুদ্ধ ভাব সঞ্চার করেছিলেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠার যুগের কথা স্মরণীয়, ও ঢাকার সঙ্গত, বরিশালের প্রেম পরিবার স্মরণীয় বিষয়।

ব্যক্তিগত চরিত্রের শুদ্ধতা ও শোভা—অপূর্ব্ব, অসাধারণ। কথায় বার্ত্তায় সত্যনিষ্ঠার ফলে "বোধ হয়" ও "চেষ্টা কর্‌ব" সম্ভ্রমের বিষয়।

দারিদ্র্যের শত কশাঘাতেও অপরের স্ব-ইচ্ছাদত্ত অবৈধ অর্থগ্রহণে বিতৃষ্ণা, ঘৃণা,—গৌরবের বিষয়।

মানব-অন্তরে এই মহৎ আদর্শে অনুরাগ জাগিয়ে রাখা,— সব চেয়ে বড় মূলধন,—টাকা ঘর বাড়ী তার তুলনায় কিছুই নয়।

ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রহ্মমন্দির মানব অন্তরে ঐ সকল মহৎ ভাব ও উন্নত আদর্শের প্রতি অনুরাগ জাগ্রত রাখ্‌বার জন্য বিধাতার বিধান। পার্থিব ধন সম্পদ ভোগবিলাস নয়, অদৃশ্য আদর্শ ও মহৎ ভাব, যে পরিমাণে হৃদয় মনকে অধিকার করে, জীবনকে পরিচালিত করে, সেই পরিমাণে মানুষের ব্যক্তিগত উন্নতি, সমাজের শক্তি এবং জগতের কল্যাণ। সে-বস্তু বাহিরে পাওয়া যায় না। জগতের ইতিহাসের, এবং ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসের অন্তঃপুরে, সমাজের মানস-মন্দিরে সেই চিন্ময় ভাব ও আদর্শ-সকল, দৃষ্টান্তসকল পথপ্রদর্শক আলোক-স্তম্ভরূপে বর্ত্তমান আছে, —সেই মন্দিরে প্রবেশ কর্‌তে হবে,—সে মহামিলন-মন্দিরে অতীত ও বর্ত্তমানের মিলন, সকল দেশ ও কালের মিলন, সকল ভাব ও আদর্শের সমন্বয়। সেই মন্দিরে প্রবেশ ক'রে, নব ভাব নব প্রেরণা লাভ করাতেই উৎসব সার্থক, এবং সমাজে নব শক্তি ও নব জীবন সঞ্চার সম্ভব।

সায়ংকালে সঙ্গত সভার উৎসব। শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র সোম সভাপতির কার্য্য করেন, এবং শ্রীমান অতুলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দেব, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দাস যথাক্রমে 'উদ্বোধন', "আরাধনা", "ধ্যান" ও "প্রার্থনা" বিষয়ে চারিটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। (ক্রমশঃ)

আশা, আনন্দ ও নব আদেশের প্রতীক্ষা।

(১১ই মাঘ প্রাতঃকালীন উপাসনায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক নিবেদিত উপদেশ)।

ভক্তিভাজন আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর একটি অমূল্য উপদেশে ব'লেছেন, সজীব ধর্ম্মজীবনের ফল,—আশা, আনন্দ ও বল। তিনি ব'লেছেন, কোনও ধর্ম্মসমাজের জীবন বেঁচে আছে কি না, তার পরীক্ষা এই যে, তার মানুষগুলির মধ্যে আশা আনন্দ ও বল বিদ্যমান আছে কি না। সেণ্ট পল মানব-অন্তরে ঐশীশক্তির (Spiritএর) ক্রিয়ার বর্ণনা কর্‌তে গিয়ে আরও বিস্তৃত ক'রে ব'লেছেন যে, "The fruit of the Spirit is love, joy, peace; long-suffering,

gentleness, goodness; faith, meekness, temperance" (Gal. V. 22, 23), অর্থাৎ, ঐশ্বরিক ভাবের প্রবাহ যখন মানবজীবনে কার্য্য করে, তখন তার ফল হয় প্রেম আনন্দ ও শান্তি, সহিষ্ণুতা কোমলতা ও সহৃদয়তা, বিশ্বাস বিনয় ও সংযম।

ঐশীশক্তির ক্রিয়ার ফল কি? সজীব ধর্ম্মজীবনের চিহ্ন কি? এই প্রশ্নের উত্তরে উভয়েই প্রায় এক কথা ব'লেছেন। শাস্ত্রী মহাশয় "আশা ও বল" এই দুই শব্দে যে-বস্তুকে ব্যক্ত ক'রেছেন, তা সেণ্ট পলের "faith" এই একটি শব্দে প্রকাশিত হ'য়েছে। সেণ্ট পল আনন্দ আশা ও বলের অতিরিক্ত আর যে যে লক্ষণের উল্লেখ ক'রেছেন, তাকে এক কথায় বলা যায় প্রেমানুগত স্বভাব।

আজ আমার মন এই ভাবে ব্যাকুল হ'য়ে র'য়েছে যে, আমরা রাজা রামমোহন রায়ের দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রবেশ কর্‌বার সময় কেমন ক'রে আশা নিয়ে, আনন্দ নিয়ে, এবং নবযুগের উপযোগী নব আদেশ ভিক্ষার ভাবটি নিয়ে প্রবেশ কর্‌তে পারি। ব্রাহ্মসমাজ এই এক শতাব্দীর কিছু অধিক কাল ধ'রে সেই প্রাণস্বরূপের প্রাণস্পর্শ যদি কিছুমাত্রও লাভ ক'রে থাকে, তবে আজ তার লক্ষণসকল আমাদের মধ্যে প্রকাশ পাওয়া আবশ্যক। সে লক্ষণ কি কি? আশা, আনন্দ, ঈশ্বরের নব আদেশ লাভের ও নব কর্ত্তব্য গ্রহণের জন্য ঔৎসুক্য, এবং প্রেমানুগত চরিত্র।

আশা ও আনন্দ, এ দুটি বস্তুকে ধর্ম্মসাধনে অনেকে বিশেষ মূল্য দেন না। আমি এ দুটিকে প্রকৃত ধর্ম্মসাধনের অপরিহার্য্য অঙ্গ ব'লে অনুভব করি।

ব্রাহ্মসমাজের অগ্রণীগণ।

আজ প্রথমতঃ আমরা আমাদের অগ্রণীদের দিকে তাকিয়ে মনকে আশায় ও আনন্দে পূর্ণ করি। তাঁদের আনন্দপূর্ণ মুখগুলি মনশ্চক্ষে দেখি। তাঁদের আশাশীলতার হাওয়া আত্মার অঙ্গে লাগাই। রামমোহনকে ভাবি, যিনি দেশের মানুষের এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তাদের এত ভালবেসেছিলেন; যিনি এত সংগ্রামের ও এত গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে জীবিত থেকেও, কখনও স্বীয় দেশ সম্বন্ধে ও ভাবী যুগ সম্বন্ধে হতাশ হন নাই; যিনি নিজ অন্তরে ভাবী ভারতের সম্বন্ধে একটি অতি উজ্জ্বল ও গৌরবময় ছবি অঙ্কিত ক'রে রেখেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথকে ভাবি। তাঁর এক দিনের একটি বাণী আমার অন্তরে সর্ব্বদাই জেগে থাকে; বিশেষ ক'রে আজ ১১ই মাঘে সে বাণী খুবই জেগে র'য়েছে। আচার্য্য কেশবচন্দ্রের আহ্বানে সিন্দুরিয়াপটিতে উৎসবের উপাসনা কর্‌তে এসে তিনি বলেছিলেন, "প্রভাতে আনন্দরূপমমৃতম্, মধ্যাহ্নে আনন্দরূপমমৃতম্, সায়াহ্নে আনন্দরূপমমৃতম্।" ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকে ভাবি, যিনি বিশেষ ক'রে হাস্যময়ী মা'র ও আনন্দময় শ্রীহরির উপাসক ছিলেন। আচার্য্য শিবনাথকে ভাবি, যিনি আশা আনন্দ ও বলকেই ধর্ম্মজীবনের লক্ষণ ব'লে প্রকাশ ক'রেছেন। তাঁদের সঙ্গের মানুষ হ'য়ে, তাঁদের সাধনার শিক্ষার ও কর্ম্মের উত্তরাধিকারী হ'য়ে, আমরা কেন নিরানন্দ নিরুৎসাহ আপনাতে-বিশ্বাসহারা একদল মানুষের মত' হ'য়ে থাক্‌ব? আমাদের তা সাজে না।

ব্রাহ্মধর্ম্মের নিত্য ও শাশ্বত ভাব।

তার পর, এ দেশের মানুষের ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষার উপরে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাবটি অনুভব ক'রে আমাদের মনকে আশায় ও আনন্দে পূর্ণ করি। প্রত্যেক প্রাণবান্ ধর্ম্মের দুইটি দিক্ থাকে। তন্মধ্যে একটি তার নিত্য ও শাশ্বত ভাব; দ্বিতীয়টি, যে দেশে ও যে কালে সে জন্মেছে, তার প্রতি তার কর্ত্তব্যের ভাব। ব্রাহ্মধর্ম্ম এই উভয় ভাবে এদেশে ভগবানের অপূর্ব্ব করুণার ও মহিমার সাক্ষীরূপে দণ্ডায়মান।

প্রত্যেক প্রাণবান্ ধর্ম্ম মানব-অন্তরে বিমল ধর্ম্মজ্ঞান সঞ্চার করেন। সেই সত্যস্বরূপকে সত্যরূপে মানুষের কাছে পরিচিত ক'রে দেওয়া, ধর্ম্মরাজ্যের বিমল তত্ত্বসকল মানবমনের সম্মুখে উজ্জ্বল ক'রে ধরা,—ইহা প্রত্যেক সজীব ধর্ম্মের একটি পবিত্র প্রয়াস। আবার, ঈশ্বরবিমুখ মানুষকে ঈশ্বরচরণে ডেকে নিয়ে আস্‌বার জন্য, পথভ্রষ্টকে পথ দেখাবার জন্য, পাপে পতিত মানুষের চিত্তে অনুতাপের অগ্নি জেলে দিবার জন্য, প্রত্যেক সজীব ধর্ম্মে একটি প্রবল শক্তি বিদ্যমান থাকে। সংসার-প্রলোভনে কম্পিত মানুষকে শুদ্ধতার ও সুনীতির আদর্শে দৃঢ় ক'রে দিবার জন্য, এবং যাঁরা সংসারের শ্রেষ্ঠ মানুষ, তাঁদের সম্মুখে মানবজীবনের লক্ষ্যকে উচ্চ ক'রে ধর্‌বার জন্য, প্রত্যেক সজীব ধর্ম্মে একটি প্রবল প্রেরণা নিত্য জাগরিত থাকে। এ সকল হ'ল প্রত্যেক সজীব ধর্ম্মের নিত্য ও শাশ্বত ভাব।

ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে এই ভাবসকল কেমন উজ্জ্বল! আজ আমরা আনন্দের সঙ্গে চিন্তা করি, সত্যের বিমল আলোক দেশমধ্যে বিস্তীর্ণ কর্‌তে ব্রাহ্মসমাজ চির-উৎসুক। ব্রাহ্মসমাজের জ্ঞানতপস্বিগণের জীবন কি গৌরবময়! যাঁরা জ্ঞানের অন্বেষণে, সত্যের সাধনায়, নিযুক্ত হ'য়ে ভোগসুখকে ধনলালসাকে তুচ্ছ ক'রেছেন, পার্থিব জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত হ'য়েও যাঁরা সত্যের সাধক ও সত্যের তপস্বী হ'য়েই পৃথিবীতে বিদ্যমান র'য়েছেন, সত্য আহরণে ও সত্য বিতরণে যাঁরা দেহের শেষ রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত উৎসর্গ ক'রে রেখেছেন, এমন কত মানুষের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস উজ্জ্বল। তাঁদের দিকে তাকিয়ে এই জীবন্ত ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য আমরা গৌরব করি।

আবার, এই ব্রাহ্মধর্ম্ম কত দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির পুরুষকে পাপ ও অসদাচরণের পথ হ'তে সবলে ফিরিয়ে এনেছেন। কত দুর্দ্দশাপন্ন পুরুষ ও নারীকে পাপজীবন হ'তে রক্ষা ক'রে ব্রহ্মচরণে এনে আশ্রয় দান ক'রেছেন। যাঁদের এক দিকে ছিল পৈতৃক সম্পত্তির অধিকার রক্ষার প্রলোভন, অপর দিকে ছিল সত্য, অথবা এক দিকে ছিল সংসারের অশেষ অত্যাচার নিগ্রহ ও লাঞ্ছনার বিভীষিকা, ও অপর দিকে ছিল ধর্ম্মের আহ্বান,—এই প্রকার অবস্থায় পতিত কত মানুষের অন্তরে, কত দুর্ব্বলা নারীর ও অসহায় বালকের অন্তরে, সেই সকল

প্রলোভন ও ভয়কে পদতলে দলন ক'রে আস্‌তে বীর্য্য ও সাহস সঞ্চার ক'রেছেন। যাঁদের সম্মুখে সংসার-ভোগের ও অর্থসঞ্চয়ের পথটি খুব প্রশস্ত ও লোভনীয় হ'য়ে উন্মুক্ত ছিল, এমন কত মানুষকে এই ধর্ম্ম নবীন যৌবনেই সংসারসুখের পথ হ'তে সরিয়ে নিয়ে ঈশ্বরের ও দেশের সেবায় আত্মোৎসর্গ করতে প্রেরণা দান ক'রেছেন। যদিও লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র সমাজমধ্যে ধর্ম্মপ্রাণতা, সত্যপরায়ণতা, কঠোর শুচিতা, এ সকল লক্ষণ আর পূর্ব্বের ন্যায় সুস্পষ্ট নয়, তথাপি অধিকাংশ ব্রাহ্মের সম্বন্ধে এখনও একথা নিশ্চয়ই বল্‌তে পারা যায় যে তাদের হাতে একটি অসত্যের পয়সা, পাপের পয়সা, ঘুষের পয়সা দিতে পারা অপেক্ষা বরং তাদের হাতে জলন্ত অঙ্গার ঢেলে দেওয়া অধিক সহজ। তাদের সম্মুখে একটি অপবিত্র প্রস্তাব করা অপেক্ষা বরং তাদের গায়ে একটি জীবন্ত বিষধর সর্প ফেলে দেওয়া অধিক সহজ। ব্রহ্মকৃপায় ব্রাহ্মধর্ম্ম এইরূপ জলন্ত তেজস্বী চরিত্র সৃষ্টি ক'রেছেন, সেজন্য বিধাতাকে আজ প্রাণ খুলে কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই সকল লক্ষণ ব্রাহ্মধর্ম্মের নিত্য ও শাশ্বত লক্ষণ। ভারত যদি আজই স্বাধীন হ'য়ে যায়, অথবা জাতিভেদ ধর্ম্মভেদ ও দেশব্যাপী সমুদয় বৈষম্য যদি এই মুহূর্ত্তেই ভারতবর্ষ হ'তে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে যায়, তবুও মানুষকে ঈশ্বরচরণে নিয়ে আস্‌বার কাজটি নিষ্প্রয়োজন হ'য়ে যাবে না। এই নিত্য ও শাশ্বত কার্য্যের জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম যে এতদিন এরূপ দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান আছেন, ভবিষ্যতেও দণ্ডায়মান থাক্‌বেন,—ব্রাহ্মধর্ম্মের এই পর্ব্বতসমান দৃঢ় মূর্ত্তিটি দর্শন ক'রে, শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে এস আজ আমরা সকলে আনন্দ করি, গৌরব করি, আশান্বিত হই।

ধর্ম্মের এই নিত্য ও শাশ্বত ভাবের পরম সাধনা হ'ল ঈশ্বরচরণে আত্মসমর্পণ। সেই আত্মসমর্পণকে বার বার নবীভূত ক'রে নেবার জন্যই আমরা উৎসবের আয়োজন করি। ব্রাহ্মরা যদি প্রতি মাঘোৎসবে নূতন ক'রে আত্ম-পরীক্ষা ও নূতন ক'রে ঈশ্বরচরণে আত্মসমর্পণ না করেন, তবে মাঘোৎসব নিষ্ফল, এ কথা আমি উদ্বোধনের দিন আপনাদের কাছে নিবেদন ক'রেছি।

ব্রাহ্মধর্ম্মের দেশকালের প্রতি সজাগ ভাব।

এখন আসুন, আমরা আমাদের প্রিয় ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বিতীয় ভাবটির প্রতি, অর্থাৎ দেশকালের সহিত সংস্পষ্ট দিক্‌টির প্রতি, দৃষ্টিপাত করি।

এই ১৯৩৩ সালটি রাজা রামমোহন রায়ের শতবার্ষিকের বৎসর। আমরা প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে, ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিকের সময়ে, মনস্বী ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের একটি বাক্যের আলোচনা ক'রেছিলাম। সে বাক্যটি এই,—"Rammohun Roy was a man of a thousand years", অর্থাৎ যে-প্রয়োজনের জন্য রামমোহন রায় অভ্যুদিত হ'য়েছিলেন, তাহা শত বৎসরে নয়, সহস্র বৎসরে পূর্ণ হবে। আজ আবার আমরা সেই বাক্যটি স্মরণ করি। বিধাতা যখন তাঁর একটি নূতন ধর্ম্মবিধান জগতে প্রকাশ করেন, তখন সহস্র বৎসরে যাহা পালনীয় এমন একটি নূতন বাণী, এবং সহস্র বৎসরে যাহা করণীয় এমন কিছু নূতন কাজ, তাঁর মানবসন্তানকে দান করেন। বিধাতা রামমোহনের মধ্য দিয়ে ভারতে যে নূতন বাণী প্রচার ক'রেছেন, আমরা একশত বৎসরের ইতিহাস আলোচনা ক'রে বেশ দেখ্‌তে পাচ্ছি যে সে বাণী সম্যক্‌রূপে বুঝ্‌তে, ও সে-বাণী হ'তে উত্থিত সমুদয় কর্ম্ম সম্যক্‌রূপে সম্পন্ন করতে, আমাদের শত শত বৎসর লাগ্‌বে। রামমোহনের স্বপ্ন ছিল যে ভারত একদিন কুসংস্কারমুক্ত ও জ্ঞানে সমুজ্জ্বল হ'য়ে একটি উন্নতিশীল একতায় বলিষ্ঠ ও স্বাধীন দেশরূপে জগতের সম্মুখে উন্নত শিরে দণ্ডায়মান হবে; এবং তিনি নিজ অন্তরালোকে বুঝেছিলেন যে বিমল ব্রহ্মোপাসনামূলক ধর্ম্মই ভারতের এই-ভবিষ্যৎকে গ'ড়ে তোল্‌বার একটি প্রধান উপাদান। তাঁর মধ্য দিয়ে বিধাতা যে বাণী ভারতে প্রচার ক'রেছিলেন, তার অনুসরণ করতে গিয়ে এই এক শত বৎসরে ব্রাহ্মসমাজকে কত নূতন প্রশ্নের ও কত নূতন বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হ'তে হ'য়েছে; আবার, বিধাতার কত আশ্চর্য্য করুণা এই এক শত বৎসরে ব্রাহ্মসমাজে প্রকাশিত হয়েছে! শতাব্দীর সংযোগস্থলে দণ্ডায়মান হ'য়ে আমরা একবার অতীত ও ভবিষ্যৎ উভয় দিকে দৃষ্টিপাত করি।

অতীত ও ভবিষ্যৎ, উভয় হইতে অনুপ্রাণন লাভ।

প্রাণবান্ মানুষের ও প্রাণবান্ সমাজের একটি লক্ষণ এই যে, অতীত ও ভবিষ্যৎ উভয়ই তাকে অনুপ্রাণিত করে। এক একটি কর্ত্তব্য সমাপন ক'রে, এক একটি প্রশ্ন সমাধান ক'রে, তার আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা উচ্ছলিত হ'য়ে ওঠে; আবার নব নব কর্ত্তব্য ও নব নব প্রশ্নকে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখেও তার উৎসাহ প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে। প্রাণবান্ মানুষের মুখে শুধু এই দুই রকম বুলি শোনা যায়,—প্রথম, "ধন্য দয়াল যে আমাদের দ্বারা তোমার এই কাজটি সম্পন্ন হ'ল!" আর দ্বিতীয়, "ধন্য দয়াল যে আমাদের তুমি এই নূতন কর্ত্তব্যে, এই নূতন সংগ্রামে নিযুক্ত করছ।" অতীতের ব্রহ্ম-কৃপার জন্য উচ্ছলিত কৃতজ্ঞতা, আর ভবিষ্যতের কাজে ঝাঁপ দিয়ে পড়্‌বার জন্য উচ্ছলিত উৎসাহ, প্রাণবান্ মানুষের মুখে এই দুই ছাড়া তৃতীয় কোন কথা নাই। যার প্রাণ নাই, তারই সম্মুখে কোনও কাজ নাই। তারই মুখে নিরাশা, নিরানন্দ, নিরুদ্যম ভাব। ব্রাহ্মসমাজকে ভগবান্ প্রাণ দিয়েছেন, তাই তাকে ব'সে জিরুবার সময় তিনি কখনও দেন নি। তিনি ব্রাহ্মসমাজকে আহ্বানের পর আহ্বান দিয়ে নিত্য জাগিয়ে রাখ্‌ছেন। সে আহ্বান যারা শুনে চলে, তাদের মধ্যে কেবল ঐ দুই প্রকার ভাব,—হয় উচ্ছলিত কৃতজ্ঞতা, নয় নবোৎসাহে নব কর্ত্তব্যে ঝম্প-প্রদান। যারা আহ্বান চায় না, যারা ব'সে থাক্‌তে চায়, প্রভু জিরুবার সময় না দিতেই যারা বিশ্রাম করতে বসে, এমন মানুষেরাই হ'য়ে ওঠে হতাশ, নিরুদ্যম, নিরাশা-বিলাসী মানুষ।

আমি 'নিরাশা-বিলাসী' এই নূতন শব্দটি এখানে ইচ্ছাপূর্ব্বকই ব্যবহার করছি। সংসারে দুই শ্রেণীর মানুষ নিজেরা নিরাশ নিরুদ্যম হয়, এবং চারিদিকে সেই ভাব ছড়াতে থাকে। প্রথম, যারা কিছু করবে না, যারা আরামের উর্দ্ধে উঠবে না, যারা বিষয়-বালিশে মাথা দিয়েই প'ড়ে থাকবে ব'লে স্থির ক'রেছে। এমন মানুষেরা নিরাশার সমাচার বিনা আর কি-ই বা বলবে? দ্বিতীয়, যাদের প্রকৃতিতে কর্ম্ম-প্রবণতা অপেক্ষা চিন্তা-প্রবণতা অধিক প্রবল; যারা বিধাতার আহ্বানে কর্ম্মে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে পারে না, কিন্তু মনে করে, ঘরে ব'সে ব'সে চিন্তার সাহায্যেই জগতের গতি, কালের গতি, ঘটনার গতি, সব বুঝে নেবে।

কিন্তু যে-মানুষ বিধাতার প্রদর্শিত কর্ম্ম-সাগরে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, সে কখনও নিরাশার কথা বলে না। তার মুখে শুধু ঐ দুই বুলি,—হয় উচ্ছলিত কৃতজ্ঞতা, নয় নবোৎসাহে নব সংগ্রামে ঝম্প-প্রদান। সুদূর ভবিষ্যতে, এমন কি দশ বৎসর পরে, ব্রাহ্মসমাজের কি অবস্থা হবে, অথবা ভারতের কি অবস্থা হবে, তা ভাববার জন্য সে অপেক্ষা করে না। "এই মুহূর্ত্তে ভগবান্ কি আদেশ করছেন," কেবল তাই-ই তার একমাত্র ভাবনা। ভগবান্‌কে অসংখ্য ধন্যবাদ যে ব্রাহ্মসমাজ প্রধানতঃ ঈশ্বরের আদেশ পালন করবার মানুষেরই একটি দল; ঘটনার গতি দেখে ভবিষ্যৎ নির্ণয় করবার বিজ্ঞের একটি দল ইহা নয়। ভাই বোন্, বল তো, ব'সে ব'সে ভবিষ্যৎ ভাবার চেয়ে, ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করা কি অনেক বড় অধিকার নয়? সেই পরমস্রষ্টার সঙ্গে মিলে তাঁর সহ-স্রষ্টা হওয়া,—ইহা কত বড় গৌরব! বিধাতা ধন্য যে ব্রাহ্মসমাজ বিগত শতাব্দীতে তাঁর সহকারী হ'য়ে সহ-স্রষ্টা হ'য়ে দেশের নব যুগের জীবন গ'ড়ে দিবার পক্ষে কিছু পরিমাণে সাহায্য ক'রেছে।

বিগত শতাব্দীতে দেশের নবযুগসৃষ্টির এই উজ্জ্বল ইতিহাস আমরা একবার আলোচনা করি। রামমোহনের পূর্ব্বে কয় জন লোকে বিশ্বাস করত যে নিরাকার একমাত্র পরমেশ্বরের আন্তরিক পূজা সম্ভব? সে অসম্ভব সম্ভব হ'ল। শুধু তাই নয়। যাকে লোকে ব'লেছিল অসম্ভব, তার দ্বারা কত ব্যক্তিগত জীবন আমূল পরিবর্ত্তিত হ'ল, সমগ্র জন-সমাজ আলোড়িত উৎক্ষিপ্ত হ'ল, স্তূপীকৃত কত অকল্যাণ অপসারিত হ'ল। যাকে লোকে ব'লেছিল অসম্ভব, সেই নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা দ্বারা, কত উৎসবে সহস্র মানুষে পূর্ণ এক একটি ব্রহ্মমন্দির, সাগরমন্থনের ন্যায় উদ্বেলিত হ'ল। যাকে লোকে ব'লেছিল অসম্ভব, তারই শক্তির প্রকাশ দেখে লোকে এখন তাকে বলচে অলৌকিক। তার পর, রামমোহনের পূর্ব্বে উচ্চ ও নীচ সকল বর্ণের এবং পুরুষ ও নারীর সমান অধিকারের কথা স্বপ্নেও কি কারও মনে আসত? আজ এই অভাবনীয় আদর্শ ভারতে স্বীকৃত হচ্চে। এক শতাব্দী পূর্ব্বে এদেশের লোক বাল্যবিবাহ ভিন্ন অন্য বিবাহের কথা ভাবতেই পারত না; এখন বাল্যবিবাহের মূলে কুঠারাঘাত করবার আইন বিধিবদ্ধ হ'য়ে গিয়েছে। নারীর বিদ্যাশিক্ষা ও নারীর অবাধ স্বচ্ছন্দ গতিবিধিকে মানুষ ঘোর পাপের হেতু ব'লে মনে করত; এখন তার পথটি প্রায় সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসী ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষেরা পূর্ব্বে আপনাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ দেশের অধিবাসী ব'লে মনে ক'রত; এখন সে প্রাদেশিকতা আর নাই; এখন তারা এক হ'য়ে দেশের প্রশ্ন ভাবে; এখন ভারত এক দেশ।—একশত বৎসরে এ কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! এ কি নব সৃষ্টি! সেই পরমস্রষ্টার সেই পরম বিধাতার এ কি লীলা! এ সকল কার্য্যে ব্রাহ্মসমাজের মানুষেরাও যে দেহমনপ্রাণ দিয়ে ঝাঁপিয়ে প'ড়েছিলেন, বিধাতার এই গৌরবময় কার্য্যে তাঁরাও যে ব্যবহৃত হ'য়েছিলেন, তার জন্য বলি, ধন্য বিধাতা, তুমি ধন্য!

এক শতাব্দী পরে এখন ভারতে প্রত্যেক কল্যাণকর্ম্ম, প্রত্যেক প্রচেষ্টা, কত বৃহত্তর আকার ধারণ ক'রেছে! যাহাতে এই বৃহত্তর উদ্যোগসকল সত্য সাধুতা ও শুদ্ধতার ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত থাকে, যাহাতে ইহাদের মধ্যে অসত্য অসাধুতা অপবিত্রতা অথবা হীনচিত্ততা ও লঘুতা প্রবেশ করতে না পারে, আগামী যুগে তার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করতে হবে। ভারতে এখন স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাটি কত প্রবল, স্বাধীনতার আদর্শটি কত উজ্জ্বল! যাহাতে এই স্বাধীনতার সমুদয় প্রচেষ্টা সংযম শান্তি ও বিশ্বমৈত্রীর ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে, যাহাতে তাহার মধ্যে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল ভাব রাজত্ব করতে না পায়, আগামী যুগে সে জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে। এই সকল কার্য্যের জন্য বিধাতা তাঁহার মঙ্গলবিধানে ভারতের এমন একজন মহাপ্রাণ সন্তানকে ভারতক্ষেত্রে দণ্ডায়মান ক'রেছেন, যাঁর স্মরণমাত্র সকলের চিত্ত উন্নত ও পবিত্র ভাবে পূর্ণ হ'য়ে ওঠে। আজ তাঁর জন্যও আমরা বলি, বিধাতা, তুমি ধন্য!

নূতন যুগ এলেই, নূতন অবস্থা এলেই, দেশের মানুষের ভাব ও চিন্তায় নূতন একটি ধারা প্রবর্ত্তিত হ'লেই, যেন বিধাতার আহ্বান আসতে থাকে, "প্রাণবান্ কে কে আছ, জাগো, প্রস্তুত হও, সাড়া দাও!" বিধাতার ডাকটি যতক্ষণ শোনা যায়, ততক্ষণ ভয় নাই। ততক্ষণ কেবলই আনন্দ, কেবলই আশা। বিধাতা ডেকেছেন ব'লেই তো আনন্দ! নূতন কর্ত্তব্য এসেছে ব'লেই তো আনন্দ! সে কর্ত্তব্য সহজ কি কঠিন, তা ভাবা আমাদের কাজ নয়। নূতন কর্ত্তব্য লাভে প্রত্যেক বিশ্বাসী ভৃত্যের মনে আনন্দ হয়। আমাদের তাই হওয়া উচিত। জগতে মহামনা মানুষের আত্মোৎসর্গের বেগেই কঠিন কর্ত্তব্য-সকল সহজ হ'য়ে ওঠে। তার পক্ষপাতী হ'য়ে অনেক মানুষ দাঁড়ায় ব'লে তা সহজ হয় না, অথবা অনেক ধনীরা তার জন্য অর্থকোষ উন্মুক্ত করেন ব'লে তা সহজ হয় না; মানুষের আত্মোৎসর্গের বেগেই তা সহজ হ'য়ে ওঠে। তেমনি, জগতে মহাপ্রাণ মানুষের আত্মোৎসর্গের আলোকেই সমুদয় কঠিন প্রশ্ন সহজ হ'য়ে ওঠে। বহু গবেষণার ফলে তা সহজ হয় না।

ব্রাহ্মসমাজের নব শতাব্দী ও জাতিভেদ।

যে-প্রশ্ন নিয়ে এবং তৎসংসৃষ্ট কর্ত্তব্য নিয়ে দেশের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শ ও সংঘাত আজ পর্য্যন্ত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক

পরিমাণে হ'য়েছে, তা হ'ল জাতিভেদ। এই প্রশ্ন, এই কর্ত্তব্য, বিগত একশত বৎসরের মধ্যে বার বার কত নূতন আকার ধারণ ক'রেছে! রাজা রামমোহনের মনে এই প্রশ্ন উদিত হ'য়েছিল। তিনি একখানি শাস্ত্রগ্রন্থের সাহায্যে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে জাতিভেদ অবশ্যপালনীয় নহে। তাঁর পরে দেবেন্দ্রনাথ চিন্তা ও আলোচনা ক'রে অনুভব করলেন যে, জাতিভেদ এ দেশের উন্নতির পরম শত্রু। কিন্তু তিনি ইহার বিনাশের চেষ্টা করতে গিয়ে অনেক বাধা প্রাপ্ত হ'লেন। তাই তিনি জাতিভেদ নিরসনকে ভবিষ্যৎ কালের হস্তে সমর্পণ করলেন, ব্রাহ্মসমাজের সঙ্কল্পিত কার্য্যের মধ্যে ইহাকে গ্রহণ করলেন না। তার পরে দেখতে পাই, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসরণের আবেগে এ বিষয়ে কোন বাধাকে বাধা ব'লে মানলেন না। তিনি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিবেককে এ বিষয়ে জাগরিত ক'রে তুললেন। বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায় আলোড়িত হ'য়ে উঠল। বিধাতার আহ্বান দেশে ধ্বনিত হ'ল, "আহারে বিবাহে জাতিভেদ ভাঙ্গতে কে কে প্রস্তুত আছ, অগ্রসর হও!" ক্রমে শিক্ষিত সম্প্রদায় দুই ভাগে বিভক্ত হ'য়ে গেল। যাঁরা বিবেকের আদেশ মানতে প্রস্তুত হ'লেন না, তাঁদের মধ্যে অনেকে প্রাচীনদেরই যুক্তি অবলম্বন ক'রে জাতিভেদ প্রথার সমর্থন করতে লাগলেন। যাঁরা সরলচিত্ত, তাঁরা বিবেকবাণীর অনুসরণ ক'রে ব্রাহ্মসমাজে এসে পড়লেন। ব্রাহ্মসমাজ ঘোষণা ক'রলেন, "নরনারী সাধারণের সমান অধিকার, যার আছে ভক্তি পাবে মুক্তি, নাহি জাত-বিচার।" ব্রাহ্মসমাজের সেই প্রসারিত দ্বারপথে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বহু জাতির মানুষ ব্রাহ্মসমাজে এলেন, পরস্পরের মধ্যে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হ'লেন। এইরূপে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিভেদের উপরে একটি সবল আঘাত পড়ল।

কিন্তু এখন আর এক যুগ এসেছে। এখন শুধু শিক্ষিত সম্প্রদায়ে নয়, নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যেও আলোড়ন উপস্থিত। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ব্রাহ্মসমাজের দরোজাটি খুব বিস্তৃত ক'রে খুলে দিয়ে, সেই মুক্তদ্বারে দাঁড়িয়ে দেশের নিম্নশ্রেণীর মানুষকে আহ্বান করলে চলবে না। "এখানে নরনারী সাধারণের সমান অধিকার, যার আছে ভক্তি, পাবে মুক্তি, নাহি জাত-বিচার, তোমরা এস, এস," এই কথা ব'লে সাদরে সাগ্রহে আহ্বান করলেও চলবে না। নিজের দরোজায় দাঁড়িয়ে তাদের আহ্বান করা নয়, তাদের কাছে যাওয়াই এখন প্রয়োজন। জাতিভেদ বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তব্য এতদিন ছিল, ইহার দূষণীয়তা প্রমাণ করা ও প্রচার করা, এবং দেশবাসীকে ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার মুক্ত দ্বারে প্রবেশ করতে আহ্বান করা। এখন দেখতে পাচ্ছি, নিম্নশ্রেণীর মানুষ সম্বন্ধে আমাদের সম্মুখে নূতন প্রকারের কর্ত্তব্য উপস্থিত। তাহা, ঐ শ্রেণীর মানুষদের কাছে গিয়ে, তাদের মধ্যে বাস ক'রে, তাদেরই সেবার জন্য জীবন উৎসর্গ করা; কাছে গিয়ে, তাদের হাত ধ'রে তোলবার চেষ্টা করা।

জাতিভেদ উন্মূলন ও ভারতের একীকরণ, রামমোহনের স্বপ্নের একটি বড় অংশ। এটি বিধাতা কর্ত্তৃক ব্রাহ্মসমাজের হাতে ন্যস্ত ভারের মধ্যে একটি বড় ভার। কিন্তু ব্রাহ্মগণ, ভাল ক'রে বুঝে লও যে, এক শতাব্দীর পরে এই কাজটির রূপ পরিবর্ত্তন হ'য়ে গিয়েছে। এটি প্রধান ভাবে এখন আর প্রমাণ করবার কাজ রূপে বর্ত্তমান নাই; বই লেখার ও বক্তৃতা করবার কাজ রূপে বর্ত্তমান নাই। জীবন উৎসর্গ ক'রে নিপীড়িত নিগৃহীত ভাইবোনদের মধ্যে গিয়ে প'ড়ে থাকবার কাজ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। ব্রাহ্মসমাজ! তুমি কি প্রস্তুত হ'য়েছ এ কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে? এ কাজে ঝাঁপিয়ে না পড়লেই চলবে না। নব যুগের ইহাই নব আহ্বান। ব্রাহ্মসমাজ, তুমি জাগতে চাও? বাঁচতে চাও? আশাশীল, আনন্দে উৎফুল্ল, প্রভুর নিকট হ'তে নূতন ভার প্রাপ্ত, নূতন আদেশ লাভের আনন্দে উদ্দীপ্ত, একটি মানুষের দল হ'য়ে নব যুগে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াতে চাও? তবে এ কাজে আপনার প্রধান শক্তি নিয়োগ করবার জন্য প্রস্তুত হও। ব্রাহ্মসমাজে কর্ম্মী আসচে না কেন? ইহার দশ রকমের কারণের মধ্যে বড় একটি কারণ এই যে, এ সময়ে ঠিক কোন্ কাজটি করতে হবে, কোন্ কাজটি দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় উপযোগী ও প্রয়োজনীয়, তা আমরা মানুষকে বোঝাতে পারচি না। এই কাজের জন্য মানুষকে ডাক, ভগবানের কাছে মানুষ ভিক্ষা কর। যারা আপনাদের মুছে ফেলতে জানে, যারা কষ্ট স্বীকার করতে জানে, যাদের প্রকৃতি প্রেমিক ও সহিষ্ণু, যারা দীন দরিদ্রদের সঙ্গে বসতে মিশতে খেতে শুতে প্রস্তুত, খ্রীষ্টীয় প্রচারকগণের মত' যারা আরাম সভ্যতা ও স্বীয় উন্নত সমাজের মার্জ্জিত সামাজিক সুখ,—সব বলিদান ক'রে প্রভুর কাজে অগ্রসর হ'তে উৎসুক,—এমন মানুষের জন্য প্রার্থনা কর। আমি অনুভব করি, আগামী যুগে এই কাজে ব্রাহ্মসমাজকে ভগবান্ ডাকচেন। একবার ব্রাহ্মসমাজ সাড়া দিক্! ব্রাহ্মসমাজের জীবন তেজস্বী হ'য়ে উঠবে; ব্রাহ্মসমাজের মানুষের মন আশাশীল ও আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠবে। নূতন আহ্বান ও নূতন কর্ত্তব্য যেমন সজীব মানুষকে আশাশীল ক'রে তোলে, এমন আর কিছুতে করতে পারে না।

এই কাজে আজ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজ যেটুকু অগ্রসর হয়েছেন, তার অভিজ্ঞতা কিরূপ? অতিশয় আশাপ্রদ। নিম্ন শ্রেণীর সেবার কাজ এ পর্য্যন্ত যা কিছু করা হ'য়েছে, তার কথা ভাবলে আমাদের মন আশায় পূর্ণ হ'য়ে ওঠে। আজ সে কথা না বললে আমাদের অপরাধ হবে, ভগবানের করুণা অস্বীকার করা হবে। ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মিগণ এখন আসাম, বঙ্গদেশ, ছোটনাগপুর, অন্ধ্রপ্রদেশ, মান্দ্রাজ, বোম্বাই ও ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য, এই সকল স্থানে নিম্ন শ্রেণীর ও আদিম অধিবাসীদের মধ্যে কাজ করচেন। আজ বেদী হ'তে তার সবগুলির বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। আমি কেবল দয়ালের দয়ার সাক্ষ্য দিবার জন্য দুটির উল্লেখ করব। আপনারা কেহ কেহ হয়তো জানেন, ২৩ বৎসর পূর্ব্বে "বঙ্গ ও আসাম অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতিবিধায়িনী সমিতির" জন্ম হয়। আপনারা হয়তো এই সমিতির রিপোর্টে প'ড়ে থাকবেন যে এই সমিতির হাতে এখন প্রায় ৪৫০ গ্রাম্য বিদ্যালয় রয়েছে; তাতে ১৭

হাজারের অধিক ছেলে মেয়ে পাঠ করে। সেই স্কুল গুলিতে বৎসরে ব্যয় হয় প্রায় ৯০ হাজার টাকা। এই সমিতির প্রাইমারী স্কুল গুলি এই ২৩ বৎসরে দেশের প্রায় ৭৫ হাজার নিরক্ষর মানুষকে নিরক্ষরতা-মুক্ত ক'রে দিয়েছে; কিছু কিছু লেখা-পড়া শিখিয়ে দিয়েছে। এই সমিতির একটি স্থায়ী ফণ্ড কর্‌বার চেষ্টা করা হচ্চে; তাতে এ পর্য্যন্ত ৩৫ হাজার টাকা জমেছে।—সংক্ষেপে আমি এই সমিতির রিপোর্টের অন্তর্গত কয়েকটি সংখ্যা মাত্র আপনাদের সম্মুখে ধর্‌লাম। এই সংখ্যাগুলির জন্যও তো আজ বল্‌তে ইচ্ছা হয়, ধন্য দয়াল, তোমার করুণা ধন্য! ভগবান্ ব্রাহ্মসমাজের হাত দিয়ে তাঁর সন্তানদের শিক্ষাদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত এই সমিতিকে যে সফলতা দান ক'রেছেন, তার জন্যও মন আশায় ও কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হয়।

কিন্তু এর ভিতরে আশার ও কৃতজ্ঞতার আরও গভীরতর কারণ র'য়েছে। ঐ কয়েক হাজার টাকা, ঐ কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী, এ সকল সংখ্যার উপর আমাদের নির্ভর নয়। এ সকল আমাদের মূলধন নয়। আমাদের মূলধন কি? ২৩ বৎসর পূর্ব্বে একদিন ভগবানের নামে জীবন উৎসর্গ ক'রে, ব্রাহ্মসমাজের দু'একজন মানুষ এই কাজটিতে ঝাঁপিয়ে প'ড়েছিলেন। তাঁরা নমঃশূদ্রদের গ্রামে গ্রামে গিয়ে তাঁদের মধ্যে বাস ক'রেছিলেন। তাঁদের কোন সম্বল ছিল না; অর্থ ছিল না, প্রতিপত্তি ছিল না, বাগ্মিতা ছিল না, বিদ্যা ছিল না। সম্বল ছিল কেবল বিশ্বাস আত্মোৎসর্গ ও প্রেম। তাই ছিল আমাদের মূলধন। সেই মূলধন সেই পরম মহাজনের হাতে, ভগবানের হাতে গচ্ছিত রাখা হ'য়েছিল। সেই মূলধনের ছোট সুদ ব'লে ভগবান্ আমাদের দিয়েছেন ঐ অত হাজার টাকা, ঐ অতগুলি বিদ্যালয়, ঐ অত হাজার শিক্ষার্থী। কিন্তু সেই মূলধনের বড় সুদ তিনি যা দিয়েছেন, তা এ সকলের চেয়ে আরও অনেক বড়। সেই বড় সুদ হ'ল, গ্রামের মানুষগুলির ভালবাসা, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও আগ্রহ। তারা যে আমাদের কর্ম্মীদের আপনার লোক ব'লে দেখে, তাদের পরিবারের বন্ধু, গ্রামের বন্ধু, সমাজের বন্ধু ব'লে দেখে; তারা যে এখন উন্নততর জীবনের স্বাদ বুঝেছে; এখন তারা নিজেরাই যে নিজ নিজ গ্রামকে উন্নত কর্‌বার জন্য ব্যস্ত; এক এক খানা গ্রামের দেখাদেখি দশ খানা গ্রাম যে ঐ ভাবে নিজেদের সংস্কার কর্‌তে অগ্রসর হচ্চে; তারা যে আমাদের কাছে আরও কর্ম্মী চেয়ে পাঠাচ্চে; তারা অনেকেই যে এখন ব্রাহ্ম-সমাজের সঙ্গে একীভূত হবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল,—আমাদের সামান্য মূলধনের এই বড় সুদ ভগবান্ দিয়েছেন। আমরা ভীরুর মতন অবিশ্বাসীর মতন ভাব্‌ছিলাম যে দেশের এত সহস্র গ্রামে কে সেবা কর্‌তে যাবে? কে বার্ত্তা নিয়ে যাবে? আমাদের লোক কই? এখন দেখ্‌চি, বার্ত্তাবহ স্বয়ং ভগবান্। এখন দেখ্‌চি, তিনি যেমন জড়জগতে বায়ুকে প্রবাহিত ক'রে দাবানলকে বিস্তার করেন, তেম্‌নি তিনি গ্রামের মানুষদের মনে ব্যাপক আকারে আগ্রহকে জাগরিত ক'রে আমাদের ক্ষুদ্র চেষ্টার অগ্নিস্ফুলিঙ্গটিকে বৃহৎ অগ্নিতে পরিণত ক'রে দিচ্চেন। ২৩ বৎসর ধ'রে অশেষ বাধা বিঘ্নের মধ্যে আমাদের এই কাজটি ধীরে ধীরে গ'ড়ে উঠ্‌চে। তার ভিতরে, গ্রামের মানুষদের আগ্রহের এই যে ব্যাপক অগ্নি, ভগবানের এই যে দয়া,—ইহা কয়েক বৎসর হ'তে আমরা লাভ কর্‌চি। ইহা আমাদের কাছে আশাতীত অভাবনীয় ভগবৎপ্রসাদ। এটিই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা গভীর কৃতজ্ঞতার ও আশার কারণ।

এ কাজে এমন সার্থকতা লাভ হয়, এ কাজে পরমেশ্বরের মহিমার জয় এমন দিনে দিনে, দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে, দেখ্‌তে পাওয়া যায়, এ কাজে ব্যয়িত শক্তির প্রত্যেকটি কণিকা এমন ফলপ্রসূ, যে, আমার প্রার্থনা কর্‌তে ইচ্ছা হয়, ভগবান্, আমাকে আবার যৌবন দাও, আমি তোমার এ কাজে ভাল ক'রে মাতি।

এই শ্রেণীর আর একটি কাজের কথা, ও তৎসম্পর্কে আমার একদিনের চিন্তা আমি আপনাদের কাছে নিবেদন করি। গঞ্জামের অন্তর্গত বরহমপুর নগরে ব্রাহ্মসমাজের একজন কর্ম্মী সেখানকার মেথরদের মধ্যে এইরূপ কাজ কর্‌চেন। সেই মেথরদের দুটি সভাতে গিয়ে তাদের কাছে আমাকে কিছু বল্‌তে হ'য়েছিল। নিজেদের রীতি নীতি রুচি অভ্যাস ও চরিত্র উন্নত কর্‌বার জন্য তাদের মধ্যে এমন একটি ব্যগ্রতা জেগেছে যে তা দেখে আমার মন অনুপ্রাণিত হ'য়ে উঠ্‌ল। তাদের দলপতিদের সঙ্গে কথা বল্‌বার সময় দেখ্‌লাম, অন্তরের ব্যগ্রতাতে ও স্বজাতির কল্যাণের জন্য দায়িত্ববোধে তাদের মুখগুলি প্রদীপ্ত। তাদের সঙ্গে কথা বল্‌তে বল্‌তে আমার মন ঘোর বেগে আলোড়িত ও কম্পিত হ'তে লাগ্‌ল। এই চিন্তা প্রবল ভাবে আমার মনকে অধিকার কর্‌ল, যে, ব্রাহ্মসমাজ এদের জন্য কেন নিজ শক্তি আরও অধিক ব্যয় কর্‌চেন না? নিজ মনোযোগটা এদের প্রতি কেন এখনও ভাল ক'রে নিযুক্ত কর্‌চেন না?

সেই মেথরদের সভার চারিদিকে ছিল অবর্ণনীয় ময়লা ছড়ানো। তার মধ্যে কুরূপ, কৃষ্ণকায়, কিন্তু মনের ব্যাকুলতায় প্রদীপ্ত-আনন এই মানুষগুলিকে দেখে আমার মনে তৎক্ষণাৎ একটি তুলনার উদয় হ'ল। একটি লোহার বা ইস্পাতের কারখানায় গেলে তার এক অংশে দেখা যায়, অগ্নিকুণ্ডে লোহাকে গলিয়ে ছাঁচে ঢালা হচ্চে, অথবা পুড়িয়ে লাল ক'রে গুরুভার কলের হাতুড়ির (sledge-hammerএর) ঘা দিয়ে কিংবা গুরুভার কলের বেলনের (rollerএর) চাপ দিয়ে তাকে অভিপ্রেত আকার দান করা (mould করা) হচ্চে। আবার অন্য অংশে ঠাণ্ডা লোহাকে মেজে ঘ'ষে চক্‌চকে করা হচ্চে। যে স্থানটিতে অগ্নিকুণ্ড, যেখানে লোহাকে পোড়ানো ও চাপে ফেলা হয়, সে স্থানটি বড় ময়লা; কিন্তু যেখানে ঠাণ্ডা লোহাকে মাজা ঘষা হয়, সে ঘরটি পরিষ্কার।—সেই মেথরদের সভায় দাঁড়িয়ে আমার কেবলই মনে হ'তে লাগ্‌ল, এই তো ময়লার ভিতরে মানুষ গলাবার অগ্নিকুণ্ড! এই তো মানুষগুলি তপ্ত লৌহপিণ্ড (white-hot iron) হ'য়ে র'য়েছে! এই মানুষ-গুলির ব্যাকুলতায় প্রদীপ্ত ও নমনীয় প্রাণই তো ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মক্ষেত্র। এদের জন্য আমরা যেটুকু শক্তি ব্যয় কর্‌ব, তা সার্থক হবে। অসরলতার অহিফেনে যারা বিবেককে নিদ্রিত ক'রে ফেলেছে, সহরবাসী এমন সকল শিক্ষিত লোকের জন্য

কত শক্তি আমরা অপচয় করুচি! ঠাণ্ডা লোহাতে ঘা মেরে মেরে কেন আমরা আমাদের শক্তি বৃথা ক্ষয় করুচি? এই নিরক্ষর লোকগুলির মনের অবস্থাই বা কি, আর ঐ শ্রেণীর শিক্ষিতদের মনের অবস্থাই বা কি? এরা বল্‌চে, "আমরা যা ভাল ব'লে জেনেছি, তা করুব, তা হ'ব; তার জন্ম প্রাণপণ চেষ্টা করুব।" আর ঐ শ্রেণীর শিক্ষিত বা শিক্ষিতম্মন্যদের মনের অবস্থা কি? "আমরা জানুব অনেক, কিন্তু করুব না কিছু, হব না কিছু।" ব্রাহ্মসমাজের কাজের প্রধান উপাদান যে দয়ালের নামের আগুন, তা এই উভয় প্রকার মনোভাবের মধ্যে কোন্‌টির উপরে কাজ করে? ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব কোন্ প্রকার মনে শীঘ্র সংক্রান্ত হয়? শিক্ষিতদের মনের ঠাণ্ডা লোহাকে বিদ্যা দিয়ে জ্ঞান দিয়ে পাণ্ডিত্য দিয়ে মাজ্‌বার ঘস্‌বার জন্ম তো বিশ্ববিদ্যালয় র'য়েছে। ব্রাহ্মসমাজও কি সেই কাজই করুবে? ব্রাহ্মসমাজকে জিজ্ঞাসা করি, হে ব্রাহ্মসমাজ, তুমি কি অগ্নিসমান ব্যাকুল মানুষকে ঈশ্বরের ইচ্ছার চাপে ফেলে গ'ড়ে দিবার জন্ম ভগবানের একটি চাপযন্ত্র? একটি sledge-hammer? না, তুমি ঠাণ্ডা লোহাকে মেজে ঘ'ষে চক্‌চকে করুবার জন্ম একটি শাণযন্ত্র? ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত কাজ যে কোন্‌টি, আজ ১১ই মাঘে তা একবার ভাল ক'রে ভাব', ব্রাহ্মগণ!

আমি বলি, নিম্নশ্রেণীর মানুষদের সেবার জন্ম ব্রাহ্মসমাজের নিশ্চয়ই নামা উচিত; এবং এ কাজে নামুবার যোগ্যতা ব্রাহ্মসমাজেরই আছে! যারা সরল মনে ও সরল প্রেমে মানুষ-ভাই ব'লেই মানুষের সব অধিকার স্বীকার করুচে না, যারা ধাক্কা খেয়ে খেয়ে দশ বার নব নব সন্ধিপত্র লিখ্‌চে, এবং এক এক বারে এক এক চিম্‌টি পরিমাণ বেশী অধিকার ছেড়ে দিতে স্বীকৃত হ'চ্ছে, তারা যে এ কাজে নামুবার যোগ্য নয়,—এবং অপর দিকে বিধাতার প্রেমবার্তা যার ধ্বজায় অঙ্কিত সেই ব্রাহ্মসমাজই যে এ কাজে নামুবার যোগ্য, ইহাতে কি সন্দেহ কর, ব্রাহ্ম? হে ব্রাহ্ম, ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে বিশ্বাসী হও, সাহসী হও, উদ্যোগী হও! যাহা একাধারে তোমার অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য, ও তোমার পবিত্র অধিকার, তার প্রতি আগামী যুগে মনোযোগী হও!

আমাদের প্রত্যেকের উপরে ব্রাহ্মসমাজের দাবী।

যে-ব্রাহ্মধর্ম্মের নিত্য ও শাশ্বত ভাবটি, অর্থাৎ ভারতের নরনারীর ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষার উপরে প্রভাবটি এমন উজ্জ্বল ও এমন গৌরবময়, যে-ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রেরণায় যুগে যুগে দেশের নব নব সেবার জন্ম উত্থিত উদ্যোগসকল এমন উজ্জ্বল ও এমন গৌরবময়, তার জন্ম এস আজ নূতন ভাবে আত্মনিয়োগ করি। এস, আমরা প্রতি জন বলি, "আমার জীবন, আমার গৃহপরিবার, আমার সব আচরণ এই ব্রাহ্মধর্ম্মের গৌরবের জন্ম উৎসর্গ করুব।" এস প্রতি জন বলি, "ব্রাহ্মধর্ম্মের গৌরবের জন্ম, ব্রাহ্মসমাজের সেবাশক্তিকে বর্দ্ধিত করুবার জন্ম, এক জন মানুষ যা করুতে পারে আমি তা সম্পূর্ণরূপে করুব।"

আমরা প্রত্যেকে আজ অনুভব করি, **আমার** উপরে ঈশ্বরের দাবী আছে, ব্রাহ্মসমাজের দাবী আছে। আমার কাছে শ্রম অর্থ সময় দাবী করবার অধিকার তাঁর আছে। আমি দয়ালের দয়ার ঋণ ও ব্রাহ্মসমাজের পবিত্র আশ্রয়ের ঋণ স্বীকার করুব, ও আমার দ্বারা যা সম্ভব সে সেবাটুকু আমি দান করুব।

প্রত্যেক ভাল বাড়ীতে ছেলে মেয়েরা অনুভব করে যে, বাবা খাটেন ও টাকা উপার্জ্জন করেন **আমার** জন্ম; মা রান্নাঘরে গিয়ে এত পরিশ্রম করেন **আমার** জন্ম; দাদা দিদিরা যে বাড়ীতে খাটেন, তা **আমার** জন্ম। ঠিক আমারই জন্ম কে কোন্‌টুকু করুচেন, তা আলাদা ক'রে দেখ্‌তে না পেলেও, তাদের মনে এই অনুভূতি জেগে থাকে যে, "আমি এ বাড়ীর একজন মানুষ হ'য়ে সকলের পরিশ্রমের ও সেবার ভাগ গ্রহণ করুচি; সকলের প্রেম ও সেবার ঋণে আমি ঋণী হ'য়ে আছি। এই ঋণ শোধ দিবার জন্ম প্রাণপণ করুতে হবে।"

খ্রীষ্টীয় ভাইদের ধর্ম্মসাধনের মধ্যে এই অনুভব সাধন একটি বিশেষ অঙ্গ যে, যীশু **আমারও** জন্ম পৃথিবীতে এসেছিলেন, আমারও জন্ম তিনি অশেষ দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য ক'রেছিলেন, আমারও জন্ম তিনি জীবন উৎসর্গ ক'রেছিলেন। এই অনুভূতির সাধনা বিনা ধর্ম্মমণ্ডলীর ভাবটি মানুষের মনে ভাল ক'রে জাগে না।

আমার যৌবনকালে আমার অন্তরে যে-সকল ভাব ও চিন্তা জাগরিত হ'য়ে অবশেষে আমাকে ব্রাহ্মসমাজের সেবার ক্ষেত্রে এনে ফেল্‌ল, তার মধ্যে একটি এই ছিল যে, শাস্ত্রী মহাশয় যে এত ত্যাগস্বীকার ক'রেছেন, তা **আমারও** কল্যাণের জন্ম; তিনি যে এত খেটে খেটে প্রাণপাত কর্‌চেন, তা **আমারও** জন্ম। আমার মনে যে-সময়ে এই ভাব কাজ করুচিল, তখনও আমি শাস্ত্রীমহাশয়ের সঙ্গে ভাল ক'রে পরিচিত হই নাই। কিন্তু আমার মনে হ'ত, একজন মানুষ খেটে খেটে প্রাণপাত কর্‌বেন, আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা দেখ্‌ব, কিছুই কর্‌ব না, এই যদি আমার মনের অবস্থা হয়, তবে আমাকে ধিক্! এরূপ নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট হ'য়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখাটা আমার কাছে বড়ই হীনতার কাজ, এমন কি নীচতার কাজ ব'লে মনে হ'ত; এবং ব্রাহ্মসমাজের কাজে আমাকে অর্পণ কর্‌তে যতদিন বিলম্ব হ'য়েছিল, ততদিন সেই হীনতার অনুভূতি আমার পক্ষে অসহ্য বোধ হ'ত, ততদিন আমি দারুণ আত্মগ্লানিতে ও মনের বেদনায় পূর্ণ হ'য়ে ছিলাম।

ব্রাহ্মসমাজ যদি সত্য সত্যই একটি মণ্ডলী হয়, তবে তার প্রতি ঋণের অনুভূতি তার মানুষগুলির অন্তরে জেগে থাকুবার কথা। রাজা রামমোহন রায় এত শ্রম করুলেন, দেশবাসীর এত অবজ্ঞা লাঞ্ছনা সহ্য করুলেন, শ্রমজীর্ণ দেহ বিদেশে কষ্ট পেয়ে ত্যাগ ক'রে চ'লে গেলেন,—কার জন্ম? তোমার আমার জন্ম। দেবেন্দ্রনাথ কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হ'লেন, কত বিনিদ্র দিবস ও রাত্রি ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণচিন্তায় যাপন ক'রলেন, বিশাল ঠাকুর-পরিবারের বিরুদ্ধে একাকী দণ্ডায়মান হ'য়ে এবং সকল আত্মীয় হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়েও ধর্ম্মকে রক্ষা করুলেন,—কার জন্ম? তোমার আমার জন্ম। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র আযৌবন ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মধ্যান ব্রহ্মানন্দরসপানে এবং ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারে নিযুক্ত থেকে, সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের মস্তকে পদাঘাত

ক'রে, কঠোর শ্রমে আপনাকে নিক্ষেপ ক'রে, অল্প বয়সে দেহত্যাগ করলেন,—কার জন্য? তোমার আমার জন্য। আচার্য্য শিবনাথ ব্রাহ্মসমাজের সেবাযজ্ঞে আপনাকে পূর্ণাহুতি-স্বরূপ দান ক'রে জলন্ত আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত রেখে চ'লে গেলেন,—কার জন্য? তোমার আমার জন্য। সে দিন যে দুই ভাই ঈশ্বরের প্রেমানলে ও সেবানলে আত্মাহুতি দিয়ে পৃথিবী থেকে চ'লে গেলেন,—কার জন্য? তোমার আমার জন্য।

প্রত্যেক ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকা আজ অনুভব করি, ব্রাহ্মসমাজের কাছে ও ব্রাহ্মসমাজের সেবকদের কাছে, তাঁদের প্রেম ও সেবার দরুণ, আমার এতখানি ঋণ রয়েছে যে জীবন তাঁদের কাছে বাঁধা হ'য়ে আছে। এমন বাড়ীর সন্তান আমরা, এত ঋণে ঋণী আমরা,—আমরা কি-ক'রে কি-দিয়ে এই ঋণ শোধ দিতে পারি, তার জন্য প্রত্যেকের মন এবার ব্যাকুল হ'য়ে উঠুক। রাজা রামমোহন রায় এক দিন তাঁর ভ্রাতৃবধূর সহমরণ দেখে সেই চিতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে মনে মনে ব'লে-ছিলেন, "এই প্রথার উচ্ছেদ সাধনের জন্য **একজন মানুষ** যা ক'রতে পারে, তা আমি করব।" আমরা যদি তাঁর প্রকৃত শিষ্য হই, আমরা প্রত্যেকে বলি এস, "আমি দীন হীন তুচ্ছ মানুষ; কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের গৌরববৃদ্ধির জন্য **একজন** মানুষ যা করতে পারে, তা আমি সম্পূর্ণরূপে করব।" ভগবান্ আজ আমাদের প্রত্যেককে ও তাঁর ব্রাহ্মসমাজকে, আশায় আনন্দে ও তাঁর আদেশ গ্রহণের ঔৎসুক্যে পরিপূর্ণ করুন।

প্রার্থনা।

হে বিশ্বপতি, হে রাজরাজেশ্বর, হে আমাদের পিতা মাতা প্রভু ও নেতা, হে ব্রাহ্মসমাজের অধিপতি, আজ আমরা আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হ'য়ে স্মরণ করি, তুমি ব্রাহ্মসমাজের মধ্য দিয়ে আমাদের মত কত দুঃখী পাপীকে তোমার করুণাধারায় শীতল ক'রেছ; কত শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা দিয়েছ; কত পাপদগ্ধ প্রাণকে জুড়িয়ে দিয়েছ। আবার কত ত্যাগী ভক্তকে, কত বীরহৃদয় সেবককে অভ্যুদিত ক'রে তাঁদের জীবনের দ্বারা দেশকে উন্নত ক'রেছ; তাদের দুঃখের ত্যাগের ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জনসমাজের যুগযুগান্তরের সঞ্চিত মলিনতাকে অপসারিত ক'রেছ। হে প্রভু, আজ ব্রাহ্মসমাজের অতীতের উজ্জ্বল ইতিহাস আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করুক। আজ তোমার বীর পুত্র রামমোহনের জলন্ত জীবন আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করুক। ভারতের জন্য ব্রাহ্মসমাজের সম্মুখে উপস্থিত সমুদয় কর্ত্তব্য আমাদিগকে নবজীবন দান করুক। আমরা নবোৎসাহে তোমার কাজে মাতি। আমাদের অবিশ্বাস ও জড়তাকে লজ্জা দাও, প্রভু! তোমার কার্য্যে নূতন নিষ্ঠার সহিত নিযুক্ত ক'রে আমাদের সমুদয় নিরুদ্যম নিরুৎসাহ ভাবকে দূর ক'রে দাও, প্রভু! আমরা তোমার ধর্ম্মসাধনে, তোমার ইচ্ছাপালনে, তোমার প্রিয়কার্য্যে দৃঢ় হই। আমাদের জীবন উজ্জ্বল হউক, তোমার ব্রাহ্মসমাজ উজ্জ্বল হউক, তোমার ধর্ম্মের জয় হউক। আমরা আশা ভক্তি ও কৃতজ্ঞতাভরে তোমার চরণে লুণ্ঠিত হ'য়ে তোমাকে বার বার প্রণাম করি।

ব্রাহ্মসমাজ

কর্ম্মচারী ও অধ্যক্ষসভা—সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের বিগত বার্ষিক সভাতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র সভাপতি, শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার সেন, অপর্ণাচরণ ভট্টাচার্য্য, ও অজিতকুমার দাসগুপ্ত সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন; এবং নিম্নলিখিত ভাবে অধ্যক্ষসভা গঠিত হইয়াছে:—

কলিকাতা—ডাঃ হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়, পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু, ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, ডাঃ ডি এন বসু, রজনীকান্ত গুহ, ডাঃ কালিদাস নাগ, শ্রীমতী কুমুদিনী বসু, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সোম, শশিভূষণ দত্ত, প্রেমাঙ্কুর দে, এস এম বসু, শ্রীমতী বাসন্তী চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত পরেশনাথ সেন, প্রফুল্লকুমার রায়, শ্রীশচন্দ্র রায়, শ্রীমতী সুশীলা বসু, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখার্জ্জি, শিশিরকুমার দত্ত, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, নির্ম্মলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ডাঃ শিশিরকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ সরকার, পি এন দত্ত, সরোজেন্দ্রনাথ রায়, অমল হোম, অনিলকুমার সেন, রমেশচন্দ্র দেব, বিপিনবিহারী বসু, শ্রীমতী বিনোদিনী চৌধুরী, রায় প্রমদারঞ্জন রায় বাহাদুর, শ্রীমতী সান্ত্বনা রায়, সুরমা সেন, শ্রীযুক্ত অনিমেষ দাসগুপ্ত, ডাঃ বিরজাশঙ্কর গুহ।

মফঃস্বল—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বল, মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, ভাই সীতারাম, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত, অমলকুমার সিদ্ধান্ত, শ্রীমতী হেমন্তকুমারী চৌধুরী, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চন্দ, কাজী আবদুল গফুর, শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস, ডি জি বৈদ্য, কুমারী ভক্তিলতা চন্দ, শ্রীযুক্ত হরকুমার গুহ, কে কল্যাণস্বামী, মথুরানাথ গুহ, জয়মঙ্গল রথ, রাও সাহেব এ গোপালম্, জিতেন্দ্রকুমার বিশ্বাস, মনোরঞ্জন ব্যানার্জ্জি, অশ্বিনীকুমার বসু, সতীশচন্দ্র চাটার্জ্জি, নির্ম্মলকুমার সিদ্ধান্ত, হরনন্দ গুপ্ত, লালমোহন চাটার্জ্জি, দীনেশচন্দ্র চৌধুরী, শশিভূষণ মিত্র, মন্মথমোহন দাস, ললিত-কুমার রায়, নির্ম্মলচন্দ্র দে, ডাঃ জি সি দাস, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী।

প্রতিনিধি—শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সেন,—ময়মনসিং, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মিত্র,—ফরিদপুর, রায় শরৎচন্দ্র দাস বাহাদুর,—ধুবড়ী, শ্রীযুক্ত অনাথকৃষ্ণ শীল,—উল্টাডাঙ্গা, শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য,—ঢাকা, শ্রীমতী বিনোদিনী চৌধুরী,—হাজারীবাগ, ডাঃ অনিলচন্দ্র বসু,—মেদিনীপুর, শ্রীযুক্ত যোগানন্দ দাস—বরিশাল।

ট্রাষ্টী—শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ ব্রহ্মমন্দিরের এবং শ্রীযুক্ত পরেশনাথ সেন ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়ের ট্রাষ্টী নিযুক্ত হইয়াছেন।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভা—অধ্যক্ষসভার ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখের বিশেষ অধিবেশনে নিম্নলিখিতরূপে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত হইয়াছে :—

শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু, ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন বসু, শ্রীমতী কুমুদিনী বসু, শ্রীযুক্ত সুধাংশুমোহন বসু, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত প্রেমাঙ্কুর দে, শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ, শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র সোম ও পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রচারকদিগের প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছেন।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ৩০শে জানুয়ারী কলিকাতা নগরীতে বাবু বসন্তকুমার চৌধুরী রক্তচাপাধিক্য রোগে ৬৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি অধ্যক্ষসভার সভ্যরূপে ও অন্যান্য নানা ভাবে ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়া গিয়াছেন।

বিগত ৩০শে জানুয়ারী পরলোকগত কমললোচন দাসের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দাস আচার্য্যের কার্য্য, পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ শাস্ত্রব্যাখ্যা এবং জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান সরোজকুমার ও জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ জীবনী পাঠ ও প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, শিলং ব্রাহ্মসমাজ, গৌহাটী ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজ ও নববিধান ব্রাহ্মসমাজে ১০৲ টাকা করিয়া ৫০৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে।

বিগত ৫ই ফেব্রুয়ারী পরলোকগত গোলোকচন্দ্র দাসের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য, শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রপাঠ, জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান প্রফুল্লকুমার জীবনী পাঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দাস প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে পুত্রগণ সাধনাশ্রমে ৫০৲ ও ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজে ১০৲ টাকা দান করিয়াছেন ; এবং কনিষ্ঠা পুত্রবধূ শ্রীমতী তটিনী দাস স্বোপার্জ্জিত অর্থ হইতে নারী কল্যাণ প্রতিষ্ঠানের পুস্তকালয়ে ২০০৲ টাকার পুস্তক প্রদান করিয়াছেন।

বিগত ৭ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার লাহিড়ীর এক বৎসর বয়সের শিশু কন্যা বসন্ত রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত ৭ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত সত্যসুন্দর দেবের মাতা দীর্ঘকাল রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়া ৬৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি নিষ্ঠাবতী ও ভক্তিমতী নারী ছিলেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চির শান্তিতে রাখুন ও আত্মীয়স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

নাম করণ—গত ১৫ই পৌষ বহরমপুর নগরীতে সত্যশরণ সিংহের তৃতীয় পুত্রের শুভ নামকরণ ও অন্নপ্রাশন সুসম্পন্ন হইয়াছে। পুত্রের নাম সুজিৎকুমার রাখা হইয়াছে। পিতা স্বয়ং আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। এই উপলক্ষে দুঃস্থ ব্রাহ্ম পরিবার ভাণ্ডারে ৫৲ প্রদত্ত হইয়াছে। মঙ্গলময় বিধাতা শিশুকে নিত্য কল্যাণের পথে বর্দ্ধিত করুন।

দান—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রকুমার বিশ্বাস তাঁহার পিতা দ্বিজদাস বিশ্বাসের ৪২ তম বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে শান্তিপুর ব্রাহ্মসমাজে ৫৲, কলিকাতা মাঘোৎসবে ৫৲, বগুড়া ব্রাহ্মসমাজে ৫৲ ও পাবনা ব্রাহ্মসমাজে ২৲ দান করিয়াছেন। এই দান সার্থক হউক ও পরলোকগত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুন।

জলপাইগুড়ি ব্রাহ্মসমাজ—নিম্নলিখিত প্রণালীতে ত্র্যধিকশততম মাঘোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে :—১লা মাঘ সন্ধ্যায় ডাঃ দেবপ্রসাদ দত্তের বাসায় উৎসবের প্রারম্ভিক উপাসনা ও ৯ই মাঘ প্রাতে উক্ত বাসায় পারিবারিক উপাসনা সম্পন্ন হয়। ৬ই মাঘ সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত করুণাকুমার দাস গুপ্তের বাসায় মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের স্মরণার্থ উপাসনা হয়। ১০ই মাঘ অপরাহ্ণে ব্রহ্ম মন্দিরে মহিলা উৎসব—শ্রীযুক্তা শারদামঞ্জরী দত্ত উপাসনা করেন ও স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার দাস গুপ্তের সহধর্ম্মিণী "উৎসব কি" বিষয়ে আলোচনা উত্থাপন করেন। ১১ই মাঘ প্রাতে শ্রীযুক্ত মতিলাল বড়ুয়া উপাসনা করেন; স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নী প্রার্থনা করেন। সন্ধ্যায় কীর্ত্তন তৎপর শ্রীযুক্তা শারদামঞ্জরী দত্ত উপাসনা করেন ও "ঈশ্বর প্রেমের আহ্বান" বিষয়ে নিবেদন করেন। প্রতিদিনই শ্রীমতী জ্যোৎস্না দাস গুপ্ত ও নির্ম্মলনলিনী দত্ত সঙ্গীত করিয়াছেন।

কিছুদিন যাবৎ মন্দিরের সাপ্তাহিক উপাসনা বন্ধ ছিল। সুখের বিষয় আবার প্রতি সপ্তাহে মন্দিরে উপাসনার ব্যবস্থা হইয়াছে।

আন্দুল ব্রাহ্মসমাজ—আন্দুল ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-গৃহ প্রতিষ্ঠার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে বিগত ৭ই জানুয়ারী সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় উদ্বোধন করেন। ৮ই জানুয়ারী প্রাতেও শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় উপাসনা করেন। অপরাহ্ণে শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দে ও শ্রীযুক্ত অমৃতকুমার দত্ত প্রভৃতি "কীর্ত্তনে উপাসনা" করেন। সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত অনাথকৃষ্ণ শীল "ছায়া চিত্র" যোগে বক্তৃতা করেন।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাগ কর্ত্তৃক ২৯শে মাঘ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।—সম্পাদক শ্রীবরদাকান্ত বসু, বি-এ

Registered No. 65

অসতো মা সদগময়,
তমসো মা জ্যোতি র্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫৫ ভাগ
২২শ সংখ্যা।

১৬ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার ১৩৩৯, ১৮৫৪ শক,
ব্রাহ্মসংবৎ ১০৪
28th February, 1933.

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵৹
অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে জীবনবিধাতা, তুমি যেমন এই বিশ্বের কর্ত্তা ও প্রভু, তেমনি আমাদের প্রতি জীবনেরও নিয়ন্তা। তুমি আমাদিগকে তোমার এই সংসারে আনিয়া, তোমার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছ, আমাদের প্রত্যেকের উপর ব্যক্তিগত ভাবে এবং তোমার এই ধর্ম্মসমাজের অঙ্গরূপে সকলের উপর সমবেত ভাবে কত কর্ত্তব্যভার অর্পণ করিয়াছ; এবং তোমার বাধ্য সন্তানের ন্যায় তাহা যথোপযুক্তরূপে সম্পাদনের মধ্যেই আমাদের উন্নতি ও কল্যাণ নিহিত রাখিয়াছ। তবুও দেখিতে পাইতেছি, আমরা অনেক সময় নানা কার্য্য করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেও, তোমার বাধ্য সন্তানরূপে সর্ব্বপ্রকারে তোমার অনুগত হইয়া চলিতে সর্ব্বদা যত্নশীল হই না বলিয়াই, তাহা অধিকাংশ স্থলে আমাদের উন্নতি ও কল্যাণের কারণ না হইয়া অকল্যাণেরই হেতুভূত হইয়া পড়ে। তুমি অন্তরদর্শী দেবতা, অন্তরে থাকিয়া অন্তরের সকল গূঢ় ভাব জানিতেছ, আমরা যাহা বুঝিতে পারি না তাহাও দেখিয়া তুমি আমাদের সম্মুখে মাঝে মাঝে প্রকাশ করিয়া ধর। কিন্তু দুর্ব্বলতাবশতঃ আমরা সকল সময় তোমার নির্দ্দেশ মানিয়া চলিতে পারি না। তাই, হে দুর্ব্বলের বল, করুণাময় জীবনবিধাতা, আমরা নূতন বৎসরের কার্য্যারম্ভে তোমারই শরণাপন্ন হইতেছি। তুমি কৃপা করিয়া আমাদের সকলকে সে বুদ্ধি ও বল দেও, যাহাতে আমরা সম্পূর্ণরূপে তোমার নির্দ্দেশ মানিয়া চলিতে পারি, তোমার দ্বারাই সর্ব্বদা সকল বিষয়ে চালিত হইতে সমর্থ হই। একমাত্র তোমার ইচ্ছাই আমাদের জীবনে ও সমাজে জয়যুক্ত হউক। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

ত্র্যধিক-শততম মাঘোৎসব

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৬ই মাঘ (১৯শে জানুয়ারী) বৃহস্পতিবার—অদ্য মহর্ষি ৺দেবেন্দ্রনাথের পরলোকগমন-দিবস। প্রাতে কীর্ত্তন ও উপাসনা। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ আচার্য্যের কার্য্য করেন। মহর্ষির জীবনের বিশেষ শিক্ষা বিষয়ে তিনি যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহা পরে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। উহা এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই।

সায়ংকালে স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়। তাহাতে স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার বক্তব্য বলিয়া অসুস্থতানিবন্ধন চলিয়া গেলে, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র সভাপতির কার্য্য এবং শ্রীমতী অবন্তী ভট্টাচার্য্য, শ্রীমতী কুমুদিনী বসু, শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহর্ষির জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা করেন।

৭ই মাঘ (২০শে জানুয়ারী) শুক্রবার—প্রাতে উপাসনা। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী আচার্য্যের কার্য্য করেন। তিনি প্রথমতঃ নিম্নলিখিত মর্ম্মে উদ্বোধন করেন:—

ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইতে হইলে সকলের সহিত একাত্মতা চাই। ইহা পূর্ব্বেও যেমন প্রয়োজন, পরেও সেইরূপ প্রয়োজন। কারণ, ঈশ্বর বলিয়াছেন, আমার নিকট যদি আসিয়াছিস্, আমার হৃদয় গ্রহণ কর্, সকলকে আমার মত ভালবাস্। জগতের সহিত একাত্ম অনুভূতিতে মানব জীবন প্রাণবান্ হয়, ও হৃদয় প্রসারিত হইয়া মহানের পূজার উপযুক্ত হয়। আমরা বিশ্বের সৌন্দর্য্য ও কৌশল দেখিয়া, বিশ্ব যে

মহান্ সুন্দর ও জ্ঞানময় পুরুষে আশ্রিত রহিয়াছে, তাঁহাকে দেখিতে চাই; কিন্তু তিনি যে প্রত্যেক হৃদয়ে লুকাইয়া রহিয়াছেন, আমরা সকলের সহিত একাত্ম হইয়া তাঁহার সেই মুখ দেখিতে চাহি না। ঈশ্বর চাহেন যে, আমরা প্রত্যেকে সকলের সহিত একাত্ম হই।

একাত্ম কি? সকলের সহিত প্রেমে যুক্ত হইয়া সকলকে "আমার" করিয়া লইতে হইবে, সকলের দুঃখ কষ্ট এবং তাহা অপেক্ষা অধিকতর দুর্গতি অজ্ঞান, অবিশ্বাস ও পাপ, এ সকলের ভার প্রত্যেকের অন্তরে বহন করিতে হইবে। সকলের জন্য বেদনা অনুভব করিতে হইবে, এবং সকলের মঙ্গল কামনা লইয়া ঈশ্বরের চরণে প্রার্থনা করিতে হইবে। আমরা বাহিরে কিছু করিতে পারি আর না পারি, হৃদয়ে সকলকে গ্রহণ করিলেই ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হয়। কারণ, তিনি অনন্তশক্তিসম্পন্ন বিশ্বনিয়ন্তা, তাঁহার কাজ করিবার সামর্থ্য বা উপায়ের কোন অভাব হয় না। আমরা হৃদয়ে সকলের সঙ্গে এক হইলে, তিনি যাহা করিবার করিয়া লয়েন। বাস্তবিক মুক্তি অর্থ আরাম নহে। যদি কেহ মনে করেন যে, মুক্ত হইয়া সুখে নিদ্রা যাইব, তবে তাহা ভুল। সকলের পাপভার বহন করিয়া দুঃখ বহনের মধ্যেই মানবের মুক্তি। কিন্তু ইহা কেবলই দুঃখ নহে। যখন ঈশ্বরের বাণী ও তাঁহার বিশ্বের মঙ্গলগীতি হৃদয়ে শুনিতে পাই, তখন শুনি যে সকল দুঃখভার চলিয়া যাইবে, সকল অশ্রু মুছিয়া যাইবে, সকল ভগ্ন হৃদয় জোড়া লাগিবে, সকল পাপ, অবিচার, অত্যাচার দূর হইবে।

বৌদ্ধগণ বলেন, বুদ্ধ আপনার নির্ব্বাণ অগ্রাহ্য করিয়া জগতের উদ্ধারের জন্য বার বার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই জন্য মহাযান মার্গের বৌদ্ধগণ বলেন, অর্হত্ত্ব—যাহাতে মানুষ কেবল আপনার নির্ব্বাণ চাহে, তাহা—অপেক্ষা বুদ্ধত্ব, যাহাতে আপনার নির্ব্বাণ লাভ করিয়াও সকলের দুঃখ পাপ দূর করিবার জন্য মানুষের প্রাণে আগ্রহ থাকে, তাহাই শ্রেষ্ঠ। খৃষ্টান-জগতের মত এই যে, যিশু সকলের পাপভার আপনার মস্তকে গ্রহণ করিয়া জীবন দিয়াছিলেন। এ সকলের মধ্যে যত অবান্তর কথাই থাকুক না কেন, একটি সত্য ফুটিয়া উঠিয়াছে,—সকলের সহিত আমাদের একপ্রাণ হইতে হইবে, সকলকে হৃদয়ে গ্রহণ করিতে হইবে।

আমাদের অহঙ্কার, অপরের নিক্ষিপ্ত আঘাত এবং মানুষের মধ্যে স্বার্থপরতা, পাপ ইত্যাদি এই যোগের পথে অন্তরায়। কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সকল দেখিয়া, এ সকল পরিত্যাগ করিতে হইবে। অহঙ্কারের পশ্চাতে অনেকদিন ছুটিয়া দেখিয়াছি, ইহা আধ্যাত্মিক মৃত্যুর পথে লইয়া যায়, এবং ঈশ্বরের সহিত মানবের বিচ্ছিন্নতা আনয়ন করে। যে আমিত্বকে ঈশ্বরের চরণে দিয়া বলিতে পারে, "তোমার চরণে আমার মৃত্যু," সে দেখিয়াছি জীবন পায়; আর, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সকলকে দেখিয়া সকলকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে। মানুষ আঘাত করে সত্য, কিন্তু ঈশ্বরের হৃদয়ের দিকে তাকাইয়া দেখি, তিনি অম্লান চিত্তে সকলের আঘাত সহ্য করিয়া সকলের মঙ্গল কামনা করিতেছেন। অপরের মধ্যে পাপ দেখিয়াই বা আমরা ঘৃণা করিব কেন? রোগ হইলে মানুষকে আমরা ঘৃণা করি না, বরং দুঃখিত হইয়া রোগমুক্ত করিবার ইচ্ছা হয়। পাপকে রোগের ন্যায় মনে করিয়া কি আমরা সকলকে প্রীতি করিতে পারিব না, ও হৃদয়ে গ্রহণ করিতে পারিব না?

ঈশ্বরের চরণে আমরা সকলকে হৃদয়ে লইয়া বসি ও তাঁহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হই।

উপাসনান্তে তিনি যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল:—

দুইটি কথা আমার বলিবার ছিল, তাহার প্রথমটি উদ্বোধনে বলিয়াছি। দ্বিতীয় বিষয়টি এখন বলিব। প্রকৃত পক্ষে এই দুইটি বিষয় আমাদের সকলকেই লাভ করিতে হইবে,—সে ইহকালেই হউক বা পরকালেই হউক—সে বিষয়টি ঈশ্বরের সহিত প্রেমে একত্ব।

ঈশ্বরের সহিত একত্বের উপর আমাদের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি নির্ভর করিতেছে। অনেকে এবং অনেক ধর্ম্মসমাজে মানুষ ঈশ্বরকে দূরে রাখিয়া কেবল দূর হইতে তাঁহাকে স্তুতি বন্দনা করেন; অনেক লোক এরূপ আছেন যাঁহারা মনে করেন যে, কেবল জনহিতকর কাজ করিলেই ধর্ম্ম হইল, ঈশ্বরের উপাসনার কোন প্রয়োজন নাই; আবার, অনেকে এমন আছেন, যাঁহারা যম নিয়ম আসন ইত্যাদি সাধনা লইয়াই রহিয়া গেলেন, সাধনার লক্ষ্য যে ঈশ্বর তাঁহার নিকট হইতে দূরে পড়িয়া রহিলেন। ঈশ্বর জ্ঞানময়, সত্য ও জীবনের আধার, তিনি অনন্ত প্রেম ও পুণ্যের আশ্রয়, তিনি আনন্দময় ও শান্ত। তাঁহার সহিত একত্ব লাভ করিলে, মানব সত্য জ্ঞানে, জীবনে, অনন্ত প্রেম ও পুণ্যে, আনন্দে ও শান্তিতে যদি প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারে, তবে কিসে পারিবে? কিন্তু এই প্রেমে একত্ব ও ঈশ্বরে পূর্ণ আত্মসমর্পণ একই কথা। প্রেমের লক্ষণ এই যে, একজন আর একজনের মধ্যে ডুবিয়া যাইবে,—প্রেমিকের চিন্তা, আকাঙ্ক্ষা, অস্তিত্ব প্রেমাস্পদ ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রেমের লক্ষ্য উদ্দেশ্য গতি আছে। মানবীয় প্রেম বস্তুর চিন্তা লইয়া থাকে। কিন্তু ঈশ্বর ত কেবল চিন্তা নহেন, তিনি সর্ব্বব্যাপী; এই জন্য প্রকৃত প্রেমে মানুষ ঈশ্বরের মধ্যে ডুবিয়া যায়, অথচ তাহার অস্তিত্ব দূর হয় না।

অনেকের মনে হইতে পারে যে, আমাদের দেশের একত্ব-সাধকগণ যে জীবনের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা লোভনীয় নহে। যেমন অদ্বৈতবাদিগণ ও মধ্যযুগের ভক্তগণ এক ঈশ্বরের সাধনাতে লিপ্ত থাকিয়া, জগতের সকল মঙ্গলজনক কাজ হইতে আপনাদিগকে সরাইয়া, কেবল নিজেকে লইয়াই রহিলেন। ইহাদের দোষ এই যে, ইহারা ঈশ্বরের এক দেশ মাত্র দর্শন করিয়াছেন। এ দেশের অদ্বৈতবাদিগণ ঈশ্বরকে সৎ ও জ্ঞান মাত্র মনে করিয়াছেন, এবং সে জ্ঞানও এমনি যে তাহার কোন ক্রিয়া নাই, তাহা জড় ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? মধ্য-যুগের ভক্তগণ ঈশ্বরকে দূরে রাখিয়া কেবল অন্তরের উচ্ছ্বাসে

ভুক্ত ছিলেন বলিয়া মনে হয়, তাঁহার মধ্যে সত্যই ডুবিতে পারেন নাই। কারণ, ঈশ্বরের সঙ্গে প্রেমে যুক্ত হইলে তাঁহার দৃষ্টিতে সকল দেখা, তাঁহার হৃদয় অন্তরে ধারণ করিয়া সকলের সুখ দুঃখের অনুভূতি ও সেবার জন্য ব্যস্ততা, এবং ঈশ্বরের বিশ্বপ্রসারী মঙ্গল ইচ্ছার সহিত আপনার ইচ্ছা এক না করিয়া কেহ পারে না। এই-জন্য প্রথমে উপাসনার সহায়তায় আমাদের ঈশ্বরকে চিনিতে হইবে। আমরা উপনিষদ্ হইতে যে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" ইত্যাদি সাধনার মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছি, তাহা একটী উৎকৃষ্ট উপায়। কিন্তু সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের মধ্যে ইহা একমাত্র উপায় বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। যিনি যে উপায়েই পারুন, ঈশ্বরকে সত্য রূপে দেখিতে চেষ্টা করুন, ইহাই উপাসনার লক্ষ্য।

কিন্তু এই উপাসনা প্রেম ও আত্মসমর্পণ ব্যতীত বৃথা হইয়া যায়। দেখিয়াছি, বৎসরের পর বৎসর মানুষ উপাসনা করিয়াছে, কিন্তু জীবন হয় নাই। প্রেমে ঈশ্বরের সহিত এক না হইলে জীবন হয় না, এবং মুক্তি নাই। "তোমার দৃষ্টি আমার হউক, তোমার হৃদয় আমার হউক, তোমার ইচ্ছা আমার ইচ্ছা হউক, আমি তুমি হইয়া যাই," এই প্রার্থনা আমাদের করিতে হইবে। প্রেমে ঈশ্বর মানবের সকল হন, কিন্তু আত্মার অস্তিত্ব তিনি বিনাশ করেন না। ঈশ্বর মানবের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করেন না। দেখিয়াছি, তিনি বন্ধুরূপে আমাদিগের সহিত ব্যবহার করেন, তিনি বলেন, "তোর যাহা করিবার কর্, আমি তোর সঙ্গে আছি।"

আমাদের সঙ্গীতের নূতন সংস্করণে কবীরের একটি গান দেওয়া হইয়াছে। এ গানে কবীর ঈশ্বরকে "ফকীরোয়া" বা ভিখারী বলিয়াছেন। ঈশ্বরের অনন্ত ঐশ্বর্য্য, তাঁহার অভাব কিছুই নাই, কিন্তু তিনি ভিখারী মানবের হৃদয়ের জন্য—কারণ, মানবের হৃদয় তাঁহার না হইলে, মানুষ বিনষ্ট হইয়া যাইবে এবং তাঁহার সৃষ্টি ব্যর্থ হইবে। তিনি মানবকে অনন্ত জীবন ও অনন্ত সম্পদের অধিকারী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই অনন্ত জীবন-স্রোতের সহিত এক না হইলে মানবের বিনাশ সম্মুখে; কারণ, তাঁহা ব্যতীত আর যাহা কিছু সব বিনাশশীল। ইহা ব্যতীত আমাদের প্রত্যেকের জন্য তাঁহার অনন্ত প্রেম দেখিলে আমাদের প্রেমের সকল গৌরব চূর্ণ হইয়া যায়। তিনি তাঁহার অসীম হৃদয় দিয়া আমাদিগকে যেরূপ ভালবাসেন, তাঁহার আকাশ, পৃথিবী, অনাদি দেশকালের উপর হইতে তাঁহার যে প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি আমাদের উপর পতিত রহিয়াছে, তাহা দেখিলে আমাদের ভক্তির আর কোন অভিমান থাকে না।

প্রেমে আত্মসমর্পণ বা প্রেমে একত্ব না হইলে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ নাই। ইহা না হইলে ব্রাহ্মসমাজের জন্য আমার ভয় হয়। অর্থ, জন, বাহিরের প্রতিষ্ঠা, যশ, আড়ম্বর, ইহার কিছুই থাকে না। ঈশ্বরের সঙ্গে একত্বই থাকে, এবং ইহা থাকিলেই আর সব থাকে। ঈশ্বরের কাজের কিছু অভাব নাই, তাঁহার উপকরণেরও কোন অভাব নাই, তাঁহার সহিত আত্মাতে প্রেমে যুক্ত হইলে, আমাদের যাহা প্রয়োজন তিনিই তাহা করিয়া দিবেন।

সায়ংকালে তত্ত্ববিদ্যা সভার উৎসব। তদুপলক্ষে পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ "প্রেমালোকে ব্রহ্মলোক প্রকাশ" বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

৮ই মাঘ (২১শে জানুয়ারী) শনিবার— প্রাতে মন্দিরে মহিলাদিগের উৎসব। তাহাতে শ্রীমতী অবন্তী ভট্টাচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশ নিম্নে প্রকাশিত হইল:—

সামাজিক উপাসনার একটি অঙ্গ উপদেশ; কিন্তু নিজের দিকে তাকাইয়া উপদেশ দিতে আমি সঙ্কুচিত। উচ্চশিক্ষা, চিন্তাশীলতা, গভীর জ্ঞান, কিছুই আমার নাই। যোগ্যতরা ভগ্নীগণের মধ্যে কেহ এই ভার লউন, এই ইচ্ছা জানাইয়াছিলাম; কিন্তু নানা কারণে তাহা ঘটিয়া উঠিল না। তাই, আমার সামান্য শক্তিতে মধ্যে মধ্যে যাহা চিন্তা করিয়া থাকি, তাহা বলিবার চেষ্টা করিতেছি।

অতীতের দিকে চাহিয়া দেখিলেই দেখিতে পাই, এদেশে নারীজাগরণরূপ যজ্ঞের হোতা ব্রাহ্মসমাজের নেতাগণ। রাজা রামমোহনের সময়ে দেশে নারী-শিক্ষার নামও ছিল না বলিলে হয়,—নারী পুরুষের নিকট নিতান্ত অবজ্ঞাত ছিলেন। সেই আবেষ্টনের মধ্যে জন্মিয়া এবং বাস করিয়াও, রাজা নারীজাতিকে কি প্রকার শ্রদ্ধা করিতেন ও নারীর দুঃখে তাঁহার প্রাণ কিরূপ কাঁদিত, তাহা সকলেই অবগত আছেন। নারীগণ কিরূপ শ্রদ্ধার পাত্রী রাজা তাহা জীবনে দেখাইয়া গেলেন। মহর্ষির জীবনে দেখিতে পাই, তখনো দেশে স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলিত হয় নাই; কিন্তু তিনি স্বীয় পরিবারের কন্যা ও বধূগণের শিক্ষায় বিশেষ মনোযোগী ছিলেন, যাহার ফলে তাঁহার কন্যা দেশের প্রথম ও প্রধান লেখিকা রূপে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। কেশবচন্দ্রের সময়ে দেশে স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন হয়। তিনি ও তাঁহার সমসাময়িকগণ স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার জন্য যে কিরূপ সংগ্রাম করিয়াছেন, তাহা আমরা সকলেই জানি। নারীর উন্নতির প্রয়োজনীয়তাও যখন দেশ স্বীকার করিতে চাহিতেছিল না, সেই অবস্থায় ব্রাহ্মসমাজের প্রথম নগর-কীর্ত্তনে গীত হইয়াছিল "নরনারী সাধারণের সমান অধিকার, যার আছে ভক্তি পাবে মুক্তি, নাহি জাত বিচার"। কি উন্নত উদার আদর্শ ব্রাহ্মসমাজ ধরিয়াছেন! ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মগণের প্রাণপণ চেষ্টায় দেশ নারী-শিক্ষায় অগ্রসর হইতে হইতে আজ বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। আজ যে নারীগণ উচ্চশিক্ষা পাইতেছেন, আজ যে নারীগণ অবরোধ-প্রথা হইতে মুক্ত হইয়া অবাধে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছেন, আজ যে নারীগণ দেশের সর্ব্ববিধ কার্য্যে পুরুষের সঙ্গে সমান স্থান লাভ করিতেছেন, এই স্বাধীনতার মূলে কাহার হস্ত? দেশের চক্ষে এই উদার দৃষ্টি ফুটাইতে ব্রাহ্মসমাজকে কি কঠিন সংগ্রাম করিতে হইয়াছে তাহা কি আমরা ভুলিয়া থাকিব? কাহার উত্তরাধিকারী আমরা? এই যুগে জন্ম গ্রহণ করিয়া দেশের কন্যাগণ কি অধিকারে অধিকারী হইয়াছেন, এ অধিকার কে দিল, তাহা কি

ভাবিব না? বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজের কন্যাগণ তোমরা কি তাহা বিস্মৃত হইবে? তোমরা কি বলিবে, ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক? উচ্চ শিক্ষা পাইতেছ, জগতের, দেশের, জাতির সমাজের ইতিহাস দেখ, চিন্তা কর। অতীতের সকল দেশের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণের, অতীতের সকল দেশের, সকল জাতির, সকল সমাজের নেতাগণের জীবনের বাণী গ্রহণ করিবার অধিকার কাহার ভিতর দিয়া পাইয়াছ? ঋণ স্বীকার কর, কৃতজ্ঞ হও, যে দান পাইয়াছ তাহার সদ্ব্যবহার কর,—তোমার জীবন তোমার ও জগতের কল্যাণের কারণ হইবে। দেশের ভবিষ্যৎ তোমরা, জাতির ভবিষ্যৎ তোমরা, সমাজের ভবিষ্যৎ তোমরা, গৃহ পরিবারের ভবিষ্যৎ তোমরা। উচ্চ-শিক্ষার অধিকারিণী হ'য়ে নারীর প্রকৃত মূল্য বুঝ্বার সুযোগ পেয়েছ। তোমাদের অন্তরে কত উচ্চ আকাঙ্ক্ষা রয়েছে! আমি প্রার্থনা করি, এই সকল উচ্চ ভাব, উচ্চ আকাঙ্ক্ষা তোমাদের জীবনে সার্থক হউক ও জগতের সর্ব্ববিধ কল্যাণ সাধন করুক।

বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মসমাজের প্রধান দুঃখের কারণ হইয়াছে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আমাদিগের উদাসীনতা। সাপ্তাহিক উপাসনায় নিয়মিত উপস্থিতের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। বিশেষতঃ মহিলাদিগের উপস্থিতি খুবই অল্প। অধিকাংশ মহিলা উৎসব ভিন্ন অন্য সময়ে সামাজিক উপাসনায় আসেন না বলিলে হয়। অনেক সময় অনেকে বলিয়া থাকেন, উপাসনা নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপার। সামাজিক উপাসনায় যোগ দিবার প্রয়োজন কি? এ বিষয়ে আমার যাহা মনে হয় তাহা সংক্ষেপে নিবেদন করিতেছি।

ব্রাহ্মসমাজে নির্জ্জন বা একাকী উপাসনা ও সজন উপাসনা অর্থাৎ সকলের সহিত মিলিয়া তাঁর আরাধনা, এই দুইটিই প্রচলিত হইয়াছে। আমার মনে হইতেছে, এই দুই প্রকার উপাসনার কেবল একটি মাত্র গ্রহণ করিলে, ঠিক মত উপাসনার পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। যিনি একাকী নিজে ভগবানের চরণে বসিতে অভ্যস্ত হন না, তিনি সজন উপাসনায় আচার্য্যের আরাধনার সহিত সম্যক্ যোগ দিতে ও সেই উপাসনার আনন্দ সম্যক্ উপলব্ধি করিতে কি রূপে পারিবেন? আর, যাঁহারা কেবল নির্জ্জনে একাকী ভগবানের চরণে বসেন, সজন উপাসনায় যোগ দেন না, তাঁহারা সমসাধক উপাসকমণ্ডলীর সহিত যুক্ত না হওয়াতে, উক্ত সাধকগণের মধ্যে ভগবানের যে প্রকাশ তাহার উপলব্ধি হইতে বঞ্চিত হন। তাই ব্রাহ্মসমাজ নির্জ্জন ও সজন উপাসনা উভয়কেই গ্রহণ করিয়াছেন। একাকী উপাসনায় প্রতিদিন তাঁর চরণে বসিলে, আত্মদৃষ্টিকে জাগ্রত করিয়া, নিজের ত্রুটি দুর্ব্বলতার জন্য অনুতপ্ত হইয়া, প্রতিনিয়ত তাঁহার চরণে বল ভিক্ষা করিলে, জীবন উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া চলে। এই অবস্থায় সাধকগণের সহিত উপাসনায় যোগ দিলে, তাঁহাদের জীবন-সংগ্রামের অভিজ্ঞতা, তাঁহাদের অন্তরের ব্যাকুলতা, প্রেমময়ের প্রেমস্পর্শসম্ভূত তাঁহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি প্রভৃতির ফলে, সেই সকল উন্নত জীবনের সংস্পর্শে, সেই সকল সাধকগণের বাণী শ্রবণে, সেই সকল ভক্তের ব্রহ্মানুরাগ দর্শনে, আমাদিগের অন্তর্নিহিত ব্রহ্মানুরাগ উদ্দীপ্ত হয়, আমরা জীবন-সংগ্রামে বল পাই। একাকী তাঁর চরণে বসিয়া, তাঁর আরাধনা করিয়া, তাঁর যে স্বরূপ উপলব্ধি করি, সে বিষয়ে উপাসকমণ্ডলীর সঙ্গে বসিয়া প্রাণে বিশেষ সায় পাই, সেই উপলব্ধি আরও নিবিড় হয়, তাঁহার সত্যতা আরও উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশিত হয়। তাই মনে হয়, নির্জ্জন উপাসনা ও সজন উপাসনা পরস্পর সাপেক্ষ। আমাদের জীবনে একটির অভাব ঘটিলে উপাসনার পথে আমরা সম্যক্ অগ্রসর হইতে পারি না।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে এই সম্মিলিত উপাসনাকে আমাদিগের দেশে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। এই এক শতাব্দীর মধ্যে নানা বিচিত্রতার মধ্য দিয়া এই সম্মিলিত উপাসনা বর্ত্তমান আকারে ব্রাহ্মসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এখন আমরা বুঝিয়াছি, ব্রহ্মোপাসনাই আমাদিগের মিলন-ভূমি। এই মিলন-ভূমিতে মিলিবার যে অধিকার আমরা পাইয়াছি, তাহা কি আমরা ভুলিয়া থাকিব? এই মিলন-ভূমি,—যাহা একমাত্র ব্রহ্মই উপাস্য ও আমরা তাঁর উপাসক, এই মহান সত্য আমাদের অন্তরে জাগ্রত করিয়া আমাদিগের ক্ষুদ্রতা সংকীর্ণতা সকলই ঘুচাইয়া দেয়,—এই মিলন-ভূমি,—যাহা একমাত্র ব্রহ্মের সন্তান আমরা, এই অনুভূতিতে জাতি, ধর্ম্ম, দেশ কালের ব্যবধান ঘুচাইয়া সমগ্র মানব জাতিকে আমার আত্মীয় করিয়া, তাহার মধ্যে আমার উপাস্য ব্রহ্মের লীলা-প্রকাশ দর্শনের বিমল আনন্দ দিয়া, আমার মানব জন্মকে সার্থক করিয়া দেয়,—এই যে ব্রহ্মোপাসনা, এই অধিকার রক্ষার জন্য আমরা কি চেষ্টা করিতেছি? ভগিনীগণ, কন্যাগণ, গৃহ পরিবার আমাদিগের হস্তে, আমরা কি সেই গৃহ পরিবারের শুধু সাংসারিক সকল প্রকার উন্নতির চেষ্টা করিয়াই ক্ষান্ত হইব? আমরা কি আমাদের পরিবারসকলের শুধু শিক্ষার উন্নতির চেষ্টা করিয়াই ক্ষান্ত হইব? আমরা কি আমাদের নিজেদের ও আমাদের পরিবারের সকলের এই আধ্যাত্মিক উন্নতির কথা ভুলিয়া থাকিব? এই যে উপাসনা-বিমুখতা সমাজের সর্ব্বত্র সংক্রামিত হইতেছে, ইহার প্রতিকার চেষ্টা করিব না? এখন অনেক পরিবারে পারিবারিক অনুষ্ঠানগুলি ভিন্ন আর উপাসনা হয় না বলিলে হয়,—তাহাও অনেক সময় আচার্য্যের অভাব ঘটিলে বন্ধ হইয়া যায়। আমরা যদি ভগবানের চরণে নিত্য বসিতে অভ্যস্ত হইতাম, তবে কি আচার্য্যের অভাবে পারিবারিক অনুষ্ঠানে ভগবানের নাম হওয়া বন্ধ হইত? আমাদের প্রধান অভাব, প্রধান দুঃখের প্রতিই আমরা উদাসীন হইয়া রহিয়াছি। আজ এই উৎসবের দিনে, আসুন সকলে, এক প্রাণে এই অভাব দূরীকরণের জন্য ব্যাকুল হই। উপাসনাকে স্বীয় জীবনে, গৃহে, পরিবারে, সমাজে, সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চেষ্টিত হই। উৎসব-দেবতা আমাদিগকে কৃপা করুন।

পুরুষদিগের জন্য সিটি কলেজ হলে পৃথক উপাসনা হয়। তাহাতে শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। তিনি "ব্রহ্মপূজা" বিষয়ে যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহার মর্ম্ম নিয়ে প্রকাশিত হইল :—

আমরা নিরন্তর ভগবানের অপার করুণার মধ্যেই ডুবিয়া রহিয়াছি, প্রতি মুহূর্ত্ত তাঁহার অফুরন্ত কৃপাই আমাদিগকে অভিষিক্ত করিতেছে। তাঁহার কৃপার অন্ত নাই, কিন্তু এই সকলের মধ্যে তাঁহার শ্রেষ্ঠ করুণা তাঁহার পূজার অধিকার, তাঁহার চরণতলে বসিবার অধিকার। তবে এই মহা অধিকারের সুযোগ কি আমরা সম্যক্ গ্রহণ করিয়াছি? এই মহা অধিকারের উপযুক্ত ব্যবহার কি আমরা করিয়াছি? তাহা আমরা করি নাই, এবং তাহা করি নাই বলিয়াই আমাদের ব্যক্তিগত জীবন এমন শুষ্ক নীরস, আমাদের পরিবার এমন আনন্দবিহীন, আমাদের সমাজ এমন দুর্ব্বল। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসের দিকে যদি আমরা দৃষ্টিপাত করি, তবে দেখিতে পাই যে, জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণ মনে করিতেন বলিয়াই রাজা রামমোহন এমন জীবন দিয়া এই ব্রহ্মপূজাকেই প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন—যাহা উপলক্ষ করিয়া আমাদের এই উৎসব। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই ব্রহ্মপূজাকেই একমাত্র ইহপারত্রিক কল্যাণ মনে করিতেন বলিয়াই ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মধ্যান ও ব্রহ্মানন্দ-রসপানে এমন বিভোর হইয়া থাকিতেন, এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রও এই ব্রহ্মপূজাকেই জীবনের একমাত্র কল্যাণ মনে করিতেন বলিয়াই, যখনই আমরা তাঁহার কথা ভাবি তখনই তাঁহার 'ঊর্দ্ধমুখে করপুটে' এই মূর্ত্তিটাই আমাদের মনে পড়ে। তার পর উমেশচন্দ্র, শিবনাথ, নগেন্দ্রনাথ, প্রভৃতি এবং তার পর এই যে সেইদিন হেমচন্দ্র ললিতমোহন চলিয়া গেলেন, ইঁহারা ত সকলেই এই ব্রহ্মপূজায়ই আপনাদের দেহ মন প্রাণ, শক্তি সামর্থ্য, বিদ্যা বুদ্ধি, অর্থ বিত্ত সবই অর্পণ করিয়া দিয়া গিয়াছেন।

তবে আমরা তাঁহার এই কৃপা ভুলিয়া থাকিলেও তিনি আমাদিগকে ভুলেন না। তাই তাঁহার বিচিত্র করুণা আবার এই উৎসব উপলক্ষ করিয়া, ভক্ত ব্যাকুল হৃদয়ের মধ্য দিয়া, আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করিতেছে। আমরা আবার এই উৎসবে ভক্ত ব্যাকুলাত্মার সমাগমে তাঁহার বিশেষ করুণা লাভ করিয়া ধন্য হইব। এই জগতে, আকাশ বাতাসে, নদী গিরি বনে, জীবে জীবে, মানবে ভক্ত জীবনে তাঁহার যে নিত্যোৎসব চলিতেছে, আমরা সেই নিত্যোৎসবে যোগদান করিয়া কৃতার্থ হইব। তাঁহার কৃপায় আমাদের জীবন, আমাদের পরিবার, আমাদের ব্রাহ্মসমাজ নিত্য উৎসবময় হউক। আমাদের এই উৎসব নিত্যোৎসবে পরিণত হউক। তাঁহারই কৃপার জয় হউক।

সায়ংকালে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের সভাপতিত্বে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে বার্ষিক কার্য্যবিবরণ ও হিসাব আলোচিত ও গৃহীত, কর্ম্মচারিগণ ও অধ্যক্ষ সভার সভ্যগণ এবং ব্রহ্মমন্দিরের ও ব্রাহ্মবালিকা-শিক্ষালয়ের দুইজন ট্রাষ্টী নিযুক্ত হন। তাঁহাদের নাম পূর্ব্ব সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। পরলোকগত সভ্যদের সম্বন্ধে শোক প্রকাশ এবং বিবিধ প্রতিষ্ঠান ও কর্ম্মীদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া কয়েকটি প্রস্তাবও গৃহীত হয়। সময়াভাবে সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ না করিয়া, পরে মেসেঞ্জার পত্রিকাতে প্রকাশ করিবেন, বলেন।

৯ই মাঘ (২২শে জানুয়ারী) রবিবার— প্রাতে ব্রাহ্মযুবকদিগের উৎসব উপলক্ষে সংকীর্ত্তন ও উপাসনা। শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম পরে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। এখনও উহা হস্তগত হয় নাই। মধ্যাহ্নে প্রীতিভোজন।

অপরাহ্ণে বরাহনগর শ্রমজীবিগণের নগর-সংকীর্ত্তন। সকলে বিডন উদ্যানে সমবেত হইলে, শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু প্রার্থনা করেন। অনন্তর কীর্ত্তন করিতে করিতে বিডন ষ্ট্রীট, রাজা গুরুদাস ষ্ট্রীট, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, বিবেকানন্দ রোড, সিমলা ষ্ট্রীট ও কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইয়া সকলে মন্দিরে উপস্থিত হইলে কিছু সময় কীর্ত্তন চলিতে থাকে। তাহার পর উপাসনা। শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই। পাইলে পরে প্রকাশিত হইবে :—

১০ই মাঘ (২৩শে জানুয়ারী) সোমবার —অদ্য কলিকাতা উপাসকমণ্ডলী-প্রতিষ্ঠার ও পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয়ের পরলোকগমনের দিবস। প্রাতে উপাসকমণ্ডলীর উৎসব উপলক্ষে সংকীর্ত্তন ও উপাসনা; শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী আচার্য্যের কার্য্য করেন।

তিনি উদ্বোধন ও উপদেশে মণ্ডলীর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ বিবৃতি প্রদান করেন :—

আমাদের উপাসকমণ্ডলীর প্রধান প্রধান স্তম্ভ সমূহ বার্দ্ধক্য ও মৃত্যুতে ক্রমে ক্রমে অপসারিত হইতেছেন। ভগবানের বোধ হয় ইচ্ছা, যে, অনুপ্রাণনের জন্য আমরা আর ব্যক্তির দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া সমষ্টির দিকে, সমবেত জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করি। সকল ধর্ম্মই সাক্ষ্য দিতেছেন যে, মানুষ যেখানে ভগবানের নামে একত্রিত হয় সেইখানেই ভগবানের আবির্ভাব হয়। ইহুদীদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ Talmudএ আছে "When there are two persons and the Law is the subject of discourse, there also is the Spirit of God." অর্থাৎ যেখানে দুই ব্যক্তি ভগবদ্ প্রসঙ্গ লইয়া একত্রিত হয়, সেখানে পরমাত্মাও উপস্থিত থাকেন। মথি লিখিত বাইবেল গ্রন্থে যীশুর উক্তিটী সকলেই জানেন—"Where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them," অর্থাৎ যেখানে আমার নামে দুই তিন ব্যক্তি উপস্থিত, আমি তাঁহাদের মধ্যে বর্ত্তমান। বলা বাহুল্য, যিশু এখানে

কোন মানুষ নহেন, স্বয়ং ঈশ্বররূপে কল্পিত। বুদ্ধের উক্তিরূপে আছে—যেখানে বুদ্ধপুত্র সেখানেই আমি—এখানে বুদ্ধও ঈশ্বর-রূপেই কল্পিত, কোন মানুষ নহেন। বৌদ্ধধর্ম্মে যে সঙ্ঘের অতি উচ্চ স্থান তা সকলেই জানেন। নারদের প্রতি ভগবদুক্তিরূপে একটী যে প্রচলিত বচন আছে, তাহা নানাদিক হইতেই গভীর অর্থব্যঞ্জক—

নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তাঃ যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥

এই মুনি ঋষির দেশে, এই তথাকথিত ধ্যান সমাধি সাধন প্লাবিত দেশে, ঐ শেষোক্ত উক্তিটী বিশেষ ভাবে প্রণিধান করিবার বিষয়। ইহা মুখে প্রকাশ করিয়া বলিবার সাহস কেবল তাঁহারই হইতে পারে, যিনি সাধন বলে ইহার অন্তর্নিহিত সত্যটী প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বিষয় করিয়াছেন। অভিজ্ঞতালব্ধ সত্যের তলায় যে সুদৃঢ় ভিত্তি তাহা কোন যুক্তি, কোন প্রমাণ টলাইতে সমর্থ নহে। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজ যে বলিয়াছেন—"একাকী যাইলে পথে নাহি পরিত্রাণ রে"—তাহা অর্ব্বাচীনতা-দোষ-দুষ্ট নহে। আবার একবার মানুষের মনে সেই পুরাতন সত্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছে মাত্র। সত্য ভগবানেরই আত্মপ্রকাশ। উপরি উদ্ধৃত বাক্যগুলি ব্যক্তি-বিশেষের উক্তি নহে, ব্যক্তি-বিশেষের উক্তি বলিয়াই সত্য নহে। মানব জাতির অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য। সত্য বলিয়া অনুভূত হইয়াছে বলিয়াই ভগবানের মুখে অথবা যাঁহারা মহাপুরুষ বলিয়া কল্পিত বা গৃহীত তাঁহাদের মুখে মানুষ এইগুলি দিয়াছে। মহাপুরুষেরা বলিয়াছেন বলিয়া সত্য, এই কথার মধ্যে একটী যুক্তি বিপর্য্যয় Petitio Principii আছে। মহাজনের অর্থাৎ বংশ পরম্পরার অভিজ্ঞতায় লব্ধ বলিয়া সত্য—ইহারই মধ্যে যুক্তিটি নিহিত।

ভগবদ্গীতায় দুইটী শ্লোকে অন্যান্য কথার সঙ্গে এই কথার উপরেও বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণাঃ বোধয়ন্তঃ পরস্পরং।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥

এই শ্লোকদ্বয়ে প্রচলিত দুই রকম ধর্ম্মসাধনের প্রতিবাদ আছে ও চার রকম সাধন-গতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। (১) এক শ্রেণীর সাধক আছেন, যাঁরা নেতি নেতি পথ ধরিয়া ব্রহ্মকে সর্ব্ব বিশেষত্ব বর্জ্জিত করেন ও শূন্যে উপস্থিত হন। উহাই তাঁদের মোক্ষ। তাঁরা একাকিত্বের পক্ষপাতী, 'বোধয়ন্তঃ পরস্পরং,' চান না। গীতাকার পরস্পরের সাহায্যের কথা অবতারণা করিয়া এই শ্রেণীর সাধন-পন্থার প্রতিবাদ করিয়াছেন। ব্রাহ্ম-সমাজ পরস্পরের সাহায্যের পথের উপরই জোর দিয়াছেন। (২) আর এক শ্রেণীর সাধক ধর্ম্মসাধনে যে আনন্দ পাওয়া যায় তাহাকেই সাধনের চরম মনে করেন। তাঁরা যেখানে আনন্দ পান, সেইখানেই ছুটেন। কোন তত্ত্বজ্ঞান করেন না। সাধনের উচ্চনীচ জ্ঞান তাঁদের নাই। (৩) আর এক শ্রেণীর সাধক আরও উপরে উঠেন, তাঁরা প্রীতিপূর্ব্বক ভগবানের ভজনে নিযুক্ত থাকেন। কিন্তু গীতাকারের মতে উহাও পন্থা বা পাথেয়। গন্তব্য এখনও বহুদূরে। (৪) ভগবানের নাম গুণগান ও পরস্পরের তত্ত্ব-কথার দ্বারা পরস্পরকে সাহায্য করিয়া যে অগ্রসর হওয়া, তারই সুযোগে ভগবান্ মানুষকে যে জ্ঞান প্রদান করেন, তাহাদ্বারাই মানুষ ভগবান্কে প্রাপ্ত হয়। ইহাই মানব জীবনের পরম চরিতার্থতা। মধুসূদন সরস্বতী "বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্" এই কথার ব্যাখ্যায় বলেন—"বিদ্বদ্গোষ্ঠীষু পরস্পর-মন্যোন্যং শ্রুতিভির্যুক্তিভিশ্চ মামেব বোধয়ন্তঃ"—শাস্ত্র ও স্বানুভূতি দ্বারা পরস্পরকে বুঝাইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। শাস্ত্র আর কিছুই নহে, পূর্ব্ববর্ত্তিগণের অভিজ্ঞতা যা পূর্ব্ব-পরম্পরায় চ'লে এসেছে। এই দুই মিলিয়ে পরস্পরের সাহায্যেই বুদ্ধিযোগ লাভ হইবে যাহাতে ভগবান্কে পাওয়া যায়। ভগবান্কে পাওয়ার অর্থ কি? আচার্য্য শঙ্কর বলেছেন—পরমেশ্বরকে আপনার আত্মারূপে জানাই তাঁহাকে পাওয়া। ব্রহ্ম বিচিত্র স্বরূপ, এই জগৎ তাঁর বিচিত্রতার প্রকাশ। আমাদের প্রত্যেকের যে অনুভূতি তা একত্র না করিলে বিচিত্রস্বরূপ পরমেশ্বরের সম্যগ্ উপলব্ধি হইতে পারে না। সুতরাং সাধ্য নির্ণয়ের জন্যই ধর্ম্মমণ্ডলী চাই, বিদ্বদ্গোষ্ঠী চাই, সাধন তো বহু দূরে। এইরূপে মণ্ডলিবদ্ধ সাধনে নিযুক্ত থাকিলেই কেবল ভগবানের অনুকম্পায় তাঁহাকে লাভ করা যায়। তাই ব্রাহ্মসমাজ মণ্ডলিবদ্ধ সাধনের কথা এমন জোরের সঙ্গে বলেছেন। অন্যদিকে, ধর্ম্মসাধনে পরস্পরের সাহায্যের অনতিক্রমণীয়তার বোধের সঙ্গে সঙ্গেই পরস্পরের সঙ্গে প্রীতি-সূত্রে আবদ্ধ হইব। পরস্পরের প্রতি প্রীতি ছাড়াও ধর্ম্মসাধন হইতে পারে না। পরমেশ্বর ও তাঁহার জনের প্রতি প্রীতি এবং পরস্পরের সেবা, ইহাই যুগধর্ম্ম সম্মত পরম মুখ্য উপাসনা। পরস্পরের সঙ্গে মিলিত উপাসনা ছাড়া ইহার সাধন অসম্ভব—এই নূতন ধর্ম্ম-বিধান জগতে উপস্থিত হইয়াছে। ইহার সাধনেই চতুর্দ্দিকে যে ধর্ম্মের গ্লানি দেখিতেছি তাহা দূরীভূত হইবে। অন্য উপায় নাই। অধর্ম্ম ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া রহিয়াছে, তাই মানুষ ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিতে চায়। প্রকৃত ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতেই কেবল এই গ্লানিই নিবারণ করা যাইতে পারে।

অপরাহ্নে নবদ্বীপচন্দ্র স্মৃতিসভা। তাহাতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র সভাপতির কার্য্য এবং শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুক্ত মথুরানাথ গাঙ্গুলী ও শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা ও পাঠ করেন।

তদনন্তর নগর-সংকীর্ত্তন। ৪ ঘটিকার সময় সকলে কলেজ স্কোয়ারে সমবেত হইলে শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু প্রার্থনা করেন। এবং তাহার পর সংকীর্ত্তন করিতে করিতে মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, পটুয়াটোলা লেন, হ্যারিসন রোড, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কৈলাশ বসু ষ্ট্রীট ও কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইয়া সকলে মন্দিরে উপস্থিত হইলে, সেখানেও কিছু সময় কীর্ত্তন চলিতে থাকে। অনন্তর উপাসনা। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত

উপদেশের মর্ম্ম এখন পর্য্যন্ত হস্তগত হয় নাই। পাইলে পরে প্রকাশিত হইবে :—

১১ই মাঘ (২৪শে জানুয়ারী) মঙ্গলবার

—অদ্য উৎসবের প্রধান দিন। পূর্ব্ব রাত্রির উপাসনার পর যুবকগণ রাত্রি জাগিয়া মন্দির পত্রপুষ্পে সুশোভিত করেন। রাত্রি প্রভাতের বহু পূর্ব্ব হইতেই ব্যাকুলপ্রাণ উপাসক উপাসিকাগণ আসিয়া মন্দির পূর্ণ করিতে থাকেন, এবং সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন চলিতে থাকে। অনন্তর যথাসময়ে প্রাতঃ-কালীন উপাসনা আরম্ভ হয়। তাহাতে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। মিলিত কণ্ঠে "জাগো পুরবাসি ভগবতপ্রেমপিয়াসি" এই সঙ্গীতটি গীত হইলে নিম্নলিখিত মর্ম্মে উদ্বোধন আরম্ভ হয় :—

আজকার এ দিন আমাদের কাছে কি পবিত্র দিন! সারা বৎসর আমরা যে দিনের দিকে ব্যাকুল হ'য়ে চেয়ে থাকি, সেই দিন আজ এসেছে। যে দিন মায়ের দয়া ভাল ক'রে স্বীকার কর্‌ব, যে দিন তাঁর দয়ার অনুভবে হৃদয় উথ্‌লে উঠ্‌বে, যে দিন তাঁর প্রেমসাগরে অবগাহন ক'রে ও তাঁর প্রেমের হাতে আত্মসমর্পণ ক'রে আমরা ধন্য হব, সেই দিন এসেছে। আমরাও আজ ব্যাকুল হ'য়ে এসেছি, মায়ের দয়ার কোলে মুখ লুকাবার জন্য, মায়ের দয়ার কোলে ব'সে জীবনের সব শোক দুঃখ প্রশমিত ক'রে নেবার জন্য, সব পাপ তাপ দূর ক'রে নেবার জন্য। আজ মা ডেকেছেন। মায়ের ডাক শুনে আজ আমাদের হৃদয় আলোড়িত হ'য়ে উঠ্‌চে। আজ আমাদের মন যেমন মায়ের জন্য ব্যাকুল হ'য়েছে, সেই পরমজননীও তেম্‌নি আজ আমাদের জন্য ব্যাকুল। তাঁর চরণস্পর্শ আজ আমাদের শোকে তাপে তপ্ত প্রাণে পেতেই হবে। উৎসবে আমাদের প্রত্যেকের জন্য তাঁর কিছু বিশেষ কথা আছে। প্রত্যেকের প্রাণে-প্রাণে তাঁর কিছু আদেশ, কিছু ইঙ্গিত, কিছু আদর, কিছু সান্ত্বনা দিবার আছে। আজ তাঁকে সকলে খুব ভাল ক'রে ঘিরে বস্‌ব, আর তাঁর সেই বাণী শুন্‌ব।

তিনি ডাকৃচেন, "দুঃখী কে আছ, এস।" আমাদের প্রাণে এ বৎসর দুঃখ তাপ কত! প্রাণে কত বেদনা! এ সব নিয়ে চল যাই তাঁর কাছে।

আজ মা আমাদের ডাকৃচেন; আবার আজ আমাদেরও পরস্পরকে ডাকৃবার বিশেষ দিন। সকলে সকলকে প্রাণ দিয়ে প্রেম দিয়ে ডাকৃব। ব্রাহ্মসমাজের ভাই বোন্‌দের মূল্য আজ প্রাণ দিয়ে অনুভব কর্‌ব। আমরা যে এক বাড়ীর সন্তান, আমরা যে এক পিতামাতার সন্তান, তা আজ প্রাণ দিয়ে অনুভব কর্‌ব। মায়ের দয়া একসঙ্গে আস্বাদন ক'রে, সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের কত দুঃখে কত সংগ্রামে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে, আমরা যে কত বল পাই, আজ সে কথা ভাল ক'রে মনে আন্‌ব; আর প্রত্যেক ভাই বোন্‌কে পরম শ্রদ্ধায় পরম আদরে ডাকৃব। "তোমরা না হ'লে আমার উৎসব পূর্ণ হয় না, তোমরা আমার খুব কাছে এস", এই ব'লে প্রত্যেক ভাই বোন্‌কে ডাকৃব।

এস, সকলে মিলে ডাকি সর্ব্বাগ্রে সকল যুগের সকল দেশের সাধুভক্তদিগকে। ভারতবর্ষের ব্রহ্মবাদী ঋষিগণকে ডাকি। যিনি মৈত্রী-মন্ত্র দিলেন, সেই শ্রীবুদ্ধকে ডাকি। পিতার আদেশ পালনকে ধর্ম্মরাজ্যে যিনি সর্ব্বোচ্চ স্থানে তুলে ধর্‌লেন, সেই শ্রীঈশাকে ডাকি। বিশ্বাসের জ্বলন্ত মূর্ত্তি শ্রীমহম্মদকে ডাকি। ভক্তিতে বিগলিত বাংলার শ্রীচৈতন্যকে ডাকি। আর যত সাধক যোগী ভক্ত তাঁদের সাধনামৃত দিয়ে, জীবনামৃত দিয়ে, ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মধারাকে পুষ্ট ক'রেছেন, সকলকে আজ ভক্তির সঙ্গে ডাকি। ব্রাহ্মসমাজ তাঁদের উত্তরাধিকারী। তাঁরা কত আগ্রহে আমাদের পৃথিবীর এই উৎসবকে দেখেন! আমাদের মধ্যে আজ তাঁরা আসুন।

তার পর ডাকি আমাদের ব্রাহ্মসমাজের অগ্রণীদিগকে। রাজর্ষি রামমোহন, যিনি জীবনের রক্ত দিয়ে জমি প্রস্তুত ক'রে এই ব্রাহ্মসমাজের বীজ বপন ক'রে রেখে গিয়েছেন; যাঁর কথা মনে ক'রে আজ প্রাণ উথ্‌লে উঠ্‌বার কথা। ডাকি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে, যিনি মাঘোৎসবের প্রবর্ত্তক, যিনি ৯০ বৎসর পূর্ব্বে এই ১১ই মাঘের উৎসব প্রবর্ত্তিত ক'রে এ দিনটিকে আমাদের জন্য এমন পবিত্র ক'রে রেখে গিয়েছেন, যাঁর নিষ্ঠা ভক্তি ও তপস্যার উত্তাপ এই দিনের সঙ্গে মিশ্রিত হ'য়ে র'য়েছে। ডাকি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকে, যিনি অনুতাপ ও ভক্তির ধারায় নিজে গ'লে ও সকলের প্রাণকে গলিয়ে দিয়ে মাঘোৎসবকে কত অমৃতে পূর্ণ ক'রে রেখে গিয়েছেন। ডাকি ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ ও আচার্য্য শিবনাথকে, যাঁদের স্মৃতি এই মন্দিরের কত মাঘোৎসবের সঙ্গে জড়িত, যাঁদের প্রাণের ব্যাকুলতায় এই মন্দিরের আকাশ, এই মন্দিরের প্রাচীর, যেন এখনও স্পন্দিত র'য়েছে। ডাকি সাধক উমেশচন্দ্রকে, প্রেমিক নবদ্বীপচন্দ্রকে, সেবক আদিনাথকে। আরও কত ভক্ত সাধক সেবক, যাঁদের সকলের নাম উল্লেখ এখন সম্ভব নয়,—তাঁদের সকলকে আমাদের প্রাণ আজ ডাকৃচে। বিশেষ ক'রে যে দুই ভাই অল্প দিন পূর্ব্বে পরব্রহ্মের সেবাতে জীবন উৎসর্গ ক'রে পৃথিবী থেকে চ'লে গেলেন, যাঁদের স্মৃতি এবার-কার উৎসবকে বিশেষ পবিত্রতা দান ক'রেছে, তাঁদের ডাকি। তাঁরা সকলে আজ আমাদের সঙ্গী হোন্‌, আমাদের সহায় হোন্‌।

আজ অন্য অন্য কত স্থানে কত মন্দিরে আমাদের কত ভাই বোন্‌ উৎসব কর্‌চেন। কেহ কেহ বা একা প'ড়ে আছেন, কোনও মন্দিরে উপস্থিত হ'তে পারেন নি। সকলকে আজ প্রাণে প্রাণে ডাকি, সকলকে আজ হৃদয়ে গ্রহণ করি।

বিশেষ ভাবে তাঁদের ডাকি, পৃথিবীতে যাঁদের হারিয়ে আমাদের জীবনটা খালি-খালি লাগ্‌চে। স্নেহভাজন পুত্র কন্যা, জীবনপথের সঙ্গী অথবা সঙ্গিনী, পিতা মাতা, গুরু, বন্ধু, যাঁদের স্মৃতিতে প্রাণ নিত্য পরিপূর্ণ, যাঁদের জন্য হৃদয়ে বিন্দু বিন্দু স্নেহ প্রেম ভক্তি প্রতি মুহূর্ত্তে সঞ্চিত হ'য়ে হ'য়ে আজ হৃদয়-পাত্র উপ্‌ছে যাচ্ছে,—তাঁদের আজ খুব ভাল ক'রে ডাকি। আজ তাঁদের জন্য আমাদের প্রাণ বিশেষ ব্যাকুলতায় উদ্বেলিত

হ'য়ে উঠ্‌চে; আবার তাঁদের আত্মাতেও আজ আমাদের জন্য বিশেষ ব্যাকুলতার তরঙ্গ উঠ্‌চে। আজ এই বিশেষ দিনে এপার থেকে ওপারে, আবার ওপার থেকে এপারে প্রাণ হ'তে প্রাণে, ভাবস্রোত প্রেমস্রোত কত প্রবল ধারায় প্রবাহিত হ'য়ে আসা যাওয়া করুচে। পরলোকগত সেই সকল প্রিয়জনকে আজ খুব ব্যাকুল হ'য়ে ডাকি।

এবার যে রকম মন নিয়ে আমরা ১১ই মাঘের উপাসনায় বস্‌তে যাচ্চি, এমন খুব কম বার হয়। এবার আমাদের প্রাণগুলি বন্ধুবিয়োগের শোকে পূর্ণ র'য়েছে। আবার এই প্রাণ নিয়েই এ বৎসর রাজা রামমোহন রায়কে উপযুক্ত ভাবে স্মরণ করুতে হবে, তাঁর শতবার্ষিকের অনুপ্রাণন অন্তরে গ্রহণ করুতে হবে। আবার, দেশের নব নব পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের প্রতি ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তব্যও কত দ্রুতবেগে পরিবর্ত্তিত হ'য়ে যাচ্চে। তাই, এবার ব্রাহ্মসমাজকে কত নব দায়িত্ব অনুভব করুতে হবে।

ভক্তিভাজন আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় একবার ১১ই মাঘে ব'লেছিলেন, "যদি আজ কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি কাঁদ্‌তে এসেছ, না, হাস্‌তে এসেছ, তবে আমি তার উত্তরে বলি যে আমি কাঁদ্‌তে ও হাস্‌তে, দুই-ই করুতে এসেছি। আমি এক চোখে হাস্‌ব, এক চোখে কাঁদ্‌ব আজ আমাদের অবস্থাও যেন সেইরূপ। আজ দয়ালের দয়া স্মরণ ক'রে আনন্দ করুবারও দিন, আবার আজ শোকে কাঁদ্‌বারও দিন। আমরা কাঁদ্‌ব বই কি? নইলে আমাদের মনের অবস্থা তো সত্য ভাবে প্রকাশ করা হবে না। কিন্তু আমাদের র'য়ে ব'সে কাঁদ্‌বার সময় নাই। আমাদের চোখের জল মুছে আবার প্রভুর চরণে দাঁড়াতেও হবে। নব আদেশ গ্রহণ করুতেও হবে।

সংসারে প্রায়ই এমনি ঘটে। সেই পরম প্রভু যখন র'য়ে ব'সে শোক করুতে অবসর দেন না, যখন শোক অন্তরে চেপে রেখে চোখ মুছে কাজে লাগ্‌বার জন্য দাঁড়াতে হয়, তখনই সে শোক পবিত্রতর হয়। তখনই সে শোক আত্মার আত্মোৎসর্গের অঙ্গীভূত হ'য়ে ধন্য হয়। তখনই সে শোকে আত্মাকে পবিত্র বলে বলশালী করে। আমাদের শোককে আমরা আত্মার বলে পরিণত ক'রে নেব।

হে প্রভু পরমেশ্বর, আজ ভাল ক'রে দেখা দাও। আজ ভাল ক'রে আমাদের নিয়ে ব'স। দুঃখ দারিদ্র্য বেদনা অপসারিত ক'রে, সব অবসাদ নিরাশা দূরীভূত ক'রে তোমার সমুজ্জ্বল প্রকাশের মধ্যে আমাদের বসাও। এই ভাবে তোমার অর্চ্চনা বন্দনা করুবার অধিকার দাও।

"রাজেশ্বর ব্রহ্ম পরাৎপর বিরাজিত হের মহাসিংহাসনে" এই সঙ্গীতটির পর আরাধনা ও মিলিত প্রার্থনা হয়। তাহার পরে, জগতের কল্যাণের জন্য, পৃথিবীতে সকল নরনারীর মধ্যে ভ্রাতৃভাবের উদয়ের জন্য, ভারতকে দুর্নীতি কুসংস্কার ধর্ম্মহীনতা ও ভেদবুদ্ধি হইতে মুক্ত করিবার জন্য, এবং দেশের সেবাতে যাঁরা দুঃখ ও কারাবাস বরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের অন্তরে বিশ্বাস-বল সঞ্চার করিবার জন্য, সংক্ষেপে প্রার্থনা করা হয়। অনন্তর "প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ" এই সঙ্গীতের পর "আশা আনন্দ ও নব আদেশের প্রতীক্ষা" বিষয়ে উপদেশ প্রদত্ত হয়। উপদেশটি তত্ত্বকৌমুদীর বিগত সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে। সর্ব্বশেষে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া "পাদপ্রান্তে রাখ সেবকে" এই বন্দনাটি গীত হয়। উপাসনা শেষ হইবার পরও বহুক্ষণ কীর্ত্তন চলিতে থাকে। অবশেষে এই বেলার কার্য্য শেষ হয়। কিন্তু অন্য সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব, তাই মন্দির কখনও শূন্য থাকে নাই। যখন বাহিরে অনেকে প্রীতি-ভোজনাদিতে ব্যাপৃত, তখনও কেহ কেহ প্রার্থনা, ধ্যান, পাঠ ও আলোচনাদিতে নিযুক্ত থাকেন।

অনন্তর অপরাহ্ণ ১½ ঘটিকার সময় মাধ্যাহ্নিক উপাসনা। তাহাতে শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। তিনি "যাঁহার করুণা জীবন পালিছে, যাঁহার করুণা অমৃত ঢালিছে, যাঁহার করুণা নিয়ত বলিছে ল'য়ে যাব ভবসিন্ধু-পারে রে", এই সঙ্গীতাংশ অবলম্বনে অতি সংক্ষেপে উদ্বোধন করিয়া উপাসনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহার নিবেদিত উপদেশের মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

আজ বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞতা অনুভব ও প্রকাশের উৎসব। শুধু প্রথম ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার দিন স্মরণ করিয়া আমরা উৎসব করি না। দীর্ঘকাল পরে পুরাতন ব্রহ্মপূজা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়াও আমরা উৎসব করিতেছি না। আমরা যে নূতন ধর্ম্ম, উদার বিশ্বজনীন ধর্ম্ম পাইয়াছি, সাক্ষাৎ ব্রহ্মপূজার মধ্য দিয়া যে নূতন জ্ঞান, নূতন তত্ত্ব লাভ করিয়াছি, জীবনে প্রেমময়ের যে অপার করুণার নিদর্শন প্রাপ্ত হইয়াছি ও প্রেম সম্ভোগ করিয়াছি, এবং ব্রহ্মোৎসব ও ব্রহ্মোপাসনা আমাদিগকে যে অমূল্য সম্পদ্ প্রদান করিয়াছে, তাহার জন্যই আমরা বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ, তাহার জন্যই আমরা উৎসব করিতেছি। এই দিনটি আমাদের জীবনের উপর অনেক সময় যে কার্য্য করিয়াছে, তাহাতেই আমাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে ইহার বিশেষত্ব।

এবার বিশেষ ভাবে মৃত্যুর মধ্য দিয়াই আমাদিগকে উৎসবে প্রবেশ করিতে হইয়াছে। এই মৃত্যু সম্বন্ধে কি নূতন তত্ত্বই আমাদের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে! পূর্ব্বে মৃত্যু কি বিভীষিকা-ময়ই ছিল! এই মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই সকলে নিতান্ত আকাঙ্ক্ষিত ও বিশেষ ভাবে চেষ্টিত ছিল। সংসারে জন্মিলেই মরিতে হয়, মৃত্যুর হস্ত হইতে কাহারও পরিত্রাণ নাই, এই হেতুই "অপুনর্ভব" হইবার জন্য, "অমৃতত্ব" লাভের জন্য যত আকুলতা ব্যাকুলতা, কঠোর বৈরাগ্য ও তপস্যা। আমরা মৃত্যুকে মোটেই সেই চক্ষে দেখি না। আমরাও "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং", "মৃত্যো র্মামৃতং গময়" প্রভৃতি পুরাতন শাস্ত্রবাক্য ব্যবহার করি বটে, কিন্তু শাস্ত্রে যে অর্থে ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, সেই অর্থে ব্যবহার করি না। আমরা বলি—"মৃত্যু সে অমৃতের সোপান," মৃত্যু কল্যাণের হেতু, সাদরে বরণীয়। আমরা যে মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইতে

চাই তাহা শারীরিক মৃত্যু নহে, আধ্যাত্মিক মৃত্যু—জীবনস্বরূপ হইতে বিচ্যুতি। আমরা যে "অমৃতত্ব" প্রার্থনা করি, তাহা "অপুনর্ভবত্ব" নহে, তাহা অমৃতস্বরূপের সঙ্গে নিত্য যোগের জীবন। এই সংসার আমাদের নিকট কারাগার নহে, কর্ম্ম বা শাস্তিভোগের স্থান নহে, প্রেমময় পিতার শিক্ষা-নিকেতন। সুখ সম্পদ আনন্দ, দুঃখ বিপদ সংগ্রাম উভয়ই, তাঁহার স্নেহের দান, কল্যাণকর ব্যবস্থা, তুল্যরূপে আদরণীয়। আমাদের জীবন-গঠনের জন্য উভয়েরই প্রয়োজন আছে,—একের অভাবে শুধু অন্যের দ্বারা কিছুতেই প্রকৃত চরিত্র ও মনুষ্যত্ব গড়িয়া উঠিতে পারে না।

ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধেও আমরা অনেক নূতন তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছি। আমরা যে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" প্রভৃতি আরাধনা-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া উপাসনা করি, তাহাতে যে-সকল স্বরূপ ব্যক্ত হইয়াছে, অথবা পূর্ব্বে তাহা দ্বারা যাহা বুঝাইত, শুধু সে সমস্তের মধ্যেই আমরা আবদ্ধ আছি, এমন কথা কিছুতেই বলা যায় না। তাঁহাকে আমরা যেরূপ জাগ্রত জীবন্ত নিত্য ক্রিয়াশীল প্রেমময় মঙ্গলবিধাতা, প্রতি জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল ঘটনা ও অবস্থার নিয়ন্তা ও ব্যবস্থাকর্ত্তারূপে, সকলের পরিত্রাতা ও উদ্ধারকর্ত্তা, অনন্ত উন্নতি ও বিকাশের নিয়ন্তা ও চালকরূপে জানিয়াছি, তাহা যে বহু পরিমাণে নূতন, তাহার মধ্যে যে করুণাময়ের অপার করুণার নিদর্শন উজ্জ্বলভাবেই দেখিতে পাওয়া যায়, সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পরলোক সম্বন্ধে কল্পনা জল্পনাবিরহিত যে উজ্জ্বল সত্য তত্ত্ব আমরা এ পর্য্যন্ত পাইয়াছি, তাহাও অতুলনীয়। ভবিষ্যতে আরও কত নূতন সত্য ও তত্ত্ব প্রকাশিত হইবে, জানি না। কিন্তু এই ধর্ম্মের মধ্য দিয়া তিনি যে তাহার পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন, কোনও দেশে কালে, গ্রন্থে বা ব্যক্তি বিশেষে আবদ্ধ হইয়া থাকিবার পথ যে চিরতরে রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, তিনি যে প্রত্যেকের শিক্ষাদাতা গুরু ও পথপ্রদর্শকরূপে, চির সহায় ও বন্ধুরূপে সমস্ত উত্থান পতন, জয় পরাজয়ের মধ্য দিয়া প্রত্যেককে গড়িয়া তুলিতেছেন ও অগ্রসর করিতেছেন, এবং অনন্ত উন্নতির দিকে লইয়া চলিয়াছেন, তাহার জন্য আমাদের যে কিরূপ কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, তাহা কি বলিয়া শেষ করা যায়?

তিনি তাঁহার অপার কৃপায় আমাদিগকে তাঁহার পবিত্র ধর্ম্মের আশ্রয়ে আনিয়াছেন, আপনাকে আমাদের নিকট প্রকাশিত করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে পাপ মলিনতা হইতে বার বার তুলিয়া আনিতেছেন, চিরদিন দূরে পড়িয়া থাকিতে দিতেছেন না, গভীরতম অন্ধকারে ও পাপের আবর্ত্তেও আমাদিগকে কখনও পরিত্যাগ করেন নাই। সকলকেই তিনি পাপ মলিনতা হইতে মুক্ত করিয়া শুদ্ধ সুন্দর করিবার জন্যই সর্ব্বদা নিযুক্ত রহিয়াছেন,—তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছাকে ব্যর্থ করিতে পারে এমন কোনও শক্তি জগতে নাই। আমাদের যে সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা দিয়াছেন, তাহাতে আমরা কিছুকালের জন্য তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলিতে পারি বটে, কিন্তু কিছুতেই চিরকালের জন্য পারি না—তিনি যতটা যাইতে দেন, ততটাই যাইতে পারি, ঘুরিয়া ফিরিয়া অবশেষে আমাদিগকে তাঁহার পথে আসিতেই হয়, তাঁহার শরণাপন্ন হইতেই হয়, বাধ্য হইয়া তাঁহার হাতে আত্মসমর্পণ করিতেই হয়। তাঁহার অব্যর্থ ইচ্ছাই জয়যুক্ত হয়, আমাদিগকে পরাজিত হইতেই হয়। আমরা আমাদের বিদ্রোহিতা ও স্বেচ্ছাচারিতার দ্বারা আমাদের উন্নতি ও কল্যাণ অনেক দূরবর্ত্তী করিয়া ফেলি, জীবনকে নানা দুঃখ ক্লেশে জর্জ্জরিত করি, আপনাদিগকে অধঃপতিত করি, সত্য,—পাপের শাস্তি আমাদিগকে পূর্ণ মাত্রায়ই ভোগ করিতে হয়, তাহা হইতে কাহারও পরিত্রাণ নাই, সত্য,—কিন্তু সে দুঃখ ক্লেশ শাস্তি সমস্তই যে আমাদের সংশোধনের জন্য, তাহার মধ্যে যে তাঁহার প্রেম ও করুণাই কার্য্য করিতেছে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এই সমস্ত তত্ত্ব ও মহা সত্য আমরা তাঁহার কৃপায় সুনিশ্চিতরূপে সাক্ষাৎভাবে জানিয়াছি। এই আশার সুদৃঢ় ভিত্তি পাইয়াই আমরা নিশ্চিন্ত প্রাণে উৎসব করিতে সমর্থ হই।

সকলেরই পরিত্রাণ যদি সুনিশ্চিত, তবে কি আমাদের সমস্ত কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব চলিয়া গেল, কিছু করণীয় রহিল না? সাধন ভজন, চেষ্টা যত্ন, সংগ্রাম, সমস্ত অপ্রয়োজনীয় হইয়া গেল? সেরূপ আশঙ্কার কোনও কারণই নাই। পরিত্রাণ সুনিশ্চিত বটে, কিন্তু তাহা কখনও কেহ নিজকৃত প্রত্যেক পাপের শাস্তিভোগের পূর্ব্বে পাইতে পারে না; অনেক দুঃখ ক্লেশ ভোগের পর, দীর্ঘকাল অন্তেই পাওয়া যাইতে পারে। অপর দিকে, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার অনুগত হইলে, আপনাকে তাঁহার হাতে সমর্পণ করিয়া, সকল বিষয়ে তাঁহার দ্বারা চালিত হইলে, জীবন সহজে সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অল্প সময়ে দ্রুত উন্নতি ও কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে পারে। তিনি যে আমাদিগকে শুধু কতকগুলি কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব দিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছেন, তাহা নহে। তিনি সর্ব্বদা আমাদিগকে ইহা স্মরণও করাইয়া দিতেছেন,—তিনি আমাদিগকে কখনও আমাদের কর্ত্তব্য ভুলিয়া নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকিতে দেন না। সর্ব্বদাই উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকেন। দুর্ব্বলতার মধ্যে সাহায্য যেমন করেন, তেমন দুঃখ বেদনা, অনুতাপ অনুশোচনা, লাঞ্ছনা তিরস্কার প্রভৃতির কশাঘাত করিতেও ক্ষান্ত হন না।

লোকের যে সাধারণ সংস্কার আছে, ধর্ম্মের পথ কঠিন ও পাপের পথ সহজ, ইহা নিতান্তই ভ্রান্ত। যিনি শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ, পরম স্নেহময় পিতা, কল্যাণময় বিধাতা, তিনি কখনও এরূপ ব্যবস্থা করিতে পারেন না। এরূপ করিলে তিনি মানবের পরম শত্রু শয়তানই হইয়া দাঁড়ান। আমরা জীবনের অভিজ্ঞতা হইতেও জানিয়াছি, তিনি এরূপ কখনও করেন নাই। তিনি পাপের পথই কণ্টকাকীর্ণ—দুঃখময়, সংগ্রামময়—করিয়াছেন, আর পুণ্যের পথই সহজ, সুখকর, আনন্দকর করিয়াছেন—সে পথে সাহায্য করিবার জন্য সকল বিশ্বকে নিযুক্ত করিয়াছেন এবং স্বয়ংও সর্ব্বদা নিযুক্ত আছেন। তিনি চির সহায়, চির প্রসন্ন দেবতা। তাঁহার প্রসন্নতা লাভের জন্য আমাদের কিছু করিতে হয় না। যাহাতে তাঁহার ইচ্ছা আমাদের মধ্যে অব্যাহত ভাবে কার্য্য করিতে পারে, আমরা তাহাতে কোনও বাধা উৎপন্ন না করি, আমাদের

সমস্ত বিরোধিতা, ইচ্ছা অভিরুচি স্বেচ্ছাচারিতা বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহারই দ্বারা চালিত হই, সর্ব্বতোভাবে তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করি, তাহাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। এইটুকু করিলে, এ বিষয়ে সর্ব্বদা সজাগ ও সচেষ্ট থাকিলে, আর সমস্তই তিনি করিবেন। তিনিই চির আনন্দ ও কল্যাণের পথে লইয়া যাইবেন, জীবনকে চির উৎসবময় করিবেন। আমরা তাঁহার করুণার অসংখ্য পরিচয় পাইয়া কি তাঁহার হাতে আপনাদিগকে সম্পূর্ণরূপে অর্পণ না করিয়া, সর্ব্ব প্রকারে তাঁহার অনুগত জীবন যাপন করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষিত ও চেষ্টিত না হইয়া, উদাসীন ভাবে বসিয়া থাকিতে পারি, আলস্যে জীবন কাটাইতে পারি? সে পথ যে নিতান্তই কণ্টকাকীর্ণ। তিনি যে কাহাকেও দীর্ঘকাল সে ভাবে থাকিতে দেন না। তাই ভয়ের কোনও কারণ নাই। আমাদিগকে বাধ্য হইয়াই সংগ্রামে, চেষ্টা যত্নে, সাধন ভজনে নিযুক্ত হইতে হইবে।

আজ আমরা ভাল করিয়া আপনাদিগকে তাঁহার হাতে সমর্পণ করি। তিনি সকল বিষয়ে একমাত্র প্রভু ও চালক হউন। তিনি কৃপা করিয়া আমাদিগের সমস্ত ত্রুটি দুর্ব্বলতা, আলস্য উদাসীনতা, বিদ্রোহিতা স্বেচ্ছাচারিতা দূর করিয়া সম্পূর্ণ রূপে তাঁহার করিয়া লউন। তাঁহার ইচ্ছাই আমাদের প্রতি জীবনে ও সমগ্র সমাজে জয়যুক্ত হউক।

ক্রমশঃ

ব্রাহ্মসমাজ

কলিকাতা উপাসক মণ্ডলী—কলিকাতা উপাসক মণ্ডলীর ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখের বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাস সম্পাদক এবং শ্রীমতী সুরমা সেন, শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার বসু ও শ্রীযুক্ত গৌরহরি হাজরা সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন।

বিশেষ উৎসব—কলিকাতা উপাসকমণ্ডলীর বার্ষিক সভার অধিবেশন উপলক্ষে একটি বিশেষ উৎসবের আয়োজন করা হইয়াছিল। তাহা নিম্নলিখিত প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়াছে :—

২৫শে ফেব্রুয়ারী শনিবার—অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় মন্দির-প্রাঙ্গণে সামাজিক সম্মিলন। তাহাতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কুমার মিত্র প্রার্থনা ও উপাসকমণ্ডলীর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কিছু বলিলে পর, শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ ঘোষের নেতৃত্বাধীনে কয়েকটি যুবক নানা প্রকার ব্যায়াম-কৌশল ও শারীরিক শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া সকলকে বিশেষ আনন্দ প্রদান করেন। শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিলে জলযোগান্তে কার্য্য শেষ হয়।

সায়ংকালে মন্দিরে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী "নব যুগের বার্ত্তা" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন।

২৬শে ফেব্রুয়ারী রবিবার—প্রাতে উপাসনা। তাহাতে শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য এবং প্রকৃতভাবে "উপাসক মণ্ডলী গঠন" বিষয়ে কিছু নিবেদন করেন। সায়ংকালে উপাসনা। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য এবং "ব্রহ্মোপাসনার ফল" বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ১৩ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত প্রচারক গুরুদাস বাবুর পৌত্রী (পরলোকগত রণজিৎকুমার চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠা কন্যা) আরতি অল্প কয়েকদিনের জ্বরে ৭ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছে। বিগত ২৩শে ফেব্রুয়ারী তাহার আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ২১শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত শিবচন্দ্র দেব মহাশয়ের একমাত্র পৌত্র শান্তিপ্রিয় দেব বৃদ্ধা মাতা ও বহুসংখ্যক আত্মীয় স্বজনদিগকে শোকসাগরে ভাসাইয়া ৪৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি অতি ধর্ম্মপ্রাণ ও নীতিপরায়ণ লোক ছিলেন এবং দেশের ধর্ম্মহীনতা ও নীতিহীনতা দর্শনে বিশেষ ক্লেশ অনুভব করিতেন। তাঁহার গৃহে একটি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের জন্য খুবই আগ্রহান্বিত ছিলেন, শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। লেখাপড়া লইয়াই সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার লিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশ করিয়া যাইতে পারিলেন না। বিগত ২৫শে ফেব্রুয়ারী ভাগিনেয়গণ তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী শাস্ত্রপাঠ ও ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ মিত্র সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ ও প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে মাতা ও ভগিনীগণ ব্রাহ্মসমাজের নানা প্রতিষ্ঠানে ১০০০৲ সহস্র টাকা দানের প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

বিগত ১৭শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতা নগরীতে সত্যসুন্দর দেব, কনিষ্ঠা ভগ্নী শ্রীমতী বিন্দুবালা মিত্র ও ভ্রাতা শ্রীমান শিবসুন্দর দেব সহ, মাতার আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী শাস্ত্রপাঠ ও সত্যসুন্দর বাবু জীবনী পাঠ ও প্রার্থনা করেন। পৌত্রী ও দৌহিত্রীগণ ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তাহাতে শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে পুত্রকন্যাগণ যে দান করিয়াছেন তাহার বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে। পৌত্রী শ্রীমতী সান্ত্বনা দত্ত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ১৲ টাকা ও নববিধান সমাজে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

বিগত ১১ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত ক্ষীরোদচন্দ্র সিংহের পত্নী গোলাপকুমারী সিংহ পরলোক গমন করিয়াছেন। বিগত ২০শে ফেব্রুয়ারী কন্যাদ্বয় কুমারী

অনসূয়া সিংহ ও শ্রীমতী সুলতা দত্ত তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে জ্যেষ্ঠা কন্যা দরিদ্র ব্রাহ্ম বালিকাদিগের শিক্ষার সাহায্যার্থ "গোলাপকুমারী সিংহ ফাণ্ড" নামে একটি স্মৃতিভাণ্ডার স্থাপনের উদ্দেশ্যে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার হস্তে ১০০৲ টাকা এবং কনিষ্ঠা কন্যা সাধনাশ্রমে ১০৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চিরশান্তিতে রাখুন ও আত্মীয়স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

শুভবিবাহ—বিগত ১৮ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত ভূদেব চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া ইন্দিরা ও মান্দ্রাজের অন্তর্গত পিঠাপুর নিবাসী পরলোকগত আকুরতি পিচায়ার পুত্র শ্রীমান চলমায়ার শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ আচার্য্যের কার্য্য করেন। প্রেমময় পিতা নবদম্পতিকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

দীক্ষা—আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে—বিগত ৩১শে জানুয়ারী গোয়ালপাড়ার অন্তর্গত মাটিয়া গ্রামে থড়দং নিবাসী শ্রীযুক্ত মদনমোহন হেমন্ত বিশেষ উপাসনান্তে পবিত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ২রা ফেব্রুয়ারী গোয়ালপাড়ার অন্তর্গত ঠেকাসু গ্রামে উক্ত গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রাণেশ্বর বাক্, করীন্দ্রচন্দ্র রাভা, কালীচরণ রাভা, জীবনাথ রাভা, হেমচন্দ্র রাভা, শুক্রাচার্য্য রাভা, রূপনাথ রাভা ও ইন্দ্রমোহন রাভা বিশেষ উপাসনান্তে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী আচার্য্যের কার্য্য করেন।

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী গোয়ালপাড়ার অন্তর্গত দামড়া গ্রামে বিশেষ উপাসনায় বয়োবৃদ্ধ ও উৎসাহী শ্রীযুক্ত জনাকু ভকত ও তাঁহার পত্নী পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী আচার্য্যের কার্য্য করেন।

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ঠেকাসু গ্রামে শ্রীযুক্ত মহালচন্দ্র রাভা ও শ্রীমান সতীশচন্দ্র রাভা বিশেষ উপাসনান্তে পবিত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী আচার্য্যের কার্য্য করেন।

গত ৫ই ফেব্রুয়ারী গোয়ালপাড়ার অন্তর্গত মাটিয়া গ্রামের দ্বিতীয় বার্ষিক ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে উপাসনান্তে শ্রীমতী রাজেশ্বরী মোমিন (শ্রীযুক্ত শ্যামদাস কাছারীর পত্নী), শ্রীমতী রাটেশ্বরী মারাক, শ্রীযুক্ত হরিরাম মারাক, শ্রীযুক্ত দেবারু মোমিন পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন।

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী ঠেকাসু গ্রামে বিশেষ উপাসনান্তে শ্রীযুক্ত কষ্টরাম রাভা ও কৈলাসচন্দ্র রাভা পবিত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন।

এবৎসর রাভা জাতির মধ্যে ১৫ জন ও গারো জাতির মধ্যে ৪ জন ব্রাহ্ম ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। করুণাময় পরমেশ্বর ইঁহাদিগের প্রাণে নব বল দিন এবং ধর্ম্ম পথে সহায় হউন।

উৎসব—নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে গোয়ালপাড়ার অন্তর্গত মাটিয়া গ্রামে ব্রহ্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে—

২২শে মাঘ উৎসবের উদ্বোধন হয়। শ্রীযুক্ত শ্যামদাস কাছারী গারো ভাষায় উপাসনা করেন। ২৩শে মাঘ রবিবার প্রাতঃকালে উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং ৪ ব্যক্তিকে ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। অপরাহ্নে নগর-সংকীর্ত্তন হয়; শ্রীযুক্ত শিবচরণ মারাক নগর-কীর্ত্তন পরিচালনা করিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন। কীর্ত্তনান্তে উপাসনাস্থলে সকলে সমবেত হইলে, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত শ্যামদাস কাছারী ও শ্রীযুক্ত জনাকু ভকত বক্তৃতা করেন। সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী উপাসনা করেন। ২৪শে মাঘ প্রাতে শ্রীযুক্ত জাংমান মোমিন গারো ভাষায় উপাসনা করেন। অপরাহ্নে মাটিয়া গ্রামের ব্রাহ্মদিগের বিশেষ সম্মিলন হয়; তাহাতে তিনটী প্রস্তাব সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে—প্রথম—সমাজের কার্য্য ও প্রচারের জন্য একজন অনন্যকর্ম্মা লোকের প্রয়োজন এবং তাহার জন্য তাঁহারা শ্রীযুক্ত শ্যামদাস কাছারীকে উপযুক্ত বিবেচনা করেন। দ্বিতীয়—এই গ্রামের প্রত্যেক দীক্ষিত ব্রাহ্মই মাটিয়া ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইবেন, তাঁহারা প্রত্যেকে মাসিক চার পয়সা ও স্ত্রীলোকেরা মুষ্টি ভিক্ষা সমাজ পরিচালনার জন্য দান করিবেন, এবং প্রতি গৃহস্থ তাঁহার উৎপন্ন ধান্যের চল্লিশ ভাগের একভাগ প্রদান করিবেন; তাহা দ্বারা সমাজের অসমর্থ ব্যক্তিগণের ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে সাহায্য করা হইবে। তৃতীয়—এই সকল কার্য্য পরিচালনার জন্য শ্রীযুক্ত জাংমান মোমিন সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। এই উৎসব উপলক্ষে দামড়া, ঠেকাসু, ছোট মাটিয়া, দোড়কু, নলবাড়ী, নিশান গ্রাম ইত্যাদি স্থান হইতে লোকসকল আসিয়াছিল, বিশেষতঃ ছোট মাটিয়া গ্রামের ও নিকটবর্ত্তী অপর গ্রামের বহু রাভা যোগ দিয়াছিল। শ্রীযুক্ত শিবচরণ মারাক সঙ্গীতে, শ্রীযুক্ত হরলোচন রাভা খোল বাদ্যে এবং ঠেকাসুর ব্রাহ্মগণ নগর-কীর্ত্তনে সাহায্য করিয়াছেন।

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ—নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে ১০৩তম মাঘোৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় ঢাকায় গমন করিয়া উৎসবে উপাসনা ও বক্তৃতাদি করিয়াছেন।

২০শে পৌষ হইতে ২৯শে পৌষ পর্য্যন্ত ১১টি পরিবারে উৎসবের প্রস্তুতির জন্য কীর্ত্তন ও উপাসনা এবং ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণার্থ প্রার্থনা হইয়াছে। এই সকল স্থানে শ্রীযুক্ত বরদা

প্রসন্ন রায়, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী কর ও শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন।

১লা মাঘ সন্ধ্যায় মন্দিরে উৎসবের উদ্বোধন হয়। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। ২রা মাঘ প্রাতঃকালে ললিতমোহন দাস মহাশয়ের আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। সায়ংকালে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় উপাসনা করেন। ৩রা মাঘ প্রাতঃকালীন উপাসনায় শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত রামানন্দ বাবু "ভগবানের সহকর্ম্মী মানুষ" এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ৪ঠা মাঘ প্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সরকার উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় সঙ্গত সভার উৎসব উপলক্ষে সংক্ষিপ্ত উপাসনান্তে শ্রীযুক্ত মথুরানাথ গুহ, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসু, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ৫ই মাঘ প্রাতঃকালে ছাত্রসমাজের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত যোগজীবন পাল আচার্য্যের কার্য্য করেন; সায়ংকালে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় "মানুষের মূল্যবৃদ্ধি" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ৬ই মাঘ প্রাতঃকালে মহর্ষির স্মৃতি-বার্ষিকী উপলক্ষে উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন; সন্ধ্যায় একটি স্মৃতি-সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত রামানন্দ বাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায়, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র নাগ মহর্ষির জীবন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ৭ই মাঘ পূর্ব্বাহ্ণে মহিলাদিগের উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় উপাসনা করেন; তৎপরে প্রীতি-ভোজন হয়। অনন্তর মহিলাদিগের একটি সভায় পাঠ ও আলোচনা হয়; তাহাতে শ্রীযুক্ত রামানন্দ বাবু সভাপতির কার্য্য করেন। পুরুষদিগের জন্য প্রাতঃকালে ইষ্ট বেঙ্গল ইনষ্টিটিউসন হলে উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। সায়ংকালে মন্দিরে শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় উপাসনা করেন।

অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় নারায়ণগঞ্জ প্রচার-যাত্রা—শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কতিপয় বন্ধু সমভিব্যাহারে নারায়ণগঞ্জ গমন করেন এবং স্থানীয় ব্রহ্ম-মন্দিরে উপাসনা ও "ব্রাহ্মসমাজের আর প্রয়োজনীয়তা আছে কি না?" এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

৮ই মাঘ প্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত দেবকুমার দত্ত উপাসনা করেন। অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় বালকবালিকাদিগের উৎসব হয়। বালকবালিকাগণ সুন্দর সুন্দর সঙ্গীত ও আবৃত্তি প্রভৃতির দ্বারা সকলকে আনন্দিত করে। প্রায় চারি শত বালকবালিকাকে জলযোগ করান হয়। সায়ংকালে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় "ব্রাহ্মসমাজের কাজ কি ফুরাইয়াছে?" এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ৯ই মাঘ প্রাতঃকালীন উপাসনায় শ্রীযুক্ত মথুরানাথ গুহ আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় পরলোকগত ডাক্তার পি কে রায় মহাশয়ের স্মরণার্থ সভা হয়। গিরিশচন্দ্র নাগ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, এবং শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায়, শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী কর, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন প্রভৃতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সায়ংকালে উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত রামানন্দ বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন। ১০ই মাঘ প্রাতঃকালে পরলোকগত আচার্য্য নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয়ের স্মরণার্থ উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী কর আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় নগর-সংকীর্ত্তন হয়। সায়ংকালে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

১১ই মাঘ—সমস্ত দিন ব্যাপী উৎসব—অতি প্রত্যুষে ঊষা-কীর্ত্তন আরম্ভ হয়, তৎপর উপাসনা—শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত সঙ্গীত, প্রার্থনা ও পাঠ চলিতে থাকে; অনন্তর প্রীতিভোজন হয়। ২॥০ ঘটিকায় আবার উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। তৎপর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনারায়ণ দাসগুপ্ত, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত উমাচরণ সেন ও শ্রীযুক্ত দেবকুমার দত্ত পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং আলোচনা করেন। অনন্তর কীর্ত্তনান্তে সন্ধ্যায় উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। ১২ই মাঘ প্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় উপাসনা করেন। অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় ইষ্ট বেঙ্গল ইনষ্টিটিউসন-প্রাঙ্গণে দরিদ্রদিগকে চাউল, কম্বল ও পয়সা বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যায় মন্দিরে বরদা বাবু "বুদ্ধদেব" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ১৩ই মাঘ প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় উপাসনা হয়, শ্রীমতী চারুবালা সেন ও শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় যথাক্রমে আচার্য্যের কার্য্য করেন। ১৪ই মাঘ পূর্ব্বাহ্ণ ১০ ঘটিকায় পরলোকগত আনন্দমোহন দাসের গেণ্ডারিয়াস্থ উদ্যানে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন; অনন্তর প্রীতিভোজনে উৎসবের কার্য্য শেষ হয়।

কোষাধ্যক্ষ—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিগত ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখের বিশেষ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার দত্ত কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন।

ভুল সংশোধন—গোলোকবাবুর শ্রাদ্ধে দানের তালিকার মধ্যে সিটি কলেজ স্কুল হইতে উত্তীর্ণ একটি গরীব কৃতী ছাত্রকে আনন্দমোহন অথবা সিটি কলেজে অধ্যয়ন করিবার জন্য একটি বৃত্তি প্রদানের কথা উল্লিখিত হয় নাই। আর, শুধু সাধনাশ্রমের জন্য নহে, সাধনাশ্রমের কার্য্যে ও সতীশ বাবুর ইচ্ছানুরূপ ব্যয়ের জন্য ৫০৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে।

বিজ্ঞাপন

দুঃস্থ ব্রাহ্মপরিবার ফণ্ড হইতে সাহায্যপ্রার্থীরা অনুগ্রহ-পূর্ব্বক ১৫ই মার্চ্চ মধ্যে, তাঁহাদের আবেদনপত্র, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মহাশয়ের নিকট পাঠাইবেন।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাগ কর্ত্তৃক ২০শে ফাল্গুন মুদ্রিত ও প্রকাশিত।—সম্পাদক শ্রীবরদাকান্ত বসু, বি-এ

Registered No. 65

অসতো মা সদগময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫৫ ভাগ
২৩শ সংখ্যা।

১লা চৈত্র, বুধবার ১৩৩৯, ১৮৫৪ শক,
ব্রাহ্মসংবৎ ১০৪
15th March, 1933.

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০
অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে প্রেমস্বরূপ, তুমি তোমার অসীম প্রেমে এই বিশ্বসংসার রচনা করিয়াছ,—তোমার প্রেমের এক কণা দিয়া আমাদের সকলকে গড়িয়াছ। তাই প্রেমের জগত এত সুন্দর ও মধুময় হইয়াছে, আমাদের গৃহ পরিবার মণ্ডলী সমাজ এত আনন্দ ও কল্যাণের নিকেতন হইয়াছে। তোমার এই প্রেমে তুমি সকলকে একই সূত্রে গ্রথিত করিয়া পরস্পরের সহায়তায় নিযুক্ত করিয়াছ, পরস্পরের জন্য আপনার ক্ষুদ্র সুখ স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া, দুঃখ ক্লেশ বহন করিয়াও জীবনকে মহত্বের পথে অগ্রসর করিবার ব্যবস্থা করিয়াছ। তুমি প্রেমের চিরপ্রস্রবণরূপে অন্তরে থাকিয়া যদি জীবনকে সরস ও মধুর করিবার জন্য সর্ব্বদা নিযুক্ত না থাকিতে, তাহা হইলে গৃহ পরিবার সংসার সমস্তই নিতান্ত শুষ্ক মরুসদৃশ হইয়া যাইত, ক্ষুদ্র সুখ স্বার্থের দ্বন্দ্বে সমস্ত ছারখার হইয়া যাইত, শুধু অশেষ দুঃখ বেদনারই লীলা-নিকেতন হইয়া উঠিত। আমরা নিতান্ত মোহগ্রস্ত হইয়াই তোমার এই প্রেমের পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া, আপনার ক্ষুদ্র সুখ স্বার্থে ডুবিয়া থাকিতে চাই; কিন্তু কিছুতেই তাহার মধ্যে আনন্দ সুখ কল্যাণ লাভ করিতে না পারিয়া, আমাদিগকে অবশেষে তোমার প্রেমের হাতে অর্পণ করিতেই হয়। হে করুণাময় পিতা, তুমি কৃপা করিয়া আমাদের সকলকে এই মোহ হইতে সর্ব্বদা মুক্ত রাখ, এবং নিয়ত তোমার প্রেমের পথে চলিতে সমর্থ কর। আমাদের ত্রুটি দুর্ব্বলতা তুমি সমস্তই জান। তুমি ভিন্ন আর কে আমাদিগকে সে সকল হইতে মুক্ত করিবে? তুমিই সর্ব্বদা প্রেমের পথে আমাদিগকে চালিত কর, শুধু আমাদের গৃহ পরিবার নয়, আমাদের মণ্ডলী এবং সমাজও তোমার প্রেমের লীলা-নিকেতন হউক, সমস্ত জগতে আমাদের প্রেম প্রসারিত হউক।

ত্র্যধিক-শততম মাঘোৎসব

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১১ই মাঘ (২৪শে জানুয়ারী) মঙ্গলবার—

মাধ্যাহ্নিক উপাসনা শেষ হইলে পরে, শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন ও শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অনন্তর ৪ ঘটিকার সময় পুনরায় ইংরেজীতে উপাসনা হয়। তাহাতে শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্মানুবাদ পরে প্রকাশিত হইবে।

ইহার পর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন চলিতে থাকে। অবশেষে সায়ংকালীন উপাসনা। তাহাতে পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ আচার্য্যের কার্য্য করেন। তিনি খ্রীষ্টীয় ঋষি পল ও যোহনের প্রেমমাহাত্ম্য সম্বন্ধীয় উক্তি পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া উদ্বোধন করেন এবং আরাধনান্তে নিম্নলিখিত মর্ম্মে উপদেশ দেন:—

ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে আপনারা 'ভক্তির আন্দোলন' নামে একটি ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাইবেন। সেই আন্দোলন আরম্ভ হয় ১৮৬৭ সালে। আমি বাল্যকালে ১৮৬৮ সালে কিছুদিন ঢাকা নগরীতে ছিলাম; তখন প্রথমে এই আন্দোলনের প্রভাব অনুভব করি। তখন বুঝিবার শক্তি অল্পই ছিল, তথাপি জীবনে ইহার কিছু ফল ফলিয়াছিল। এমন কি তখন ধর্ম্মজীবনের যে উচ্চ আদর্শ পাইয়াছিলাম তাহাই পরবর্ত্তী সমগ্র জীবনকে নিয়মিত করিয়াছে। তখন দেখিতাম, সমাজে প্রতি রবিবারেই উপাসনার সময় ক্রন্দনের রোল উঠিত, উৎসবের সময় তো কথাই নাই। তখনই কেশবচন্দ্রকে প্রথম দেখি। তিনি ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া ঢাকায় একটি উৎসব করিতে গিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রের উপাসনা ও উপদেশ এবং ত্রৈলোক্যনাথের সঙ্গীত একত্র হইলে কিরূপ ভাবের উচ্ছ্বাস উঠিত তাহা বোধ হয়

আপনাদের কাহারো কাহারো স্মৃতিতে এখনও জাগিতেছে। আমার বিশেষ সৌভাগ্য হইয়াছিল তখন কেশবচন্দ্রের নিজমুখ হইতে তাঁহার ধর্মজীবনারম্ভের কথা শোনা। যাহা হউক, সেই ভক্তি-আন্দোলনের লক্ষণের কথা বলি। তখন উপাসনার সময় যে ভাবোচ্ছ্বাস উঠিত তাহাতে দুটী বস্তু দেখা যাইত,—(১) পাপের জন্য অনুতাপ, (২) ঈশ্বরের সান্নিধ্য ও প্রেমবোধ। এই দুটীর মধ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আছে। ঈশ্বরের সান্নিধ্য ও প্রেমবোধ হইতেই অনুতাপ জন্মে। যেখানে এই বোধ কিছুমাত্র নাই সেখানে অনুতাপ ও প্রার্থনার উদয় হয় না। আবার, অকৃত্রিম ও গভীর অনুতাপই ঈশ্বরের সান্নিধ্য ও প্রেমবোধকে উজ্জ্বল করে। যাহা হউক, ঢাকার সমাজে উপাসনাকালে যে ভাবোচ্ছ্বাস অভ্যস্ত হইয়াছিল তাহা লইয়া শ্রীহট্টে গেলাম। সেখানে ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্ম কয়েকটী ছিলেন; কিন্তু তাঁহারা ভক্তি-আন্দোলনের প্রভাব অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। শুষ্ক স্থানে থাকিয়া আমার ভাবোচ্ছ্বাস শুষ্ক বা শুষ্কপ্রায় হইয়া গেল। ১৮৭১ সালে কলিকাতায় আসিয়া ভক্তি-আন্দোলনের অবশিষ্ট পাইলাম। তখন যে প্রতি রবিবার সমাজে ভাবের উচ্ছ্বাস উঠিত তাহা নহে। কিন্তু উৎসবগুলি,—মাঘোৎসব ও ভাদ্রোৎসব,—খুব ভাবপূর্ণ হইত। তখন কেশবচন্দ্রের উপাসনা ও উপদেশ এবং ত্রৈলোক্যনাথের সঙ্গীতে সমাজে প্রবল ভাবের ঢেউ উঠিত। কেশবচন্দ্রের উপদেশের প্রধান উপাদান ছিল ঈশ্বরের নৈকট্য ও বাস্তু প্রেমের বর্ণনা। এই বর্ণনা এমন মর্ম্মস্পর্শী হইত যে, শ্রোতারা কাঁদিয়া আকুল হইতেন। ক্রন্দনের কারণ এই চিন্তা,—যিনি আমার এত কাছে এবং আমাকে এত ভালবাসেন, আমি তাঁহাকে ভালবাসিতে পারি না, বরঞ্চ তাঁহাকে উপেক্ষা করি। এই কান্না কেবল অনুতাপের কান্না নহে, ইহাতে প্রকৃত ভক্তির অংশও কতক পরিমাণে আছে। তখন উৎসবের ফল উৎসবের পরেও অনেক দিন থাকিত, এবং কতক পরিমাণে কার্য্যগত জীবনকে নিয়মিত করিত। ফলতঃ তখন যে ভক্তিময় জীবনের আদর্শ পাইলাম সেই আদর্শ আমার পরবর্ত্তী সমগ্র জীবনকে নিয়মিত করিয়াছে। সেই আলোকে ভক্তিহীন জীবন অসার বলিয়া বোধ হইয়াছে। নানা ধর্ম্মের আলোচনা করিয়া যে ধর্ম্মকে ভক্তিহীন বলিয়া দেখিয়াছি, সেই ধর্ম্মকে ধর্ম্মনামের অনুপযুক্ত বোধ হইয়াছে। যাহা হউক, এই যে সেই সময়ের ভক্তিপ্রধান ধর্ম্ম, তাহার মূলান্বেষণ করিয়া দেখিলাম তাহার দুটী উপকরণ,—(১) বিশ্বাস,—মানবপ্রকৃতিনিহিত মৌলিক বিশ্বাস, যাহা পরম্পরাগত চলিত সংস্কারদ্বারা বহুল পরিমাণে পরিপুষ্ট। (২) উচ্চ ভাবানুভূতির প্রবৃত্তি, যাহা নেতাদের ভাবময় জীবনের দৃষ্টান্তদ্বারা পরিপুষ্ট হইত। পরবর্ত্তী সময়ে এই দুটী উপাদানেরই অভাববশতঃ ধর্ম্মের গ্লানি হইতে লাগিল। এই গ্লানি আমি নিজ জীবনের দৃষ্টান্ত এবং সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞতা, উভয় প্রকারেই বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছি। যত দিন মানুষের স্বাভাবিক ও পরম্পরাগত বিশ্বাস অটল থাকে, তত দিন মানুষ ব্রহ্মজ্ঞানলাভের আবশ্যকতা বোধ করে না, এবং তাহার ভক্তি-আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা প্রবল থাকিলে ভক্তিসাধনও অবাধে চলিতে থাকে। আমার বাল্য ও কিশোর বয়সের সরল বিশ্বাস শীঘ্রই টলিয়া গেল; কিন্তু বিশ্বাস টলিবার পুর্ব্বে যে ভক্তির আস্বাদন পাইয়াছিলাম তাহাতে আমার সাধনের আগ্রহ অটুট রহিল। হারাণ বিশ্বাস পুনরায় লাভ করিয়া আবার ভক্তির আস্বাদন পাইবার চেষ্টা প্রবল হইল। এখন অনেক যুবক-যুবতীরই বিশ্বাস টলিয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে বিশ্বাস ফিরাইয়া পাইবার চেষ্টা দেখিতে পাই না। অনেকের হাতে ব্রহ্মজ্ঞান-প্রতিপাদক পুস্তক তুলিয়া দিয়াছি, তাহারা সে পুস্তক উপেক্ষার সহিত ফেলিয়া রাখে। ইহার কারণ, তাহারা সরল বিশ্বাসের অবস্থায় উপাসনার আস্বাদন পায় নাই, কার্য্যতঃ ধর্ম্মহীন ভাবে জীবন কাটাইয়াছে। সুতরাং বিশ্বাস হারাইয়া যে কত বড় বস্তু তাহারা হারাইয়াছে তার বোধ তাহাদের নাই। যাহা হউক, আমি বিশ্বাস হারাইয়া এবং কিছু দিন কৃত্রিম উপায়ে বিশ্বাস পুনঃপ্রাপ্ত হইবার চেষ্টা করিয়া শীঘ্রই বুঝিলাম জ্ঞান ব্যতীত সন্দেহ নিরাকৃত হইতে পারে না, টলান বিশ্বাস পুনরায় অটল হইতে পারে না। তখন শুনিতাম বিশ্বাস স্বাভাবিক, কিন্তু এই কথায় আমার তৃপ্তি হইত না। দেখিলাম চিরপ্রচলিত কুসংস্কার হইতে স্বাভাবিক বিশ্বাসের প্রভেদ বুঝিতে হইলেও জ্ঞানলাভ আবশ্যক। একাধিক ব্রাহ্ম নেতার নিকট জ্ঞানলাভে সাহায্য চাহিলাম, কিন্তু পাইলাম না। দেখিলাম তাঁহারা জ্ঞানলাভের আবশ্যকতা, এমন কি সম্ভবনীয়তাও স্পষ্টরূপে স্বীকার করেন না। বিনা সাহায্যেই, কেবল পুস্তকের সাহায্য লইয়া, দীর্ঘ ও ব্যাকুল অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম এবং প্রধানতঃ পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের সহায়তায় অবশেষে একটী সন্তোষকর দার্শনিক তন্ত্রে—systemএ—উপনীত হইলাম। এই সিদ্ধান্ত কেবল সিদ্ধান্ত নহে, পরোক্ষ বিচারমাত্র নহে, ইহা আমাকে একবারে ঈশ্বরের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল। ইহাতে প্রত্যক্ষ উপাসনা ও ভাবসাধন সুগম করিয়া দিল। আরো দেখিলাম এই সিদ্ধান্ত আমাদের দেশের বেদান্তসিদ্ধান্তের অনুরূপ। ইহা দেখিয়া বিশেষরূপে বেদান্তশাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম এবং তদ্দ্বারা সাধনবিষয়ে প্রভূত উপকার লাভ করিলাম। এই আলোচনায় দেখিলাম বেদান্ত মতের দুটী প্রধান শাখা, (১) নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদ এবং (২) বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। আচার্য্য শঙ্কর প্রথম শাখার এবং আচার্য্য রামানুজ দ্বিতীয় শাখার প্রধান ব্যাখ্যাতা। তখন বুঝিলাম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কেবল প্রথম শাখার সহিতই পরিচিত ছিলেন এবং সেই জন্যই বেদান্তমতকে ব্রাহ্মধর্ম্মবিরোধী বলিয়া বর্জ্জন করিয়াছিলেন। আমি যে ভাবে বেদান্ত বুঝিলাম, তাহাতে এরূপ বর্জ্জনের কোন প্রয়োজন দেখিলাম না। যাহা হউক, ব্রাহ্মসমাজে বৈষ্ণবভাবের পক্ষপাতিত্ব দেখিয়া আমি বিশেষভাবে বৈষ্ণবশাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম এবং তদ্দ্বারাও বিশেষ উপকৃত হইলাম। এস্থলেও দেখিলাম ব্রাহ্ম নেতাদের মনোযোগ বৈষ্ণব ধর্ম্মের একটী বিশেষ

শাখাতে অবদ্ধ থাকাতে বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে। বৈষ্ণব ধর্ম্মের সকল শাখাই অল্পাধিক পৌরাণিক, কিন্তু যে শাখার সহিত ব্রাহ্ম নেতারা বিশেষভাবে পরিচিত, অর্থাৎ গৌড়ীয় শাখা, সেটী বিশেষভাবে পৌরাণিক এবং অন্ধ বিশ্বাসের একান্ত পক্ষপাতী। রামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্য সেরূপ নহেন; তাঁহারা দার্শনিক এবং বেদান্তের পক্ষপাতী। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য জীবগোস্বামী বেদান্তকে সম্মান করিয়াও 'ভাগবত'কে সর্ব্ব শাস্ত্রের উপরে স্থান দিয়াছেন, কিন্তু 'ভাগবতে'র দার্শনিক মত গ্রহণ করেন নাই। 'ভাগবত'কার ভক্তির একান্ত পক্ষপাতী হইয়াও দার্শনিক মতে সম্পূর্ণ মায়াবাদী। আমি দেখিলাম বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ভক্তিধর্ম্মের প্রকৃত ভিত্তি স্থাপন করিতে পারেন নাই। আরো দেখিলাম স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি ধর্ম্মনেতাগণ, যাঁহারা প্রাচীন ধর্ম্মের পুনরুজ্জীবনকার্য্যে ব্যস্ত, তাঁহারা কেহই কোন দার্শনিক তত্ত্ব স্থাপন করিতে চেষ্টা করেন নাই; সকলেই প্রাচীন শাস্ত্র এবং মতের অন্ধানুসরণ করিতেছেন। ইহাতে ব্রাহ্মসমাজের দায়িত্ব আরো গভীররূপে উপলব্ধি করিলাম। বুঝিলাম যে আমাদের জ্ঞান-প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধনাদর্শ প্রত্যক্ষ ও সরস উপাসনা। নিজেরা এরূপ উপাসনার আস্বাদন না পাইলে এবং অন্যকে তাহা দিতে না পারিলে, জাতীয় জীবনে ব্রাহ্মধর্ম্ম স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে না। এই আদর্শ প্রচার করিতে যাইয়া দেখি, ইহার প্রধান বাধা চারিদিক্‌কার অনাধ্যাত্মিক হাওয়া, ধর্ম্মসাধনে ঔদাস্য। এই ঔদাস্য যুবক-যুবতীতে আবদ্ধ নহে, প্রবীণেরাও অনেকে সাধনবিহীন। বিশেষতঃ সাধনের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইতে তাঁহারা একান্ত অনিচ্ছুক। প্রবীণদের এই ঔদাস্যই যুবক-যুবতীর ঔদাস্যের প্রধান কারণ। যে হাওয়ায় তাহারা জন্মগ্রহণ করে ও বর্দ্ধিত হয়, তার প্রভাব অতিক্রম করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। তাহারা আমাদের জীবন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করে। আমরা জীবনে ধর্ম্মকে কতটুকু স্থান দিই, আর ধন মান ও উচ্চ পদকেই বা কত মূল্য দিই, তাহা তাহারা আমাদের দৈনন্দিন জীবন এবং বিবাহাদি সামাজিক অনুষ্ঠানাদি দেখিয়া বিশেষরূপে বুঝিতে পারে। ধর্ম্মের উচ্চতম বিষয়গুলি সম্বন্ধে যে আমাদের মধ্যে একতা ও সহযোগিতা নাই, তাহা তাহাদের অজ্ঞাত নহে। ধর্ম্মজগতে যত গভীর ও ব্যাপক কার্য্য হইয়াছে সমুদায়ই গভীর সাধনশীলতা ও জমাট সঙ্ঘবদ্ধতাদ্বারা হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজে ইহার দৃষ্টান্ত স্বচক্ষে দেখিয়াছি। চারিদিক্‌কার ধর্ম্মহীনতা ও ঔদাস্যের প্রতিকার করিতে হইলে আমাদিগকে এই কয়েকটী উপায় অবলম্বন করিতে হইবে :—

১। অন্ধবিশ্বাসে তৃপ্ত না থাকিয়া গভীর জ্ঞানচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হওয়া।

২। প্রাচীন অভিজ্ঞতার ভাণ্ডাররূপ শাস্ত্রের, বিশেষ ভাবে দেশীয় শাস্ত্রের, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা।

৩। ব্যক্তিগত জীবনে জীবন্ত সাধনশীলতা।

৪। সামাজিক জীবনে সঙ্ঘবদ্ধতা, চিন্তা ও ভাবের বিনিময় —পরস্পরকে আধ্যাত্মিক সাহায্যদান।

সর্ব্বশেষে কিছু সময় কীর্ত্তন হইলে পর, অদ্যকার উৎসব শেষ হয়। যথোচিত প্রণাম আলিঙ্গনাদি করিয়া সকলে গৃহে গমন করেন।

১২ই মাঘ (২৫শে জানুয়ারী) বুধবার—

প্রাতে সাধনাশ্রমের উৎসব। সাধনাশ্রমের উপাসনালয় হইতে কয়েক জন "ব্রহ্মনাম বদনেতে বল অবিরাম" কীর্ত্তনটি গান করিতে করিতে মন্দির প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক মন্দিরে প্রবেশ করেন। কিছুক্ষণ কীর্ত্তনের পর উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কাজ করেন। ধর্ম্ম মধুময়,—ইহাই অদ্যকার উপাসনার বিশেষ ভাব ছিল।

উদ্বোধনে সতীশ বাবু প্রথমতঃ সাধনাশ্রমের পরলোকগত পরিচারক ও সেবকগণকে স্মরণ করেন। সাধনাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ভক্তিভাজন শাস্ত্রী মহাশয়, এবং নবদ্বীপচন্দ্র, মহেন্দ্রনাথ, আদিনাথ, ইন্দুভূষণ, প্রকাশ দেব, সুন্দর সিংহ, অবিনাশচন্দ্র, চঞ্চলা দেবী, গুরুদাস, কাশীচন্দ্র, হরিমোহন, জয়শঙ্কর, কেদার নাথ; অল্প দিন পূর্ব্বে গোবিন্দ পিলে নামক যে স্নেহভাজন শিক্ষার্থী পরলোকে চলিয়া গেলেন; সাধনাশ্রমের বিশ্বাসী অক্লান্তকর্ম্মা তেজস্বী সেবক হেমচন্দ্র, যিনি পৃথিবীর জীবনের শেষ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের সেবায় আপনাকে নিযুক্ত রাখিয়া সেদিন অমরধামে চলিয়া গেলেন; বন্ধু ললিতমোহন, যাঁহার বিমল বন্ধুতায় ও সাহায্যে সাধনাশ্রম কত উপকৃত;—ইঁহাদিগকে স্মরণ করা হয়। যাঁহারা রোগ অথবা কার্য্যবশতঃ এবার কলিকাতায় মাঘোৎসবে আসিতে পারেন নাই, তাঁহাদিগকে স্মরণ করা হয়।

তৎপরে সতীশ বাবু বলেন,—সাধনাশ্রম ভগবানের কৃপায় মধুময় ধর্ম্মবন্ধুতার একটি বিশেষ ক্ষেত্র। শুধু ইহার অন্তর্গত পরিচারকগণকে লইয়া নহে, কিন্তু আরও অনেকগুলি মানুষকে লইয়া ইহার ধর্ম্মপরিবার। তাঁহাদের সকলের প্রীতির ও ধর্ম্মবন্ধুতার বেষ্টনের মধ্যে আমরা বাস করি। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বা সাধনাশ্রমের ছায়াতে থাকিয়া নিজেরা তৃপ্ত হইতেছেন; কেহ কেহ নিজ ভালবাসার দ্বারা ইহাকে তৃপ্ত রাখিতেছেন; আবার অনেকে নিজ নিজ সেবার দ্বারা ইহাকে বলশালী করিতেছেন। ভগবান্ দয়া করিয়া তাঁর দাসদের যত কিছু দান করিয়াছেন, তার মধ্যে এই ধর্ম্মবন্ধুতা সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ সম্পদ্। আজ ভক্তি প্রীতি ও কৃতজ্ঞতাভরে তাঁহাদের সকলকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া উপাসনায় বসিব।

ইহার পর সতীশ বাবু সংক্ষেপে বর্ত্তমান বর্ষের ১৭ জন পরিচারকের কর্ম্মক্ষেত্রের বিষয়ে, এবং বেরস অঞ্চলের দুইজন কর্ম্মীর বিষয়ে উল্লেখ করেন।

দ্বিতীয় সঙ্গীতের পর আরাধনা। আরাধনার কতক কতক অংশ অনুলিখিত হওয়াতে আমরা তাহা প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলাম।

আরাধনা।

হে সত্যস্বরূপ, ধর্ম্মরাজ্যের ব্যাপারসকল কেমন সত্য, কেমন অমৃতময়! মানুষ প্রথমতঃ তোমা হ'তে কত দূরে দূরে বিচরণ

করে। সেই সুদূরেও কেমন ক'রে তোমার একটি গূঢ় প্রেরণা তার অন্তরে প্রবেশ করে। দূর থেকে সে ক্রমে তোমার কাছে আসে। ক্রমে সে তোমার দরোজায় দাঁড়িয়ে যোড়-করে অপেক্ষা করে, কবে তুমি তাকাবে, কবে তুমি তাকে ডাক্‌বে। তোমার একটু ইঙ্গিত পেলেই তার কি আনন্দ! "আমি গৃহীত, আমি দাসত্বের জন্য আহূত",—মানব-অন্তরে এ কি অপূর্ব্ব অনুভূতি! মানুষের এ কি সৌভাগ্য!

তেম্‌নি আবার একদিন তোমার ধর্ম্মমণ্ডলীর কাছে, তোমার সেবকমণ্ডলীর কাছে এসে অপেক্ষা করেছিলাম, কত দিনে তোমার ভক্তেরা আমাকে গ্রহণ করবেন! মনে হ'য়েছিল, আমি এ সাধনাশ্রমের দরোজার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই অপেক্ষা করব; দেখি, কত দিনে তাঁরা আমার দিকে চক্ষু তুলে তাকান্। শেষে যখন ডাক্‌লেন, একটু আদেশ পেলাম, মনে হ'ল জীবন সার্থক হ'ল! মনে হ'ল আরও বেশী কেন চাইলেন না? মনে হ'ল দেহ মনের সমুদয় শক্তি নিঃশেষে উজাড় ক'রে ঢেলে দিতে পারলেই বুঝি তৃপ্ত হ'তাম। ক্রমে যে তাঁদের কাছে বস্‌তে পেলাম, ক্রমে যে তাঁদের ভালবাসা পেলাম, তাঁদের আপনার লোক হ'লাম, অন্তরঙ্গ মানুষ হ'লাম,—এ সব তোমার কি অপূর্ব্ব লীলা! এ কি অমৃতময় অনুভূতি!

হে পরম দেব, তোমার কাছে অথবা তোমার ভক্তদলের কাছে যখন প্রতীক্ষার ভাবে দাঁড়িয়ে থাকি, সে প্রতীক্ষার অবস্থাও কত মিষ্টি! আবার যখন চক্ষে চক্ষে মিলন হয়, তাও কত মিষ্টি! আহ্বান লাভও কত মিষ্টি! আদেশ পালনের অধিকারও কত মিষ্টি!

হে চিন্ময়, এ কি জড়ের রাজ্যে আমরা চলি, বলি, পা ফেলি? না, তোমার সত্তাসাগরে, তোমার অরূপ চিন্ময় পুরে? এ বিশ্বের সবই তো তোমার প্রকাশ, সবই তো তুমি। উষার ও সন্ধ্যার আকাশ যে তোমারি প্রেমের ছবি! যে নিশ্বাসবায়ু দেহে প্রবেশ করে, তাও যে চিন্ময়, তাও যে তুমিই! যে রক্তস্রোত দেহে প্রবাহিত হয়, তাও যে চিন্ময়, তাও যে তুমিই! আমার সর্ব্বাঙ্গ ধন্য, হস্তপদ ধন্য, অস্থিমাংস মস্তিষ্ক স্নায়ু ধন্য,—এরা যে তোমার প্রেমালিঙ্গন লাভ করে! আকাশ পৃথিবী ধন্য,—এদের বেষ্টন যে তোমারি বেষ্টন! ··· ইহলোক ও পরলোক, দুইই তুমি; দুইই চিন্ময়।

হে অনন্ত, আমাকে তোমার কত কি দিবার আছে! কত জ্ঞান, কত প্রেম, কত পুণ্য; দৃষ্টির কত প্রসার, হৃদয়ের কত বিস্তার, আকাঙ্ক্ষার কত উচ্চতা; তোমার কত স্পর্শ, কত আদর! ··· তোমার দিবার যত কিছু আছে, তা কি কখনও ফুরাতে পারে? ভক্ত তো ঠিকই ব'লেছেন, "অনন্ত হ'য়েছ, ভালই ক'রেছ"! তোমার অফুরন্ত ভাণ্ডার; এক জীবনে আমি আর কত নিতে পারব? তুমি তোমার রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ দিয়ে, পৃথিবীর জ্ঞান প্রেম দিয়ে, তোমার আদেশ দিয়ে, আমার জন্য তোমার নিজ হাতে রচিত কর্ত্তব্যসকল দিয়ে, এ জীবনে আমাকে কত বিকশিত কর্‌লে! আবার তোমার মধুময় ধর্ম্মরাজ্যে নিয়ে এসে, যুগযুগান্তরের কত ভক্তদের সঙ্গে পরিচিত ক'রে দিয়ে, আমার জীবনকে কত প্রসারিত কর্‌লে! তাঁদের আমি চিন্‌লাম, তাঁরা আমায় চিন্‌লেন। তাঁদের ডাক শুন্‌লাম, তাঁদের স্নেহ-স্পর্শ লাভ কর্‌লাম। অনন্ত এই আত্মার লোকে, অনন্ত এই সঙ্গ-লোকে, এখন চারিদিকে কত আপনার জন! চারিদিকে আমার জন্য কত দৃষ্টি, কত ডাক, কত আদর, কত সান্ত্বনা! "হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত জন, আমার কাছে এস, আমি তোমাকে বিশ্রাম দান করব",—এই কথা তুমি আগে আমার প্রাণের ভিতরে ব'লেছিলে; পরে দেখি, অমর লোক হ'তে তোমার ভক্তও আমাকে ঐ কথা ব'লে ডাক্‌চেন। তাঁর সে ডাক কি মধুময়, কি স্নিগ্ধ! তোমার স্নিগ্ধ দৃষ্টি, ভক্তের স্নিগ্ধ দৃষ্টি, দুইই আমাকে অন্বেষণ করে, দুইই কত মিষ্টি! এম্‌নি কত ডাক, কত বাণী, এ অমরলোকে! ... সংখ্যা নাই, শেষ নাই। তোমার সঙ্গে ও তাঁদের সঙ্গে যুগ যুগান্তরে কত নব নব জীবনে আনন্দে জীবিত থাকব, আনন্দে পথ চল্‌ব!

হে আনন্দময়, একা তোমার কাছে ব'সে তোমার ভালবাসার গাঢ় আলিঙ্গনের মধ্যে যখন ডুবে যাই, যখন ঊর্দ্ধে আকাশ হ'তে নিম্নে পৃথিবী পর্য্যন্ত সবই তোমার প্রেমস্পর্শে পরিণত হ'য়ে গিয়ে আমাকে বেষ্টন করে, তখন তুমি কত মধুময়! যখন প্রভাতের আলো তোমার চুম্বনের মত ললাটকে স্পর্শ করে, প্রবাহিত বায়ু তোমার আদরের মত হ'য়ে অঙ্গে লাগে, তখন তুমি কত মধুময়! আবার, ভক্তসঙ্গে তোমার সঙ্গ যখন আস্বাদন করি, ভক্তকে তুমি আদর করচ, ভক্ত প্রেমে গ'লে তোমাকে প্রাণ সমর্পণ করচেন, এ দৃশ্য দে'খে দে'খে যখন হৃদয় উথ্‌লে ওঠে, তখন তুমি কত মধুময়! আবার, আমার মত' পাপী দুঃখীদের তুমি যখন কাছে ডেকে নিয়ে অশ্রু মোছাও, তখন তুমি কত মধুময়! জীবনের দুঃখ বেদনা তিক্ততাকে, শোক ও সংগ্রামকে, যখন তুমি ধীরে ধীরে রূপান্তরিত ক'রে আনন্দে পরিণত ক'রে দাও, তখন তুমি কত মধুময়! ফলকে রবির কিরণের স্পর্শে ধীরে ধীরে পরিপক্ক ক'রে তুমি তার অম্ল কটু কষায় রসকে মিষ্টরসে পরিণত কর; তেম্‌নি আমাদের জীবনকে তোমার প্রেমস্পর্শে ধীরে ধীরে বিকশিত ক'রে, অতীতের দুঃখ শোক সংগ্রামকে তোমার মধুময় প্রেমানুভূতিতে পরিণত কর। এমন কি, মানব-জীবনের তীব্রতম দুঃখ যে পাপের জন্য অনুতাপ, তাহাকেও তুমি রূপান্তরিত ক'রে তোমার দয়ার আস্বাদনে পরিণত ক'রে দাও। আমাদের জীবনের গভীরতম সুখ ও দুঃখ, উভয়ের দিকে চেয়ে বলি, তুমি আনন্দময়!

হে অমৃত, তোমাকে যখন ভুলি, তখনি আমাদিগকে মৃত্যুর অধীন ব'লে ভুল করি। তোমার মধ্যে তো মৃত্যু কোথাও রাখ নাই! তোমার ঐ প্রসারিত কোল আমাদের জন্য এমন এক স্থান, যেখানে দেহী ও অদেহী সকলকে একভাবে দেখ্‌তে পাই। মৃত্যুকে অতিক্রম ক'রে তাঁদের কাছে আমাদের প্রাণের কথা যায়, তাঁদের কথা আমাদের প্রাণে নেমে আসে। তুমিই তো উভয় লোকের যোগসূত্র। তোমার এক কোলে যে ইহ-পরলোক পাশাপাশি! এক সময়ে বল্‌তাম, ইহ-পরলোকের

মাঝের পর্দাটি ক্রমশঃ স্বচ্ছ হ'য়ে যাচ্ছে। এখন দেখি যে কোন পর্দা নাই, কোন আড়াল নাই। "এ-লোক সে-লোক উদয় এ-লোকে।" এখানেই তো পরলোক! তোমার কোলই তো পরলোক! তুমি অমৃতস্বরূপ।

হে প্রেমময়, কত দিন এমন হয় যে তোমাকে 'সত্যম্' ব'লে সম্বোধন ক'রে, তোমাকে তাবৎ সত্তার পরম সত্তা ব'লে চিন্তা ক'রে, তোমার উপাসনা আরম্ভ কর্তে চেষ্টা করি; কিন্তু আরম্ভই কর্তে পারি না। ভিতরে ভিতরে মনটা অস্থির হ'য়ে ওঠে। অধীর মন বলে, আগে তোমায় মা ব'লে ডাকব, আগে তোমার মাতৃমুখ দেখ্‌ব, আগে তোমার স্নেহ-দৃষ্টিটি লাভ কর্‌ব,—তার পরে তোমার অন্য রূপ অন্য স্বরূপ দেখ্‌ব। মন বলে, হে ঠাকুর, স্তুতি কর্তে যেটুকু দূরতার প্রয়োজন হয়, তার মধ্যে একটু পরে যাব; তোমার গাঢ় স্পর্শটি আগে আমায় দিয়ে লও! মন বলে, আগে দেখ্‌ব তোমার প্রেমরূপটি; পরে তোমার আর সব স্বরূপকে সেই প্রেমের রঙে রঙ্গিয়ে নিয়ে দেখ্‌ব। হে প্রেমস্বরূপ, তুমিও কি ঠিক তাই নও? তুমিও কি তোমার প্রেমরূপটি তোমার অন্য সব স্বরূপের অগ্রেই রাখ নি? তোমার অন্য সব স্বরূপের সঙ্গে মিশিয়ে মাখিয়ে রাখ নি? তাই তো ক'রেছ! তুমি যখন স্রষ্টা, তখনই তো তুমি প্রেমময় স্রষ্টা। তুমি যখন বিশ্বরাজ, তখনই তো তুমি প্রেমময় বিশ্বরাজ। তোমার স্বরূপের ভিতরে আগে প্রেম, তার পরে আর সব। তুমি আগে মা, তার পরে আর সব। তুমি যদি মা না হ'তে তবে তোমার সৃষ্টির কি প্রয়োজন হ'ত? তবে তোমার শাশ্বত স্বরূপের শুভ্র তুষার বিগলিত হ'য়ে, মধুময় লীলা-ধারায় প্রবাহিত হ'য়ে, আস্‌ত কি ক'রে? তোমায় আমরা পেতাম কি ক'রে? ধর্ম্মজগৎটা তো তোমার ও আমাদের প্রেমের আদান প্রদানেই পরিপূর্ণ। তুমি হাস' আমাদের ভালবেসে, আমাদের দিকে চেয়ে; আমরা হাসি তোমাকে ভালবেসে, তোমার দিকে চেয়ে; আবার আমরা পরস্পরকে ভালবাসি, তোমার দিকে ও পরস্পরের দিকে, উভয় দিকে চেয়ে; আমরা আমাদের সেই ভালবাসার উপরে তোমার প্রেমহাসিটি দেখ্‌তে পাই। তোমার এই প্রেমলীলায় ধর্ম্মরাজ্য অমৃতময়।

তুমি এক, অদ্বিতীয়। যখন তুমি তোমার একজন দুঃখী সন্তানের চক্ষু মুছিয়ে দাও, তখনই আমরা সবাই তোমার সে সান্ত্বনার অংশী হই। যখন তুমি তোমার একজন ভক্তকে চুম্বন ক'রে তাঁকে আনন্দোজ্জ্বল ক'রে দাও, তখনই আমরা সবাই তোমার সে আদরের অংশী হই। এম্‌নি ক'রেই তো তোমার ধর্ম্মবিধান নেমে আসে; একের মধ্য দিয়ে সহস্রকে তুমি আলো দাও, বল দাও, সান্ত্বনা দাও, তৃপ্তি দাও। এম্‌নি ক'রেই তো তোমার সাধকমণ্ডলী গ'ড়ে ওঠে; এক জনের প্রাণের নিবেদন সকলেরই নিবেদন হ'য়ে যায়। তাল বাড়ীতে যেমন সব ভাই বোন্ পরস্পরকে দেখিয়ে দেখিয়ে মায়ের প্রসাদ খায়, আমাদের এই ব্রাহ্মসমাজ-বাড়ীতে, আমাদের এই সাধনাশ্রম-বাড়ীতে, আমরা পরস্পরকে দেখিয়ে দেখিয়ে, পরস্পরকে অংশ দিয়ে দিয়ে, তোমার প্রসাদ আস্বাদন করি।

হে পুণ্যময়, হে পরমসুন্দর, তুমি আমাদের শুদ্ধ কর, আবার তুমিই আমাদের বিকশিত কর। অনুতাপে তুমি আমাদের কি-কান্নাই কাঁদাও! এমন কান্না সংসার কাঁদাতে পারে না। সংসার দুঃখ দেয়, আঘাত দেয়, মৃত্যুশোক মৃত্যু-যাতনা দেয়; তার জন্যও চোখের জল পড়ে বটে। কিন্তু সংসার আমাদের সে-কান্না কাঁদাতে পারে না, অপরাধের জন্য তোমার চরণে প'ড়ে প'ড়ে যে-কান্না কাঁদি, আবার ভাই বোন্‌দের কাছে ব'সে ব'সে যে-কান্না কাঁদি; হৃদয়ের কালিমা তোমাকে দেখাই, তাঁদের দেখাই, আর কাঁদি। এই সাধনাশ্রমে সে-কান্না কত কেঁদেছি! সে কি পবিত্র অশ্রুজল! চিত্তকে পবিত্র ক'রেছে, হৃদয়কে নম্র ক'রেছে, অন্তরের দলরাশিকে ধৌত ক'রে সতেজ ক'রেছে।

তুমি শুদ্ধও কর, আবার তুমি তোমার সুকোমল স্পর্শে জীবনকে বিকশিতও কর। ফুলের কলিটিকে তোমার কি-সুকোমল স্পর্শে তুমি বিকশিত কর! আমাদের অন্তরে যে তোমার স্পর্শ, তা আরও কত মৃদু, আরও কত সুকোমল! ফুলের কলিটি কি জান্‌তে পারে যে তার অন্তরে মধুবিন্দু আস্‌বে? অথবা, কখন্ সে মধুবিন্দু এল? আমরা কি জান্‌তাম যে আমাদের এই কঠোর মলিন অন্তরেও প্রেম ফুটবে? এই কঠোর শুষ্ক জীবনেও প্রেমের কোমলতা প্রেমের আনন্দ আস্‌বে? একটি ভক্তিবিন্দু আস্‌বে? ... আহা! ভক্তদের মুখে তোমার সৌন্দর্য্যের কি-আভা, কি-ঝলক! তাঁরা যেন তোমার হাতে ভাল-ফোটা পদ্ম ফুল, গোলাপ ফুল। সে সৌন্দর্য্য দে'খে প্রাণ মুগ্ধ হ'য়ে যায়, সে শোভা সংসারসুখ ভুলিয়ে দেয়। তোমার ধর্ম্মরাজ্য কি-সুন্দর, কি-উজ্জ্বল, কি-সুধাময়! ... নীরবে ক্ষণকাল তোমার প্রেমময় অমৃতময় আলিঙ্গনের মধ্যে মগ্ন হই।

সাধারণ প্রার্থনার পর তৃতীয় সঙ্গীত "আহা কি করুণা তোমার, মা ব'লে যে চিনেছি গো" গীত হয়। তৎপরে নিম্নলিখিত মর্ম্মে উপদেশ প্রদত্ত হয়।

ধর্ম্মের মধুকোষ।

কাল ১১ই মাঘে আপনাদের কাছে আমি নিবেদন ক'রেছি যে, পৃথিবীর সকল ধর্ম্মের ন্যায় ব্রাহ্মধর্ম্মকেও দুই ভূমি থেকে দেখা প্রয়োজন। তন্মধ্যে প্রথম ভূমি থেকে দেখ্‌বার বিষয়,—যে-দেশে ও যে-যুগে ইহার জন্ম, তাহা হ'তে উত্থিত কর্ত্তব্য ও দায়িত্বসকল। দ্বিতীয় ভূমি থেকে দেখ্‌বার বিষয়,—ইহার নিত্য ও শাশ্বত ভাবসকল। দেশ ও কাল হ'তে উত্থিত কর্ত্তব্যের দিকটিকেই কাল প্রাধান্য দিতে হ'য়েছিল। আসুন, আজ আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের নিত্য ও শাশ্বত ভাবের, বিশেষতঃ তার অন্তরতম অংশের বিষয়ে একটু প্রসঙ্গ করি।

কাল্ নিবেদন ক'রেছি, ব্রহ্মজ্ঞান বিস্তার করা, মানুষকে ব্রহ্মচরণে টেনে আনা, প্রলোভনের সময়ে মানুষের অন্তরে বল সঞ্চার করা, মানুষের জীবনের লক্ষ্যকে উন্নত ক'রে দেওয়া, প্রভৃতি, ধর্ম্মের নিত্য ও শাশ্বত কার্য্য। কিন্তু, ধর্ম্মের এই

সকল নিত্য ও শাশ্বত প্রকাশের অন্তরতম অংশে কি থাকে? এ সকলের দ্বারা যে-সাধনগৃহ রচিত হয়, তার অন্তঃপুরে কি থাকে? এ সকলের দ্বারা ধর্ম্মজীবনের যে-পুষ্প বিকশিত হয়, তার নিভৃততম কোষে কি থাকে? সাধনাশ্রমের ভাই বোন্, ব্রাহ্মসমাজের ভাই বোন্, আসুন আজ আমরা এই পবিত্র প্রসঙ্গে ক্ষণকাল যাপন করি।

ব্রাহ্মধর্ম্ম মধুময়।

মানুষের গৃহের অন্তঃপুরই গৃহের মধুরতম অংশ। সেখানে মানুষে মানুষে কত মধুময় সম্বন্ধ, এবং সে সকল সম্বন্ধের কত মধুময় প্রকাশ দেখ্‌তে পাওয়া যায়! সেখানে কত স্নিগ্ধ দৃষ্টি, কত মৃদু স্পর্শ! ক্ষণিকের আলোর ঝলকের মত' কত প্রেমের-দৃষ্টি-বিনিময়; আবার, পরস্পরের কাছে আজীবনের বিশ্বস্ততা-নিবেদনের কত উক্তি, কত ইঙ্গিত!

পুষ্পের পত্র-বেষ্টনীটি সুন্দর, বৃন্তটি সুন্দর, দলগুলি সুন্দর। তার পরাগ-কেশর সুন্দর, তার পরাগ সুন্দর। কিন্তু এ সকলের চেয়েও সুন্দর তার সেই নিভৃত মধুকোষ, যেখানে পুষ্পজীবনের অমৃত সঞ্চিত হয়; যেখানে তরুদেহের তাবৎ কষায় কটু রসের মধ্য হ'তে একটু ক্ষুদ্রতম সারাংশ বিধাতার নিগূঢ় স্পর্শে এক বিন্দু মধুতে পরিণত হ'য়ে অপেক্ষা করে।

তেম্‌নি ধর্ম্মসাধনে ও ধর্ম্মজীবনে, জ্ঞান আছে, ভাব আছে; তপস্যা আছে, সঙ্কল্প আছে; কঠোর প্রতিজ্ঞা আছে, অনুতাপ আছে। সারা জীবনে কত কর্ত্তব্য, কত দায়িত্ব, কত সংগ্রাম আছে; কত সুখের স্পন্দন, কত দুঃখের বেদনা আছে। আমরা যে সারাজীবন এ সকলের মধ্য দিয়ে চলি, আমরা যে সারাজীবনে এ সকলের পথ দিয়ে জীবন-দেবতার কত বিচিত্র স্পর্শ লাভ করি, তার ফলে, সারা জীবন ধ'রে আত্মার অন্তরতম অংশে, আনন্দময় অন্তঃপুরে, কি-লীলা কি-মধুময় ব্যাপার সঞ্চিত হ'তে থাকে? ধর্ম্মজীবনের নিভৃত মধুকোষে কি-মধু সঞ্চিত হ'তে থাকে?

ভাই বোন্, আমি কি তা জানি? আমি কি এ প্রসঙ্গ করবার যোগ্য? তবে কেন এ প্রগল্‌ভতা, কেন এ স্পর্দ্ধা? তার কারণ এই,—আমার মন আজ এ কথা বল্‌বার জন্য বড়ই ব্যাকুল হ'য়েছে যে, আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম পরম মধুময়, পরম অমৃতময়।

আমাদের জীবন দে'খে, আমাদের আচরণ দে'খে, এমন কি এই উৎসবের মধ্যেও আমাদের আচরণ দে'খে, আমাদের উক্তি শুনে,—মানুষেরা যদি এইরূপ বুঝে চ'লে যায় যে আমাদের ধর্ম্মটা অতি শুষ্ক অতি নীরস, এবং মানুষেরা যদি সেজন্য এ ধর্ম্মকে হৃদয় হ'তে দূরে রেখে দেয় বা অবজ্ঞা করে, তবে যে আমাদের ঘোর অপরাধ হবে! যে-ব্রহ্ম মধুময়, যে-ব্রাহ্মধর্ম্ম মধুময়, তাকে কি আমরা আমাদের জীবনের দ্বারা রসহীন ব'লে, স্বাদহীন ব'লে লোকের কাছে প্রকাশ করব? তাতে যে আমাদের ঘোর অপরাধ হবে!

এজন্য এস, ব্রাহ্ম ভাই বোন্, সাধনাশ্রমের ভাই বোন্, আজ একবার ভাল ক'রে সাক্ষ্য দি যে আমাদের ধর্ম্ম বড় মিষ্ট!

সাধক হাফিজের একটি উক্তি বড় চমৎকার। বোধ হয় কেহ তাঁকে ব'লেছিল যে, "তুমি কেবল তোমার সখার সৌন্দর্য্য ও মনোহারিত্বের কথাই কেন বল? ধর্ম্মরাজ্যে কি আর কিছু নাই? ঐ বস্তুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আরও কত বস্তু তো ধর্ম্মরাজ্যে রয়েছে!" হাফিজ তার উত্তরে ব'লেছিলেন,—

আঁ কি মী গোয়ন্দ্ আঁ বেহ্‌তর্ অজ্ হুসন্,
য়ারে মা ইঁ দারদ্ ও আঁ নীজ হম্।

অর্থাৎ, "যদি কেহ বলেন যে সৌন্দর্য্যের চেয়েও শ্রেষ্ঠ অমুক বস্তু আছে, তবে আমি বল্‌ব যে আমার সখাতে সে শ্রেষ্ঠ বস্তুটিও আছে, কিন্তু তার সঙ্গে তাঁহাতে সৌন্দর্য্যও আছে।" তেম্‌নি ক'রে বল্‌তে ইচ্ছা হয়, ভাই বোন্, "ব্রাহ্মধর্ম্মকে দেশের মধ্যে ধর্ম্মতত্ত্বের বিমল জ্যোতি বিকীর্ণ করতে হ'য়েছে বটে; ভ্রম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে নিজ দৃঢ় মূর্ত্তিটি প্রকাশ করতে হ'য়েছে বটে; মনুষ্যত্ব, বীরত্ব, বিবেকানুগত্য, কঠোর শুচিতা ও সংযমের আদর্শ নিয়ে দাঁড়াতে হ'য়েছে বটে। কিন্তু ধর্ম্মরাজ্যে যেখানে যত মাধুর্য্য প্রকাশিত হ'য়েছে, তাও আমার সখাতে, আমার প্রভুতে, আমার ব্রাহ্মধর্ম্মে আছে।" অপর কোনও ধর্ম্মের মানুষ এসে যদি আমাদের কাছে বলে, "দেখ দেখি, আমাদের ধর্ম্মে কত সুন্দর ও মধুময় তত্ত্ব র'য়েছে, কত মধুময় উপলব্ধি র'য়েছে; তোমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মে তা কই?" তবে আমাদের সমগ্র প্রাণ মন অম্‌নি ব'লে ওঠে, "ও যে আমারই সখার সৌন্দর্য্য! ও যে আমারই ধর্ম্মের অনুভূতি! ও-সবই যে আমার!" হাফিজের মত' ভাষায় আমাদের প্রাণ ব'লে ওঠে, "সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য ছাড়া আর যত কিছু, তা তো আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মে আছেই; কিন্তু ধর্ম্মরাজ্যের যত সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য, তাও আমাদের ধর্ম্মে পূর্ণমাত্রায় আছে।" আমাদের মনের কথা এইরূপ। এ জন্যই তো ভক্তবাণীতে ম'জে আমরা এত তৃপ্তি পাই। ও-বস্তু যে আমাদেরই! এই জন্যই তো, শ্রদ্ধেয় বন্ধু ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় যে-সকল অমৃতময় ভক্তবাণী আবিষ্কার করছেন ও পরিবেশন করছেন, তার জন্য আমাদের চিত্ত এত ক্ষুধিত এত তৃষিত হ'য়ে অপেক্ষা করে। সেই সব ভক্তের যত বিমল মধুর উক্তি ও নিবেদন,—সব যে আমাদেরই!

ঐ মধুময় বস্তু আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধনগৃহের অন্তঃপুরে নিয়ে যাব। সেখানে আমাদের প্রিয় পরমেশ্বরকে সেই সব ভাব ও ভাষা দিয়ে প্রেম নিবেদন করব। সংসারে যে-সব বাড়ীতে ভালবাসার স্রোতগুলি সতেজে প্রবাহিত আছে, শুকিয়ে যায় নি, সেখানে নিত্যই এই ব্যাপার দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এমন বাড়ীতে পতি পত্নী ভাবেন যে কি-প্রণালীতে পরস্পরকে প্রণয় নিবেদন ক'রবেন; তা ভাল ক'রে শিখ্‌তে তাঁদের ইচ্ছা হয়। যাঁরা বেশী ভাল প্রণয়ী, বেশী গাঢ় প্রণয়ী, এমন দম্পতির কাছ থেকে প্রণয়-নিবেদনের ভাষা ও ইঙ্গিত শিখে নিতে তাঁদের ইচ্ছা হয়। যে-বাড়ীতে মাকে ছেলে মেয়েরা খুব ভালবাসে, আবার মা-ও ছেলে মেয়েদের খুব আদর করেন, এমন বাড়ী থেকে আদরের কথাগুলি শিখে এসে নিজেদের বাড়ীতে তা প্রচলিত করতে ইচ্ছা হয়। আমার ছোট বেলার একটি ঘটনা মনে আছে।

আমার মা আমাকে খুব আদর ক'র্‌তেন। এক দিন অন্য এক বাড়ীতে গিয়ে শুন্‌লাম, একটি ছেলেকে তার মা "আমার যাদুমণি" ব'লে আদর ক'র্‌চেন। আমার মনে হ'ল, আমার মা তো কখনও এ কথাটি ব'লে আমায় আদর করেন নি। তখনি ছুটে এসে মাকে বল্‌লাম, "মা, আমাকে একবার 'আমার যাদুমণি' ব'লে আদর কর তো!" প্রেমরাজ্যের এই ধারা। ধর্ম্মরাজ্যেরও এই ধারা। যার হৃদয়ে প্রেম আছে, তাকে প্রেমের ভাষা, প্রেম নিবেদন, শিখ্‌তেই হয়। এই শিক্ষায় যাঁরা গুরু, যাঁদের প্রেম-ভক্তি খুব গাঢ়, সেই সব ভক্তেরা আমাদের কেমন আপনার! ধর্ম্মরাজ্যে এমন আপনার জন আর কে আছে? তাঁদের সব মধুময় অনুভূতি, তাঁদের সব মধুময় নিবেদন, আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধনগৃহের অন্তঃপুরে নিয়ে যেতে হবে।

কি ক'রে ব্রাহ্মসমাজের সাধনের অন্তঃপুরটি খুব মিষ্ট হয়, কি ক'রে ব্রাহ্মসমাজের সাধনের মধুকোষে ভাল মধু সঞ্চয় হয়, তার জন্য আমার মন বড়ই ব্যাকুল হ'চ্চে। তাই বলি, ভাই বোন্, আজ আমার স্পর্দ্ধা ক্ষমা ক'রো। ঐ ব্যাকুলতার বশে, যোগ্য না হ'য়েও যে আজ আমি এ বিষয়ে কথা বল্‌চি, আমার এ অপরাধ ক্ষমা ক'রো।

ধর্ম্মের অন্তঃপুর।

ধর্ম্মরাজ্যে যতই বাহির হ'তে ভিতরের দিকে যাত্রা করা যায়, যতই অন্তঃপুরের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, ততই যেন অনুভব কর্‌তে পারা যায় যে, অন্তরতম স্থানে ধর্ম্ম কত মধুময়। কয়েকটি তুলনার সাহায্যে এ কথাটি বোঝ্‌বার চেষ্টা করি।

পূজনীয় আচার্য্য শিবনাথ একটি দৃষ্টান্ত ব্যবহার কর্‌তেন। একজন বাঙ্গালী যুবক পশ্চিমের একটি সহরে গিয়ে একজন সদাশয় মানুষের বাড়ীতে অতিথি হ'লেন। তিনি প্রথম কয়েক দিন অতিথির জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরখানিতে বাস কর্‌তে লাগ্‌লেন; সেই ঘর থেকেই তিনি লক্ষ্য কর্‌তে লাগ্‌লেন যে বাড়ীর লোকগুলির স্নান আহার বিশ্রামাদির সময় কিরূপ, রীতি কিরূপ; এবং আপনার সব কাজে তিনি সেই দৈনিক কার্য্যপদ্ধতি ও রীতি অনুসরণ ক'রে চল্‌বার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লেন। তার পর ক্রমশঃ পরিচয় একটু বেশী হ'লে, তিনি গৃহস্বামীর বস্‌বার ঘরে এসে বসতে লাগ্‌লেন। সেখানে গৃহস্বামী বন্ধুদের সঙ্গে মন খুলে আলাপ কর্‌তেন; তাই সেখানে ব'সে ও সেই আলাপে যোগ দিয়ে দিয়ে ক্রমশঃ তিনি বাড়ীর মানুষগুলির স্বভাব ও তাদের রুচি-অরুচি সব বুঝে নিলেন। সেখানে ব'সে তিনি জান্‌তে পার্‌লেন যে সে-বাড়ীর কর্ত্তাটি শৃঙ্খলাপ্রিয়, এবং পরোপকারশীল; বাড়ীর সব মানুষগুলি কাব্যামোদী, সঙ্গীতপ্রিয়, স্বদেশভক্ত। তার পর কয়েক দিন গেলে আরও একটু ঘনিষ্ঠতা বাড়্‌ল। তখন বাড়ীর ছোট ছেলে মেয়েরা তাঁকে বল্‌তে লাগ্‌ল, "তুমি আমাদের মার কাছে চল না! আমাদের মা বড় ভাল।" তারা তাঁকে টেনে ভিতর-বাড়ীতে নিয়ে গেল। যেখানে ব'সে মা রান্না করেন, ছেলে মেয়েদের আদর করেন, যেখানে বাবা মা ও ছেলেমেয়েরা একত্র হ'য়ে মনের কথা বলেন, সেই অন্তঃপুরে সেই যুবকের গতিবিধি হ'ল। সেখানে গিয়ে তিনি জান্‌তে পেলেন যে, বাড়ীর একটি বয়স্ক ছেলে শিক্ষার জন্য বিলাতে রয়েছে। তার কথা বল্‌তে বল্‌তে বাবা মার চোখ স্নেহ ও আশার আলোকে প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। সেখানে গিয়ে তিনি জান্‌তে পেলেন যে, বাড়ীর একটি মেয়ে কিছু দিন আগে মারা যায়। ঐ ছেলেটি সেই বোন্‌কে বড় ভালবাস্‌ত। বোন্‌টির মৃত্যুতে সে এতই শোকে আকুল হ'য়েছিল যে তার সম্মুখে সেই কন্যার প্রসঙ্গ উত্থাপন করাই যেত না। বাড়ী ছেড়ে রওনা হবার দিন সেই ছেলেটি মায়ের কাঁধে মাথা রেখে নীরবে আকুল হ'য়ে বড়ই কেঁদেছিল। কেউ তাকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করে নি; কিন্তু সকলেই বুঝে নিয়েছিল যে সেই হারানো বোন্‌কে মনে ক'রে সে এত কাঁদ্‌চে। এই বর্ণনা কর্‌তে কর্‌তে বাবা মার চক্ষু আবার অশ্রুভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠ্‌ল।—বিদেশে এই বাড়ীর অন্তঃপুরের এই সকল দৃশ্য, এই সকল স্নেহের প্রকাশ দে'খে দে'খে সেই যুবকের মনে নিজের বাড়ীর ও নিজের বাবা মার স্নেহের ছবি জেগে উঠ্‌ল। তিনি ভাব্‌তে লাগ্‌লেন, সব বাড়ীতেই অন্তঃপুরের ভাবটি দেখি ঠিক এক রকম। তাঁর ইচ্ছা হ'তে লাগ্‌ল যে, আমিও এঁদের পুত্রস্থানীয় হ'য়ে এঁদের এই মধুময় স্নেহের অংশী হই।

এই কাহিনীতে বর্ণিত যুবকটি প্রথম অবস্থায় সেই পরিবারের দৈনিক কার্য্যপ্রণালী লক্ষ্য করলেন; তার পর তাদের রুচি ও প্রকৃতির পরিচয় পেলেন; এবং সর্ব্বশেষে অন্তঃপুরে গিয়ে পিতা মাতা ও সন্তানদের ভালবাসার মধুময় দৃশ্যসকল দেখ্‌লেন। ধর্ম্মরাজ্যেও ইহার অনুরূপ ব্যাপার আছে। ধর্ম্মরাজ্যেও বাহির হ'তে ভিতরের দিকে যাবার তিনটি স্তর আছে।

যে-কোনও ধর্ম্মের সহিত পরিচিত হ'তে যাও, যে কোনও ধর্ম্মকে সাধন কর্‌তে যাও, প্রথমেই চোখে পড়্‌বে তার বাহিরের অঙ্গ,—তার মত ও বিশ্বাস, তার অনুষ্ঠানপ্রণালী, তার পূজা অর্চ্চনার প্রণালী, প্রভৃতি। তার চেয়ে একটু ভিতরে গেলে দেখা যায়, প্রত্যেক ধর্ম্মেরই কিছু না কিছু বিশেষ ভাব আছে। কোন্ বস্তুকে প্রাধান্য দিতে হবে, কোন্ বস্তুকে অপ্রধান স্থানে রাখ্‌তে হবে, এ বিষয়ে একটু বিশেষ ঝোঁক আছে। যে-দেশে, যে-যুগে, যে মানুষদের মধ্যে সে-ধর্ম্মের অভ্যুদয় হ'য়েছে, তার উপযোগী হবার জন্য যে সে-ধর্ম্মকে কিছু বিশেষ কর্ত্তব্যসমষ্টি ও বিশেষ বার্ত্তা নিয়ে অবতীর্ণ হ'তে হয়, এ কথা আগেই বলেছি। সেই কর্ত্তব্যসমষ্টি ও বার্ত্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হ'য়ে, সেই ধর্ম্মে একটি বিশেষ mood, একটি বিশেষ spirit, একটি বিশেষ স্বভাব বিদ্যমান থাকে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, বুদ্ধদেব যে উদারতা ও মৈত্রীর সমাচার প্রচার করেছিলেন, তার মূল তো তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের উপনিষদেই ছিল। শুধু সেটুকুই কি বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষত্ব? তা কখনও নয়। কিন্তু তাঁর সময়ে মানুষের ধর্ম্মকর্ম্মকে বৈদিক যাগযজ্ঞের আড়ম্বর হ'তে ও পুরোহিতগণের একাধিপত্য হ'তে মুক্ত ক'রে দেওয়া বড়ই প্রয়োজন হ'য়েছিল। তাই তখন

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান ঝোঁকটি হ'ল এই দুই বিষয়ে,—(১) ধর্ম্ম যাগযজ্ঞে নয়, ধর্ম্ম শীলে অর্থাৎ চরিত্রে; এবং (২) এই শীলের সাধনের জন্য ব্রাহ্মণ পুরোহিতের কোনও প্রয়োজন নাই। তাই, সে যুগে বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ স্বভাবটি হ'য়েছিল, ব্রাহ্মণের প্রতি বিদ্রোহ এবং ধর্ম্মে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য। বুদ্ধদেব যদি কেবল কতকগুলি সাধনপ্রণালী শিক্ষা দিতেন, ঐ দুই বিষয়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রতিবাদ করবার জন্য এবং মানুষের মনে দৃঢ়তা সঞ্চার করবার জন্য না দাঁড়াতেন, তা হ'লে এ দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের স্বতন্ত্র অস্তিত্বই সম্ভব হ'ত না। তেমনি, ব্রাহ্মধর্ম্ম অভ্যুদিত হ'য়েছেন মূর্ত্তিপূজায় জাতিভেদে অবতারবাদে অভ্রান্ত গুরুবাদে জর্জ্জরিত ও শতধা খণ্ডিত ভারতবর্ষে, এবং উনবিংশ শতাব্দীতে। তাই, ব্রাহ্মধর্ম্ম কেবল নিরাকারবাদ ও ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষা দিতে আসেন নাই; সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার মন্ত্রও ললাটে নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা যেন ব্রাহ্মধর্ম্মের নিঃশ্বাস-বায়ু। তেমনি, মত সাধন ও বিশ্বাস যাহাই হউক না কেন, ভক্তি দীনতা মাধুর্য্য সহিষ্ণুতা প্রভৃতিই ছিল বৈষ্ণবধর্ম্মের বিশেষ স্বভাব।—প্রত্যেক ধর্ম্মে যে একটি বিশেষ স্বভাব, একটি বিশেষ ঝোঁক থাকে, তার এই কয়টি দৃষ্টান্ত আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করলাম।

কিন্তু প্রত্যেক ধর্ম্মে এই স্বভাব অপেক্ষা আরও অন্তরতর একটি অংশ আছে। সেই অন্তরতম অংশে, সেই অন্তঃপুরে, কি থাকে? সেখানে কি দেখা যায়, কি শোনা যায়?—ভিতর বাড়ীর খবর যেমন সব পরিবারেই এক রকম, ধর্ম্মের অন্তঃপুরের খবরও তেমনি সব ধর্ম্মেই এক রকম। তা কি খবর?—মায়ের প্রাণ সন্তানের জন্য কেমন ব্যাকুল হয়, সেই খবর। যে-সন্তান কাছে রয়েছে তার জন্য মায়ের ব্যাকুলতার প্রকাশটি কেমন, আর যে-সন্তান দূরে গিয়েছে, তার জন্য মায়ের ব্যাকুলতার প্রকাশটি কেমন, এই সব দৃশ্য। যে ধরা দিয়েছে, তাকে পেয়ে মায়ের মনটা কেমন সুখী, আর, যে ধরা দিচ্চে না, তাকে কোলে টেনে আনবার জন্য মায়ের মনটা কেমন অস্থির, এই খবর। মায়ের ভালবাসার, মায়ের ব্যাকুলতারই নানা ছবি। তারই নানা ইতিহাস, তারই নানা উচ্ছ্বাস, তারই নানা তরঙ্গ, তারই নানা লীলা, তারই নানা কীর্ত্তি। আবার, আর এক দিকে, মায়ের জন্য সন্তানের ভক্তি ভালবাসার, মায়ের চরণে সন্তানের আনুগত্যের ও আত্মসমর্পণের কত বিচিত্র আকার, কত বিচিত্র প্রকাশ, কত বিচিত্র ভাষা!

যে-কোনও ধর্ম্মকে দেখ, দেখবে তার অন্তঃপুরে এই মধুময় দৃশ্য, এই মধুময় কাহিনী। তা এম্নি মধুর যে মনকে তা তৎক্ষণাৎ মুগ্ধ করে। সেই যুবকটির ইচ্ছা হচ্চিল যে এঁদের বাড়ীর ছেলে হ'য়ে যাই, এই বাপ-মার স্নেহের অংশী হই। তেম্নি আমাদেরও হয়। পৃথিবীর যে-কোনও দেশে, যে-কোনও যুগে, যে-কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায়ে, সেই পরম জননী কোনও ভক্তকে বা কোনও দুঃখী তাপীকে তাঁর স্নেহধারায় সিক্ত করচেন, এই দৃশ্য দেখলেই আমাদের ইচ্ছা হয়, আমরাও ঐ অমৃতের অংশী হই।

উপাসনার অন্তরতম কোষ; মাতৃস্তন্য পান।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রধান সাধন যে উপাসনা, তার প্রকৃত স্বরূপটি কিরূপ? শাস্ত্রবাক্য শুনি, শ্রবণ (অর্থাৎ অধ্যয়ন) অপেক্ষা মনন গভীরতর; আবার মনন অপেক্ষা নিদিধ্যাসন (অর্থাৎ ধ্যান) গভীরতর। কিছু পরিমাণে সেই ধারা অনুসরণ ক'রে বলা যায়, উপাসনায় বাক্যের স্তর অপেক্ষা চিন্তার স্তর গভীরতর, আবার চিন্তার স্তর অপেক্ষা নীরব অনুভূতির স্তর গভীরতর। তাহাই অন্তরতম স্তর।

এই অন্তরতম স্তরে কি হয়? সেই নীরব অনুভূতি কি রকমের ব্যাপার?—কত ভাবে ইহা বলতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু বলা যায় না। 'নীরবে পরম জননীর স্নেহের মধ্যে আপনাকে ফেলে রাখা; নীরবে সেই স্নেহ-বেষ্টন আত্মার সর্ব্বাঙ্গে লাগানো; সুশীতল জলে খানিকক্ষণ অবগাহন করলে ক্রমে যেমন শরীরের সমুদয় মলিনতা ও সমুদয় তাপ চ'লে যায়, সেই ভাবে পরম-জননীর স্নেহ-সলিলে অবগাহন ক'রে, দেহ মন স্নায়ু ও মেজাজ পর্য্যন্ত শীতল ক'রে লওয়া",—ইত্যাদি কত ভাবে কত ভাষায়, এই নীরব অনুভূতির বর্ণনা ক'রতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু কোনও বর্ণনাই তো উপযুক্ত ভাবে তাকে প্রকাশ করতে পারে না। কারণ, এই শ্রেণীর যত বর্ণনা, সবই তো আমার দিক থেকে। কিন্তু উপাসনার সেই অন্তরতম স্তরে কি কেবল উপাসকই কিছু করেন? দেবতা কি নিশ্চেষ্ট থাকেন? তা কখনই নয়। "উপাসনা" তো এক জনের ক্রিয়া নয়; দেবতা ও উপাসক উভয়ের ক্রিয়া; উভয়ের জন্য উভয়ের কিছু কাজ।

উপাসনার সেই অন্তরতম পুরে কি ব্যাপার হয়? দেবতাই বা কি করেন? সাধকই বা কি করেন? দুজনে মিলে কি হয়? সে ব্যাপারের বিশ্লেষণ হয় না, বর্ণনা সম্ভবে না। কেবল একটি তুলনা আমার খুব ভাল লাগে। সেইটি বলি।

ছোট একটি শিশু; তার খুব জ্বর হ'য়েছে, গা একেবারে পুড়ে যাচ্চে। রোগের যাতনায় শিশু অস্থির হ'য়ে কাঁদতে লাগল। গায়ে হাত বুলিয়ে, বাতাস ক'রে, কেউ তাকে শান্ত করতে পারচে না। মা এলেন, শিশুকে বুকে ধরলেন, শিশুর মুখে নিজের স্তন্য পুরে দিলেন। তখন তার কান্না থামল। তখনই কি শিশুর জ্বরটাও ক'মে গেল? তা তো নয়। কিন্তু মাতৃস্তন্য মুখে গ্রহণ ক'রে শিশুর দেহে ও মনে এমন কিছু নিগূঢ় ক্রিয়া হ'ল, যার ফলে সে শান্ত হ'ল।

ছোট একটি শিশু; সবেমাত্র একটু চলতে শিখেছে। হঠাৎ প'ড়ে গিয়ে আঘাত পেল। যারা কাছে ছিল, তাকে সযত্নে তুলে নিল। আহত স্থানে জল দিল, হাত বুলিয়ে দিল। কিন্তু শিশুর কান্না তবু থামে না। মা এলেন, বুকে ধরলেন, স্তন্য শিশুর মুখে পুরে দিলেন। তখন কান্না থামল। তখনই কি তার আঘাতের ব্যথা চলে গেল? তা তো নয়। কিন্তু এখানেও সেই নিগূঢ় ক্রিয়ার ফল দেখা গেল।

ছোট একটি শিশু ভয় পেয়ে ছুটে এসেছে; কাঁদতে কাঁদতে মাকে জড়িয়ে ধরেছে। কান্না থামবার পরেও তার বুক ধড়ফড়

কর্‌চে, স্পন্দন থামচে না। মা তাকে বুকে চেপে ধর্‌লেন; স্তন্য মুখে দিলেন। টান্‌তে টান্‌তে ক্রমে ক্রমে শিশুর বক্ষের স্পন্দন স্বাভাবিক হ'য়ে এল।—কখনও কখনও অল্পবয়স্কা মাকে এরকম কর্‌তে দেখে তাঁর অবিবাহিতা অনভিজ্ঞা সখীরা পরিহাস করে। তারা বলে, "তোমার বুঝি ধারণা এই যে তোমার স্তন্যপানই শিশুর সব কষ্টের ওষুধ?" কিন্তু সত্য কথা তো তাই। যারা এমন ক'রে বলে, তারাই কিছু জানে না।

কত সময়ে কেহ খেল্‌না কেড়ে নিয়েছে ব'লে শিশু নিরাশ্বাস হ'য়ে কাঁদতে থাকে। কত সময়ে দেখ্‌তে পাই, পাঁচ ছয় মাসের একটি শিশু এমন রেগে গিয়েছে যে, কেহই তার কান্না থামাতে পার্‌চে না। এই সব সময়ে মা শিশুকে বুকে ধরেন, স্তন্য মুখে পুরে দেন। স্তন্য পান কর্‌তে কর্‌তেও শিশু এক এক বার আগের সেই ক্ষোভের বা ক্রোধের উচ্ছ্বাসে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে; কিন্তু ক্রমে স্তন্যপান কর্‌তে কর্‌তেই সে শান্ত হ'য়ে পড়ে।

এই যে কয়েকটি ব্যাপারের বর্ণনা কর্‌লাম, এগুলির মধ্যে মা ও শিশু, দুজনেই কিছু কর্‌চেন। শিশু কাঁদ্‌ল, মা তাকে বুকে তুলে নিলেন, তার মুখে স্তন্য পুরে দিলেন। এসব ব্যাপারের ভিতরে শিশুর কাজটা বড়, না, মায়ের কাজটা বড়? কে বল্‌বে! মনে তো হয় যেন মায়ের কাজটাই বড়।

তেমনি, সত্য উপাসনায় কি হয়? সন্তান কাঁদে, মা তাকে বুকে তুলে ধরেন; তার আত্মাকে নিজ স্পর্শসুধা দিয়ে বেষ্টন করেন; তার আত্মাকে নিজ স্নেহসুধা পান করান। এতে সাধকের কাজই বেশী, না দেবতার কাজই বেশী? কে বল্‌বে! মনে তো হয় যেন দেবতার কাজই বেশী।

মাতৃস্তন্য মুখে নিলে শিশুর দেহমনে কি-ক্রিয়া হয়? মাতা নিজের স্তন্য হ'তে শিশুর দেহে ও চেতনায় কি-গূঢ় প্রভাব, কি-স্রোত ঢেলে দেন? সে কি শুধু দুগ্ধধারা? সে কি শুধু ক্ষুধার নিবৃত্তি? কখনও নয়! তখন মাতা কি দেন, সন্তান কি পায়, তা এত গভীর, এত জটিল, এত নিগূঢ়, যে, তার বিশ্লেষণ সম্ভব নয়।

তেমনি, জীবনে আমরা যতবার সত্য উপাসনা সম্ভোগ করি, তখন আমাদের আত্মাতে কি ঘটে? তখন আমাদের চেতনায়, আমাদের দেহ-মন-মেজাজে কি ব্যাপার হয়? কে তা বল্‌তে পারে? পরমজননী তখন আমাদের কি-বস্তু দেন? তাঁর সেই স্পর্শের, সেই প্রভাবের নাম কি? বর্ণনা কি? বিশ্লেষণ কি? —জানি না। শুধু এই মাত্র জানি যে তাতেই মন প্রাণের সব দুঃখ সব জ্বালা চ'লে যায়; তাতেই প্রাণ নূতন হয়, তাজা হয়।

এ জীবনে রোগে, শোকে, দুঃখে, ভয়ে, বিফলতায়, রিপুর উত্তেজনায়, যত বার পরম জননীর কোলে মুখ রেখে কেঁদেছি, তত বার জীবনে এই ব্যাপারই ঘটেছে। রোগের মধ্যে মন ব'লেছে, "মা তুমি কাছে থাক; আমার এই রোগক্লিষ্ট দেহ যে তোমার কোলে র'য়েছে, তার অনুভূতিই ভাল ক'রে আমার চেতনাতে সঞ্চার কর; তাতেই আমার ক্লেশ দূর হবে।" সে অবস্থায় পরম জননী তাই করেন। তাঁর কোলে প'ড়ে থাকা ও তাঁর স্নেহ সুধা পান করাই সে অবস্থার উপাসনা। তেমনি দুঃখে; তেমনি ভয়ে; তেমনি সংসারের বিফলতায়।

রিপুর উত্তেজনাতেও সেই কথা। কত সময়ে নিজেই বুঝ্‌তে পারি যে আমি সংযম হারাচ্ছি, আমার এমন রাগ হওয়া উচিত নয়; কিন্তু তবু রাগ থামাতে পারি না। তখন পরম জননীর কাছে গিয়ে, তাঁকে জড়িয়ে ধ'রে, তাঁর কোলে মুখ লুকিয়ে বলি, "মা, আমার রাগটা তুমি থামিয়ে দাও। আমার উত্তেজিত স্নায়ুমণ্ডলীকে তুমি নিজের বুকে চেপে রেখে শান্ত ক'রে দাও।" তখন ঐ পাঁচ মাসের শিশুর মত' নিজের বুদ্ধি চেষ্টা সব ভুলে গিয়ে মায়ের বক্ষের মধ্যে লুকাতে ইচ্ছা করে। আমি যে তখন মাকে জড়িয়ে ধ'রে কাতর হ'য়ে কেবল ঐ কথাই বল্‌তে থাকি, আর মা যে তখন আমাকে নিজ স্নেহবক্ষে চেপে নিয়ে ক্রমে ক্রমে শান্ত ক'রে দেন,— মায়ের সঙ্গে আমার এই যে ব্যাপার ঘটে, ইহাই তো আমার তখনকার উপাসনা।

আমি দুঃখের ও বেদনার উপাসনার কথাই এতক্ষণ বল্‌লাম। কিন্তু শান্ত মনে যখন তাঁর উপাসনা করি, তখনও এই কথা। বাক্যের চিন্তার ও নিবেদনের চেয়ে গভীরতর স্থানে যে-নীরব অনুভূতি থাকে, যাতে তিনি আমাকে কিছু দেন, আমি তাঁর কাছ থেকে কিছু পাই, তার বর্ণনা হয় না, তার বিশ্লেষণ হয় না।

উপাসনার ভিতরে মায়ের কাজটাই বেশী বড়, এই সত্য আজ খুব ভাল ক'রে আমাদের মনে প্রবেশ করুক্। সন্তানের চেয়ে মায়ের ব্যাকুলতাই বেশী। কত সময়ে স্তন্যপান কর্‌বার জন্য সন্তান তত ব্যাকুল হয় না, স্তন্যদান কর্‌বার জন্য মা যত ব্যাকুল হন। কোনও বাড়ীতে একদিন অতর্কিত কারণে মা সকালবেলা শিশু সন্তানকে স্তন্যপান করা'তে পারেন নাই। দাসী সে কথাটি জান্‌ত না; সে যথাসময়ে শিশুকে হাওয়া খাওয়াতে বাহিরে নিয়ে গেল। শিশুও বেড়াতে যাবার উৎসাহে খাওয়া ভুলে গেল। কিন্তু মার তখন কি ব্যস্ততা! কত বার বাহিরের দিকে তাকান্, কখন আমার বাছা ঘরে ফিরে আস্‌বে, তাকে স্তন্যপান করাব! আমরা কত সময়ে উপাসনা না ক'রেই, বা ভাল ক'রে উপাসনা না ক'রেই, সংসারের কাজে বাহির হ'য়ে পড়ি। তখন কি দেখা যায় না, যে, স্তন্যদানের জন্য মা যত ব্যাকুল, স্তন্যপানের জন্য আমরা তত ব্যাকুল নই? সেই বাড়ীর মায়ের মত', ব্রাহ্মসমাজ-বাড়ীতে স্তন্যভারাতুর মায়ের ছবিটি কি এই উৎসবে দেখেছ, ভাই বোন্?

সত্য উপাসনা হ'লে আত্মাতে কি-ফল হয়? আত্মার সর্ব্বাঙ্গ পুষ্ট হয়। বৈজ্ঞানিকেরা কত গবেষণা ক'রেও, এখনও মানবদেহের সর্ব্বাঙ্গকে পুষ্ট কর্‌বার উপযোগী কোনও খাদ্যবস্তুর (perfect food) উদ্ভাবন কর্‌তে পারেন নাই। অথচ কি আশ্চর্য্য, এক মাতৃস্তন্যে শিশুর সর্ব্বাঙ্গ পোষণের উপাদান বিদ্যমান! তেমনি, উপাসনা যদি সরল ও সত্য হয়, মাতৃ-

স্তন্যপানের অনুরূপ হয়, তবে তা হ'তে আত্মার সর্ব্বাঙ্গ পুষ্ট হয়, সতেজ হয়।

মস্তিষ্ককে নির্ম্মল, বুদ্ধিকে পরিষ্কার রাখ্‌তে চাও? সকল প্রশ্নের সুমীমাংসা লাভ কর্‌বার জন্য চিন্তাকে উজ্জ্বল রাখ্‌তে চাও? উপাসনা কর। মনকে কোমল, হৃদয়কে শ্রদ্ধায় নত ও প্রেমে স্নিগ্ধ রাখ্‌তে চাও? উপাসনা কর। সঙ্কল্পে দৃঢ়, প্রলোভনে অকম্পিত, বাধা বিঘ্নে নির্ভীক থাক্‌তে চাও? উপাসনা কর।—কিন্তু শুধু বাক্যের উপাসনা নয়; শুধু মননের উপাসনাও নয়। সেই নিগূঢ় আত্মদানের উপাসনা কর, যাহা মাতৃস্তন্য পানের সমান।

লোলুপ মানুষ।

ধর্ম্মরাজ্যটা কি রকম মানুষদের রাজ্য? একটা দৃষ্টান্তের সাহায্যে বোঝ্‌বার চেষ্টা করা যাক্।

এক বাড়ীতে চারি ভাই তাঁদের পরিবার সহ একত্র থাকেন। তাঁদের সকলের শিশুরা একত্রে একটি ঘরে খেলা করে। মাঝে মাঝে বধূরা সেই ঘরে এসে নিজ নিজ সন্তানকে স্তন্যদান ক'রে আবার নিজ নিজ কর্ম্মে চ'লে যান।

সেই শিশুগুলির মধ্যে একটি বড়ই লোভী। সেই ঘরে এসে যাই কোন মা তাঁর সন্তানকে কোলে নিয়ে স্তন্যদান কর্‌তে বসেন, অমনি সে উর্দ্ধশ্বাসে নিজের মায়ের খোঁজে ছুটে যায়। মাকে যেখানে পায়, সেখানেই তাঁর পা জড়িয়ে ধরে, এবং তখনই স্তন্যপান কর্‌বার জন্য আব্দার কর্‌তে থাকে। এ বাড়ীতে সেই ছেলেটির এই কাণ্ড দে'খে সকলে বড়ই কৌতুক অনুভব করেন। সে ছেলেটি এবাড়ীতে "হ্যাংলা ছেলে" ব'লে পরিচিত।

এই রকম "হ্যাংলা ছেলে" বয়স্কদের মধ্যেও থাকে। মাতৃভক্তিতে যাঁর হৃদয় একান্ত সিক্ত তাঁর প্রকৃতি বড় হ'য়েও এমনি থাকে। এমন মানুষ যদি কোথাও গিয়ে দেখ্‌তে পান যে একটি মা গদ্‌গদ হ'য়ে নিজ সন্তানকে আদর কর্‌ছেন, তবে তৎক্ষণাৎ তাঁর মন নিজের মায়ের দিকে ছোটে। যেখানে মাতৃস্নেহের লীলা, সেখানেই তাঁর মন লোলুপ হ'য়ে ওঠে।

ভক্তেরা এই শ্রেণীর লোলুপ ছেলে। পৃথিবীর যে-দেশে, যে-যুগে, যে-ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্য দিয়ে জগজ্জননীর স্নেহনির্ঝর বিশেষ ভাবে তাঁর মানবসন্তানের জন্য ঝ'রেছে, সেইখানেই ভক্ত দুবাহু তুলে মা মা ব'লে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে সেই নির্ঝরধারায় স্নাত হবার জন্য উৎসুক হন। সেখানেই তিনি সেই সন্তান-দলে মিশে তাঁদের সঙ্গে মাতৃস্তন্য পান কর্‌বার জন্য উৎসুক হন।

আমি আগেই ব'লেছি, আমাদের মত' দুঃখী পাপীরাও এই জন্য উৎসুক। আমাদের অন্তরটাও সেই হ্যাংলা ছেলের মত'। বল্‌ব কি, সমুদয় ধর্ম্মরাজ্যটাই এই রকম লোলুপ ছেলে মেয়েদের দিয়ে ভরা। মা তাঁর কোনও ভক্তকে স্তন্যপান করাচ্ছেন, এই দৃশ্য দেখে আমরাও মায়ের পা জড়িয়ে না ধ'রে থাক্‌তে পারি না। আমাদেরও মন বলে, "মা গো, রামপ্রসাদের কাছে, রামকৃষ্ণের কাছে, যেমন মিষ্টি মা হ'য়ে দেখা দিয়েছিলে, আমাদেরও সেই দর্শন দাও। যীশুর কাছে যেমন খোরাক-পোষাকের-পর্য্যন্ত ভার-লওয়া সত্য-পিতা হ'য়ে দেখা দিয়েছিলে, আমাদের কাছেও তেম্‌নি দেখা দাও। শ্রীচৈতন্যকে, মাডাম গেয়োঁকে যেমন মধুর রূপে দেখা দিয়ে মাতিয়েছিলে, আমাদেরও তেমনি দেখা দাও, তেম্‌নি ক'রে মাতাও!" ধর্ম্মরাজ্যটা এইরূপ লোলুপ মানুষদেরই রাজ্য।

এই লোলুপ মানুষেরা ধর্ম্মরাজ্য হ'তে কি অন্বেষণ করেন? তাঁদের সব চেয়ে বেশী অন্বেষণের বিষয় এই যে, কে কোথায় একটু মধু সঞ্চয় ক'রে রেখে গিয়েছেন। মা সন্তানকে স্নেহসুধা দান কর্‌ছেন, এবং সন্তান মার কাছে আত্মদান কর্‌ছেন, এই উভয়ের যত অমৃতময় প্রকাশ ও যত অমৃতময় নিবেদন, তাই ধর্ম্মরাজ্যের মধু। এই মধুর জন্যই তাঁরা লোলুপ।

ব্রাহ্মসমাজ এই দেশে ও এই যুগে যে-সকল কার্য্য কর্‌ছেন, তার ইতিহাস নিশ্চয়ই গৌরবময়। এবং আমরা আশা করি যে আগামী যুগেও সেইরূপ গৌরবময় ইতিহাস রচিত হবে।—কিন্তু ভবিষ্যৎ যুগের ধর্ম্মরাজ্যের মানুষেরা, বিশেষতঃ ক্ষুধিত তৃষিত আত্মাগণ তো শুধু তাই পেয়ে তৃপ্ত হবেন না! তাঁরা অন্বেষণ কর্‌বেন, ব্রাহ্মসমাজ কি ধর্ম্মের মধুকোষে কিছু মধু সঞ্চয় ক'রে রেখে গিয়েছেন?

এই জন্য বলি, ব্রাহ্মসমাজের ভাই বোন্, সাধনাশ্রমের ভাই বোন্, আজ শুধু দেশের ও যুগের উপযোগী কর্ত্তব্যের কথাই মনে রেখো না। কিন্তু সকল দেশের সকল যুগের লোলুপ ভক্তগণের জন্য কিছু প্রেমামৃত কিছু ভক্তি-অমৃত রেখে যেতে হবে, এ কথাই আজ প্রধান ভাবে মনে রেখো। সমুদয় কর্ম্মসূচী অপেক্ষা এটি বড় কথা।

ভবিষ্যতে এমন যুগ আস্‌তে পারে, যখন রামমোহনের কর্ম্ম ও কীর্ত্তি সবই মানুষ বিস্মৃত হবে। কিন্তু তখনও ধর্ম্মরাজ্যের লোলুপ মানুষেরা মনে রাখ্‌বে যে ধর্ম্ম-মন্দিরে মিলিত উপাসনাতে ব'সে তাঁর চোখে জল প'ড়্‌ত। তাঁর হৃদয়ের মহত্ত্ব, তাঁর ভক্তি ব্রাহ্মসমাজের অক্ষয় ধন।

দেবেন্দ্রনাথ যে ব্রাহ্মসমাজকে সমাজরূপে গঠন ক'রে দিয়েছেন, অনুষ্ঠান-পদ্ধতি উপাসনা-পদ্ধতি ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থ প্রভৃতি রচনা ক'রে ব্রাহ্মসমাজকে ধর্ম্মমণ্ডলীর আকার দিয়ে গিয়েছেন, এসব কথা যখন মানুষ বিস্মৃত হবে, তখনও ধর্ম্মরাজ্যের লোলুপ মানুষেরা মনে রাখ্‌বে, তিনি ব'লেছিলেন, "ব্রহ্ম যে আমার গায়ে ঠেকেন!" তিনি ব'লে গিয়েছেন, "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্।"

আচার্য্য কেশবচন্দ্রের অলোকসামান্য প্রতিভা ও এক যুগে তৎকর্ত্তৃক ভারতবর্ষ আলোড়নের ইতিহাস যখন মানুষ বিস্মৃত হবে, তখনও ধর্ম্মরাজ্যের লোলুপ মানুষেরা তাঁর ভক্তি-অশ্রু মনে রাখ্‌বে। মনে রাখ্‌বে, তিনি হাস্যময়ী মাকে, লীলাময় শ্রীহরিকে, চিনিয়ে দিয়ে গিয়েছেন।

শিবনাথের বাগ্মিতা, তাঁর তেজোময় কর্ম্মজীবন, তাঁর সৃষ্ট এতগুলি প্রতিষ্ঠান, এ সব একদিন মানুষ ভুলে যাবে। কিন্তু তখনও ধর্ম্মরাজ্যের তৃষিত ও লোলুপ মানুষেরা মনে রাখ্‌বে, "ভাইরে কি মধুর নাম!" মনে রাখ্‌বে, "সে বাণীর বর্ণে বর্ণে সুধারস পশে কর্ণে।" মনে রাখ্‌বে, "ও সে মা জননী, প্রেমরূপিণী, পরম আদরে বিশ্ব পালিছেন যিনি।"

তাই বলি, ভাই বোন্, ধর্ম্মরাজ্যটা মধু সঞ্চয়ের রাজ্য, আর লোলুপ মানুষদের রাজ্য। ব্রাহ্মধর্ম্ম মধুময়। আমরা যেন এই ধর্ম্মকে মধুময় ব'লে সাধন কর্‌তে পারি, এবং আমাদের জীবনের দ্বারা জগতের কাছে মধুময় ব'লে প্রকাশ কর্‌তে পারি।

প্রার্থনার পর শেষ সঙ্গীত, "তুমি মধু তুমি মধু" এই কীর্ত্তনটি প্রমত্ত ভাবে গীত হয়।

অপরাহ্নে প্রচার বিষয়ে আলোচনা। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র সভাপতির কার্য্য, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত আলোচনা উত্থাপন এবং শ্রীযুক্ত মথুরানাথ গাঙ্গুলী, শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র সোম, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী স্ব স্ব বক্তব্য প্রকাশ করেন।

সায়ংকালে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ "মানবের নৈসর্গিক স্বত্ব" (The natural rights of man) বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। (ক্রমশঃ)

ব্রাহ্মসমাজ

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে,—

বিগত ১৪ই ফেব্রুয়ারী কুমিল্লা নগরীতে পরলোকগত গুরুদয়াল সিংহের জ্যেষ্ঠা কন্যা কুমারী মণিহারময়ী সিংহ পরলোকগমন করিয়াছেন। তৃতীয়া ভগিনী ক্ষণপ্রভা সিংহ রাণিদিয়াস্থ ভবনে তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন। এই উপলক্ষে তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ বিভাগে ২৲, কুমিল্লা ব্রাহ্মসমাজে ৩৲, অনাথ সংস্থান ধন-ভাণ্ডারে ৫৲ এবং গোধন-সমিতিতে ৫৲ টাকা, মোট ১৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

বিগত ২৮শে ফেব্রুয়ারী বাণীবন গ্রামে পরলোকগত ক্ষীরোদচন্দ্র দাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র শুভসাধন ৪৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। বিগত ১৩ই মার্চ্চ তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। তাহাতে শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন আচার্য্যের কার্য্য এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ দাস ও ভগ্নী শ্রীমতী লাবণ্যলেখা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে ভ্রাতা নিম্নলিখিতরূপে দান করিয়াছেন—দুঃস্থ ব্রাহ্ম-পরিবার ভাণ্ডারে ৫৲, বাণীবন বালিকা বিদ্যালয়ে ২৲ ও যদুবেড়িয়া বালক বিদ্যালয়ে ২৲। এতদ্ব্যতীত বাণীবন বালিকা বিদ্যালয়ের একটি ছাত্রীকে আপাততঃ এক বৎসরের জন্য মাসিক ২৲ টাকা হারে একটি বৃত্তি প্রদান করা হইবে।

বিগত ৩রা মার্চ্চ কলিকাতা নগরীতে বাবু মহেশচন্দ্র ভৌমিক একটি অস্ত্রোপচারের ফলে স্ত্রী পুত্র কন্যাদিগকে অসহায় করিয়া হঠাৎ ৬৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি একজন উৎসাহী ব্রাহ্ম ছিলেন এবং অপনার মত ও বিশ্বাসের জন্য তাঁহাকে অনেক দুঃখ ক্লেশ ও সংগ্রামের মধ্য দিয়া জীবনপথে চলিতে হইয়াছে।

বিগত ৮ই মার্চ্চ ফরাসী দেশের প্যারীনগরীতে উৎসাহী কর্ম্মী ইন্দুভূষণ সেন (মিঃ আই বি সেন) বৃদ্ধা মাতা ও আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদিগকে শোকসাগরে ভাসাইয়া অল্প কয়েক দিনের অসুখে ৫৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি নানা প্রকারে দেশের ও ব্রাহ্মসমাজের জন্য খাটিয়া গিয়াছেন এবং ভবিষ্যতের আশার স্থল ছিলেন। তাঁহার মধুর চরিত্র ও প্রকৃতি তাঁহাকে সকলের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র করিয়াছিল। তাঁহার স্থান সহজে পূরণ হইবার নহে।

বিগত ১২ই মার্চ্চ কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ও শ্রীমতী সান্ত্বনা দত্তের শিশু পুত্র ব্রঙ্কোনিমোনিয়া রোগে ৭ মাস বয়সে পরলোক গমন করিয়াছে।

বিগত ১লা মার্চ্চ পরলোকগত বসন্ত কুমার চৌধুরীর আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র ও শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার লধ আচার্য্যের কার্য্য এবং পুত্র সুকুমার প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ২৲ নববিধান ব্রাহ্মসমাজে ২৲ ও সাধনাশ্রমে ২৲ প্রদত্ত হইয়াছে।

বিগত ১৩ই মাঘ কলিকাতা নগরীতে কৃষ্ণনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ মল্লিকের দ্বিতীয় পুত্র অজিতকুমার নিমোনিয়া রোগে পরলোকগমন করেন। বিগত ৫ই মার্চ্চ তাহার আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে ক্ষেত্রনাথ বাবু সাধনাশ্রমে ২৲ দান করিয়াছেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চির শান্তিতে রাখুন ও আত্মীয় স্বজনদিগের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

শুভবিবাহ—বিগত ১২ই মার্চ্চ কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত রাধামাধব রায়ের দ্বিতীয়া কন্যা কল্যাণীয়া গীতা ও রায় সাহেব প্রবোধচন্দ্র রায়ের পুত্র শ্রীমান প্রশান্তকুমারের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাস গুপ্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। প্রেমময় পিতা নব-দম্পতিকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ—মঙ্গলবিধাতা প্রেমময় দেবতার কৃপায় এবার আশাতীত ভাবে মাঘোৎসবের কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। ৫ই হইতে ১০ই মাঘ পর্য্যন্ত উৎসবের কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারিত ছিল, কিন্তু ২৯শে পৌষ হইতে ৫।৬ দিন বিভিন্ন পল্লী হইতে উষাকীর্ত্তন বাহির হইয়া এক এক বাড়ীতে শেষ হইলে তথায় প্রার্থনা ও প্রীতিজলযোগের ব্যবস্থা হইয়াছিল। উষাকীর্ত্তন ও উদ্দাম উৎসাহ-পরিচালিত নগর-সঙ্কীর্ত্তনে সহরে একটি বিশেষ সাড়া পড়িয়াছিল। প্রায় ১৫ দিন ব্যাপী দীর্ঘ উৎসবে নরনারীর সমাগম অন্যান্য বৎসর হইতে কম হয় নাই। ১১ই মাঘ সায়ংকালীন উৎসবে এই বৃহৎ মন্দিরেও লোকের স্থানাভাব ঘটিয়াছিল। উৎসবের কার্য্য-প্রণালী নির্দ্ধারিত কার্য্য অতি সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

৫ই মাঘ প্রভাতকালে বগুড়াস্থ সর্ব্বানন্দভবন হইতে উষাকীর্ত্তন বাহির হইয়া নগরের কতিপয় বড় রাস্তা ঘুরিয়া আলেকান্দাস্থ স্বর্গীয় কালীমোহন দাস মহাশয়ের ভবনে কীর্ত্তন ক্ষান্ত হইলে, প্রার্থনা ও প্রীতিজলযোগ অন্তে প্রাতঃকালের কার্য্য শেষ হয়। সায়ংকালে কীর্ত্তনান্তে উৎসবের উদ্বোধন-উপাসনা সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। ৬ই মাঘ প্রাতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বর্গারোহণ দিবসের স্মরণে বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। সায়ংকালে মহর্ষির স্মৃতিসভার অধিবেশনে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত যোগানন্দ দাস, শ্রীচরণ সেন, রসরঞ্জন সেন এবং সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন। ৭ই মাঘ প্রভাতে বগুড়া পল্লীতে উষাকীর্ত্তনান্তে প্রাতে কল্যাণ-কুটিরে উৎসব হয়। বাবু যোগানন্দ দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। প্রীতিজলযোগে প্রাতের উৎসব শেষ হয়। সায়ংকালে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "দীনের দাবী" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ৮ই মাঘ প্রাতে শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ গুপ্তের ভবনে প্রীতিজলযোগে উৎসব সম্পন্ন হয়; মনোমোহন বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্নে মন্দিরপ্রাঙ্গণে ছাত্রসমাজের উৎসবে সত্যানন্দ বাবু সভাপতির কার্য্য করেন। বাবু সুধাংশু চৌধুরী কবিতা, কুমারী সুচরিতা দাস প্রবন্ধ পাঠ, বাবু যোগানন্দ দাস (ইংরেজিতে), কিরণচন্দ্র ঘোষাল, কল্যাণকুমার চক্রবর্ত্তী এবং রসরঞ্জন সেন বক্তৃতা করেন। সায়ংকালে সতীশ বাবুর সভাপতিত্বে ব্রাহ্মবন্ধু সভার উৎসব সম্পন্ন হয়। কার্য্যবিবরণ পাঠান্তে বাবু পূর্ণচন্দ্র দে, মনোমোহন বাবু, শ্রীচরণ বাবু, প্রসন্ন বাবু (দাস) এবং রায়বাহাদুর গণেশ চন্দ্র দাস বক্তৃতা করেন। ৯ই মাঘ প্রাতের উপাসনায় বাবু রাজকুমার ঘোষ আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্নে ব্রাহ্ম শ্মশান হইতে নগরকীর্ত্তন বাহির

হইয়া হাসপাতাল রোড, জেল রোড, পুরাণ বাজারখোলা এবং চক বাজার হইয়া কীর্ত্তনদল মন্দিরে পৌঁছিলে উপাসনা হয়। সতীশ বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন। এইদিন মধ্যাহ্নে ব্রাহ্মিকা সমাজের উৎসবে শ্রীমতী কুসুমকুমারী দাস উপাসনা ও কুমারী স্নেহলতা দাস ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করেন। ১০ই মাঘ প্রাতে আচার্য্য নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয়ের পরলোকগমন-দিনের স্মরণে উপাসনা হয়। মনোমোহন বাবু আচার্য্যের কার্য্য এবং সতীশ বাবু ও যোগানন্দ বাবু নবদ্বীপ বাবুর জীবন-প্রসঙ্গ করেন। উপাসনার পরে কাঙ্গালী বিদায় হয়। বাবু ললিতকুমার বসু প্রার্থনা করেন। সায়ংকালীন উপাসনায় শ্রীযুক্ত যোগানন্দ দাস আচার্য্যে কার্য্য করেন।

১১ই মাঘ সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব হয়। বগুড়া পল্লীস্থ সর্ব্বানন্দভবন হইতে কতিপয় বন্ধু উষাকীর্ত্তন করিতে করিতে মন্দিরে পৌঁছিলে, বেলা ৮টা পর্য্যন্ত জমাট কীর্ত্তন হয়। ৮টা হইতে ১০॥ টা পর্য্যন্ত উৎসব হয়। সত্যানন্দ বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন। আচার্য্যের প্রার্থনার পরে মনোমোহন বাবু দাঁড়াইয়া প্রার্থনা করেন। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে তিনি এই দিনে স্কুলের কার্য্য ছাড়িয়া প্রচারব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১১টা হইতে কোন কোন বন্ধু ধ্যান, প্রার্থনা এবং সঙ্গীতাদিতে ৩টা পর্য্যন্ত অতিবাহিত করেন। অপরাহ্নে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষ আচার্য্যের কার্য্য করেন। ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত বাবু যোগানন্দ দাস, শ্রীচরণ সেন এবং রসরঞ্জন সেন নানা গ্রন্থ হইতে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তাহার পর কীর্ত্তন হইলে, সায়ংকালীন উপাসনাদি হয়। মনোমোহন বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন। রাত্রি ১০টায় অনেক বন্ধু মিলিত হইয়া সর্ব্বানন্দ-ভবনে গমন করেন এবং তথায় সমাধিক্ষেত্রে সত্যানন্দ বাবু প্রার্থনা করিলে, উক্ত ভবনে প্রীতিভোজনান্তে আজিকার উৎসব শেষ হয়। ১২ই মাঘ প্রাতের উপাসনায় বাবু ললিতকুমার বসু সংক্ষিপ্ত উপাসনা করেন। বাবু পূর্ণচন্দ্র দে, রসিকলাল সেন এবং কালীনাথ ঘোষ ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে পাঠ এবং প্রার্থনা করেন। অপরাহ্নে বালক-বালিকা-সম্মিলনে রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাস সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বালকবালিকাগণ সঙ্গীত ও কবিতা-বৃত্তি করিলে, শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, যোগানন্দ দাস, রসরঞ্জন সেন, কল্যাণকুমার চক্রবর্ত্তী এবং সভাপতি উপদেশচ্ছলে বক্তৃতা করেন। মিষ্ট এবং কমলা লেবু বিতরিত হইলে এই উৎসব শেষ হয়। সায়ংকালে মনোমোহন বাবু "ঘরের কথা" বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন। ১৩ই মাঘ প্রাতে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভবনে উৎসব হয়। মনোমোহন বাবু উপাসনা করেন। প্রীতিজলযোগে উৎসব শেষ হয়। সায়ংকালে সুহৃদসম্মিলনের উপাসনায় সত্যানন্দ বাবু উপাসনা করেন। সমগ্র উৎসবের উপাসনায় বাবু ননীভূষণ দাস সুমধুর সঙ্গীতের দ্বারা যথেষ্ট সাহায্য করেন। পরস্পরের আলিঙ্গন, প্রণাম সম্ভাষণ ও একত্রে প্রীতিভোজনান্তে রাত্রি ১১টায় এবারের পবিত্র মধুর উৎসব শেষ হয়।

বিগত ৫ই ফেব্রুয়ারী অপরাহ্নে বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভার অধিবেশনে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় বার্ষিক কার্য্য বিবরণ পাঠ, আচার্য্য ও কর্ম্মচারী নিয়োগ, কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠন প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন হয়। আগামী বৎসরের জন্য (১৩৩৩ সন) শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্য এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের সহকারী আচার্য্যগণ পুনরায় নিযুক্ত হন। শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস সম্পাদক, বাবু জ্ঞানানন্দ দাস, বিনয় ভূষণ গুপ্ত ও ননীভূষণ দাস বি এ সহকারী সম্পাদক এবং বিনয়ভূষণ গুপ্ত ধনাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। কার্য্য নির্ব্বাহক সভার ১০ জন সভ্য মধ্যে এই বৎসর নূতন সভ্যরূপে কুমারী স্নেহলতা দাস এবং শ্রীমতী হেমন্ত কুমারী সেন নিযুক্ত হন।

বিগত ২রা ফাল্গুন সায়ংকালে সর্ব্বানন্দ ভবনে, ব্রাহ্ম বন্ধু সভার নূতন বৎসরের প্রথম অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী সভাপতিরূপে সঙ্গীত প্রার্থনা করিলে, এই বৎসরের জন্য শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস পুনরায় সম্পাদক ও বাবু কল্যাণকুমার চক্রবর্ত্তী সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। আগামী বৎসরের কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারিত হইলে সভার কার্য্য শেষ হয়। ১১ই ফাল্গুন কল্যাণ-কুটীরে ব্রহ্মগীতোপনিষদ্ হইতে সংযম বিষয়ে পাঠ ও আলোচনা হয়। মনোমোহন বাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রীতি জলযোগে সভার কার্য্য শেষ হয়।

বিগত ১৫ই ফাল্গুন ব্রহ্মমন্দিরে ব্রাহ্মিকা সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হয়। মনোমোহন বাবু আচার্য্যের কার্য্য ও ধর্ম্মসাধন বিষয়ে উপদেশ প্রদান এবং কন্যাগণ সঙ্গীত করেন। কুমারী স্নেহলতা দাস ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে পাঠ করেন। অনেক হিন্দুমহিলাও উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রীতিজলযোগে উৎসব শেষ হয়।

পটুয়াখালি ব্রাহ্মসমাজ—প্রায় পঞ্চাশ বর্ষ পূর্ব্বে এই সমাজ স্থাপিত হয়। বর্ত্তমানে প্রাচীন সময়ের বিশিষ্ট কর্ম্মী কেহই নাই। ভগবানের বিশেষ কৃপায় সম্প্রতি ব্রাহ্মবন্ধু শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেন তথায় প্রথম মুন্সেফ পদে কার্য্য করিতেছেন। তাঁহার এবং বিশেষভাবে স্থানীয় কতিপয় বন্ধু ও বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেনের উদ্যোগে বিগত মাঘোৎসবে, উপাসনা, কীর্ত্তন, বক্তৃতা বালকবালিকা সম্মিলন প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন হয়। অধিকাংশ কার্য্যই সুরেশ বাবুকে করিতে হইয়াছে। বরিশাল হইতে তথায় সমাগত রায় বাহাদুর নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত মহাশয়ও বক্তৃতাদি করিয়া উৎসবের সহায়তা করিয়াছিলেন।

সম্প্রতি বরিশাল হইতে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী পটুয়াখালি গমন করিয়া সুরেশ বাবুর ভবনে দুই দিন অবস্থান করেন। তিনি ২৫শে ফেব্রুয়ারী ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে সায়ংকালে "ধর্ম্মের নিবাস ভূমি" বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার পরে বরিশালের মৌলভী হাসেমালী খান বক্তাকে ধন্যবাদ প্রদানচ্ছলে বক্তৃতার সমর্থনে সংক্ষেপে বক্তৃতা করেন। ২৬শে প্রাতে ও সায়ংকালে সমাজ-গৃহে, জমাট কীর্ত্তন ও উপাসনা হয়। মনোমোহন বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং "বিগতভীঃ" এবং "নবজীবন" বিষয়ে দুইটী উপদেশ দেন। রবিবার মধ্যাহ্নে সুরেশ বাবুর গৃহে তাঁহার পিতার বার্ষিক মৃত্যুদিনে মনোমোহন বাবু উপাসনা করেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহাকে, বন্ধুগণের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ, ধর্ম্মপ্রসঙ্গ ও বন্ধুগণের জিজ্ঞাসার উত্তর প্রদান করিতে হইয়াছিল।

বাঁকুড়া ব্রাহ্মসমাজ—বাঁকুড়া ব্রাহ্মসমাজের দ্বিপঞ্চাশৎ জন্মোৎসব নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে সুসম্পন্ন হইয়াছে:—১৩ই ফাল্গুন সন্ধ্যায় উৎসবের উদ্বোধন; তাহাতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। ১৪ই ফাল্গুন প্রাতে সুরেন্দ্রশশী বাবু উপাসনা করেন। রাত্রে শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিত্র উপাসনা করেন। ১৫ই ফাল্গুন প্রাতে বিশেষ উপাসনা ও উপদেশ; শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। রাত্রে উক্ত সুরেন্দ্র বাবু জাতীয় পরিত্রাণ বিষয়ে বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্রমোহন মিত্র সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন করিয়াছেন। পরে শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিত্র উপাসনা করেন।

কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ—মাঘোৎসব উপলক্ষে ১লা মাঘ সন্ধ্যায় সেবাশ্রমে, ২রা ও ৯ই মাঘ প্রাতে, ১১ই ও ১২ই মাঘ সন্ধ্যায় এবং ১৬ই মাঘ প্রাতে মন্দিরে উপাসনা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শ্রীমন্ত দে আচার্য্যের কার্য্য করেন।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাগ কর্ত্তৃক ৯ই চৈত্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত।—সম্পাদক শ্রীবরদাকান্ত বসু, বি-এ

Registered No. 65

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫৫ ভাগ
২৪শ সংখ্যা।

১৬ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার ১৩৩৯, ১৮৫৪ শক,
ব্রাহ্মসংবৎ ১০৪
30th March, 1933.

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০
অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে বিশ্ববিধাতা, তোমার অনন্ত কালপ্রবাহে যেমন দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর, আসিতেছে ও চলিয়া যাইতেছে, তেমনি তোমার অসংখ্য করুণাধারাও আমাদের জীবনের উপর দিয়া অবিশ্রান্ত বহিয়া যাইতেছে। আমরা যদি সে সমস্ত যথোপযুক্ত ভাবে গ্রহণ ও সংরক্ষণ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই তোমার চিরবিকাশশীল বিশ্বের সঙ্গে অবিরাম গতিতে উন্নতি ও কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে পারিতাম। কিন্তু আমরা আমাদের উদাসীনতা অবহেলা ও স্বেচ্ছাচারিতা বশতঃ তাহা করিতে পারিতেছি না বলিয়াই, যাহা অল্প কিছু ধরিতে পারি তাহাও অ'চরে হারাইয়া ফেলি বলিয়াই, নানা দুর্গতির মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছি। হে করুণাময় পিতা, তুমি যদি জীবন্ত মঙ্গলবিধাতারূপে নিত্য সঙ্গী হইয়া না থাকিতে, নানা ভাবে সর্ব্বদা আমাদিগকে জাগ্রত ও উদ্বুদ্ধ না করিতে, তাহা হইলে আরও যে কত অধঃপতিত হইতাম জানি না। দিন ত চলিয়াই যাইতেছে,—আমাদের জন্য বসিয়া থাকিতেছে না। কবে যে আমাদের সম্যক্ চেতনা হইবে, আমরা সম্পূর্ণরূপে তোমার অনুগত হইয়া তোমার করুণা-স্রোতে অবিরাম গতিতে ভাসিয়া চলিতে পারিব, তুমিই জান। হে অন্তরদর্শী দেবতা, আমাদের সমস্ত ত্রুটি দুর্ব্বলতা তুমি দেখিতেছ। তোমার কৃপা ভিন্ন আমাদের অন্য কোনই সম্বল নাই। তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে সর্ব্ব প্রকারে তোমার অনুগত করিয়া লও, সমস্ত উদাসীনতা অবহেলা স্বেচ্ছাচারিতা দূর করিয়া দেও। আর যেন আমরা বৃথা সময় বহিয়া যাইতে না দেই। তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই সম্পূর্ণরূপে আমাদের জীবনে ও সমাজে জয়যুক্ত হউক।

ত্র্যধিক-শততম মাঘোৎসব

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১৩ই মাঘ (২৬শে জানুয়ারী) বৃহস্পতিবার—প্রাতে উপাসনা। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। নদীতে বান ডাকার সময় প্রথমে প্রবল বেগে তিনটি অতি উচ্চ ঢেউ আসিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্ত প্লাবিত করিয়া ফেলিলেও, যেমন তাহাতেই প্লাবনের সমস্ত জল নিঃশেষিত হইয়া যায় না, পরেও ধীরে ধীরে জল বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তেমনি ১১ই ও ১২ই তারিখের মহা উচ্ছ্বাসেই উৎসবের বা ব্রহ্মকৃপার পরিসমাপ্তি নহে, পরেও তাহা ধীর শান্ত গতিতে আমাদিগকে ঊর্দ্ধ দিকে লইয়া যাইতে পারে, এই মর্ম্মে তিনি সংক্ষেপে উদ্বোধন করেন। তাঁহার নিবেদিত উপদেশের মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

উৎসবের মধ্যে এই কতদিন সেবা ভক্তি, ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মধ্যান ব্রহ্মানন্দরস-পান, আত্মোৎসর্গ প্রভৃতি অনেক অতি উচ্চ ও মূল্যবান কথা হইয়াছে। অনেকে হয়ত প্রবল উচ্ছ্বাসভরে জীবনের একটা অতি উন্নত স্তরে নীত হইয়াছেন। যাঁহারা তাহা লইয়া গৃহে ফিরিয়া যাইতে পারিবেন, হৃদয়ে সঞ্চয় করিয়া রাখিতে সমর্থ হইবেন, তাঁহারা ধন্য। তাঁহাদের উৎসব যে বিশেষ সার্থকতা লাভ করিয়াছে, তাঁহারা যে এপথে আরও অগ্রসর হইতে সচেষ্ট ও সমর্থ হইবেন তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু সকলের পক্ষে যে ইহা সম্ভবপর নহে, অনেকে এরূপ উচ্চ অবস্থা লাভ করা অসম্ভব, সাধারণ মানুষের সাধ্যাতীত, মনে করিয়া যে এসকল বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন এবং নিশ্চেষ্টও থাকিতে পারেন, তাহাতেও কোনও সন্দেহ নাই। ইহার মধ্যে যে কোনও মধ্যাবস্থা নাই, এমন কথা কিছুতেই বলা যায় না।

প্রথমোক্ত শ্রেণীর ভক্ত সাধকদের উন্নত অবস্থা লাভ না ঘটিলেই যে উৎসব ব্যর্থ হইল মনে করিতে হইবে, নিরাশায় অবসন্ন হইতে হইবে, এমন কোনও কথাই নাই। আমরা অনেকেই যে হঠাৎ তাঁহাদের অবস্থায় উপনীত হইতে পারি না, তাহা ত সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু তাঁহারাও যে একদিনে কোনও আকস্মিক ভাবে বা অনৈসর্গিক উপায়ে সেখানে পৌঁছিয়াছেন, তাহাও ত নহে—সে কথা ভুলিলে চলিবে কেন? উক্ত প্রকার উচ্চাবস্থালাভের দ্বারা উৎসবের সফলতার বিচার করিলে আমরা মহা ভ্রমেই পতিত হইব।

উৎসবের মূল কথা মুখ ফিরান বা জীবন-গতির পরিবর্ত্তন। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার উপদেশের মধ্যে অনেক সময় আমাদিগকে এই কথা বলিয়াছেন। তিনি যে নদীতে জোয়ারের অপেক্ষায় নৌকাগুলির নঙ্গর করিয়া থাকিবার এবং নৌকার মুখসকল দেখিয়া জোয়ার আসিয়াছে কি না নির্ণয় করিবার দৃষ্টান্ত প্রদান করিতেন, তাহা নিশ্চয়ই আমাদের অনেকের স্মরণ আছে। জোয়ার আসিলে নৌকার মুখ না ফিরিয়া পারে না,—যে পর্য্যন্ত নৌকার মুখ না ফিরে, সে পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে জোয়ার আসে নাই। উৎসবের সফলতার বিচার বিষয়েও এই মনের মুখ ফিরান বা জীবন-গতির পরিবর্ত্তনই নিম্নতম মানদণ্ড। ইহা যে পর্য্যন্ত দেখিতে না পাওয়া যাইবে সে পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে, সাময়িক উচ্ছ্বাস উদ্দীপনা সত্ত্বেও সত্য উৎসব হয় নাই—সমস্তই কৃত্রিম কল্পনা ও মিথ্যা ছায়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। জীবনস্বরূপের সত্য সংস্পর্শ জীবন প্রদান করিবেই। গতি—জীবনস্বরূপের দিকে গতিই—জীবন। আলস্য উদাসীনতা, অবহেলা অবসন্নতা, সংগ্রামবিমুখতা, নিশ্চিন্ত ভাবে পাপের সেবা কখনও জীবনের লক্ষণ নহে—মৃত্যুরই পরিচায়ক। নূতন গতি, উদ্যম, চেষ্টা, সংগ্রাম, মহৎ উন্নত আদর্শের পশ্চাদ্ধাবন অবশ্যম্ভাবীরূপেই জীবনদেবতার সত্য সংস্পর্শ হইতে জীবনে উপস্থিত হইবে। তাহা না আসিলে নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত হইবে যে সত্য সংস্পর্শ ঘটে নাই।

সত্যই যে প্রত্যেক জীবনে এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, তাহার বহু প্রমাণ ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে, পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রাহ্মদের জীবনে আমরা দেখিতে পাইয়াছি। আমরা সকলেই জানি, অনেক পাপাসক্ত লোক এখানে আসিয়া অভ্যস্ত পাপের পথ পরিত্যাগ করিয়া সাধুজীবন লাভ করিয়াছেন—এমন কি অতি উচ্চ জীবন লাভ করিয়া সকলের ভক্তি শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এই ধর্ম্মের প্রচারে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, সকলের দৃষ্টান্তস্থানীয় পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছেন। অন্যায়োপার্জ্জিত অর্থে বাড়ী ঘর বিত্ত সম্পত্তি করিয়া, উচ্চ সম্মান প্রতিপত্তি লাভ করিয়া, যিনি সুখে জীবন যাপন করিতেছিলেন, তিনি সে-সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া অন্যায়োপার্জ্জিত অর্থ লোক খুঁজিয়া খুঁজিয়া প্রত্যর্পণ করিলেন, যাহাদের খোঁজ পাইলেন না তাহাদের প্রদত্ত অর্থ সৎকার্য্যে দান করিয়া দিলেন, নিজে আনন্দের সহিত দারিদ্র্য ও নগণ্য জীবন বরণ করিলেন। যিনি দুষ্কর্ম করিয়া রাজদণ্ডভয়ে দীর্ঘকাল পলাতক ছিলেন, তিনি আপনা হইতে শাস্তি গ্রহণের জন্য প্রকাশ্য আদালতে উপস্থিত হইয়া স্বকৃত পাপ স্বীকার করিলেন, রাজপুরুষের হস্তে আপনাকে অর্পণ করিলেন। আবার, কেহ উত্তমর্ণদিগকে বঞ্চিত করিয়া প্রচুর বিত্ত সম্পত্তি ভোগ করিবার আইনসঙ্গত উপায় থাকা সত্ত্বেও, সে-সমস্ত শেষ কপর্দ্দক পর্য্যন্ত পিতৃঋণ-শোধার্থ অর্পণ করিয়া নিজে দুঃখ ক্লেশ দারিদ্র্য বরণ করিতে একটুকুও দ্বিধা করিলেন না। এরূপ আরও কত দৃষ্টান্ত রহিয়াছে—তাহার উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।

বস্তুতঃ পবিত্রস্বরূপের উপাসকের পক্ষে, তাঁহার সত্য সংস্পর্শে আসিলে, কোনও প্রকার অসত্য পাপ অন্যায়ের সঙ্গে সন্ধি করিয়া, সাংসারিক সুখ সুবিধা মান প্রতিপত্তির পথে চলা কোন প্রকারেই সম্ভবপর নহে। সংসারের সুখ সুবিধা মান প্রতিপত্তি যে সর্ব্বাবস্থায়ই দূষণীয় ও পরিত্যাজ্য তাহা নহে। ইহাদিগকে প্রধানস্থানীয় করিতে গেলেই, ইহাদের জন্য সত্য ও নীতিকে বিন্দু পরিমাণে খর্ব্ব করিতে গেলেই, উহারা মহা অকল্যাণের হেতু হইয়া উঠে। জীবনের গতি ঈশ্বরাভিমুখীন না হইয়া, তাঁহার ইচ্ছাধীন পথে না চলিয়া, অন্য কোনও দিকে, অন্য কোনও পথে চলিলেই অনিষ্টকর হইল, পাপদুষ্ট হইল। তাঁহার ইচ্ছাবিরোধী যাহা তাহাই পাপ। তাঁহার ইচ্ছাধীনতা ও ইচ্ছাবিরোধিতা দুই একসঙ্গে থাকিতে পারে না—দুই বিপরীত গতি একদিকে চলিতে পারে না। এই জন্যই ধর্ম্মার্থীর পক্ষে পাপের সহিত বিন্দু পরিমাণ সন্ধি করিয়া চলা সম্ভবপর নয়, চলিলে আর ধর্ম্মের দিকে গতি থাকে না। কিন্তু তাই বলিয়া তাহার পক্ষে পতন, সাময়িকভাবে পাপ প্রলোভনের অধীন হওয়া যে অসম্ভব, তাহা নহে। এমন কি, বার বার উত্থান পতনও যে সম্ভবপর নহে, তাহাও বলা যায় না। অভ্যস্ত পাপের শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে দীর্ঘকাল লাগিতে পারে, তাহা বিভিন্ন আকারে আসিয়া বিভিন্ন সময়ে অতর্কিতে মুহূর্ত্তের মধ্যে অতি উচ্চ অবস্থা হইতেও পাতিত করিতে পারে। কিন্তু সর্ব্বাবস্থায়ই সংগ্রাম থাকা চাই, পড়িবামাত্র উঠিবার জন্য চেষ্টা যত্ন আগ্রহ থাকা চাই, দুঃখ বেদনা অনুতাপ ও আকুল প্রার্থনা থাকা চাই। পাপের হাতে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিলেই মৃত্যু; আর সমগ্র মন প্রাণের সহিত তাঁহার অনুগত হইবার আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা যত্ন করিলে, তাঁহার হাতে আপনাকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অর্পণ করিলেই জীবন, কল্যাণ ও উন্নতি।

বিশপ ওয়েষ্টকট বলিয়াছেন—The mark of a saint is not perfection, but consecration. A saint is not a man without faults, but a man who has given himself without reserve to God"—"পূর্ণতা বা পাপশূন্যতা নহে, কিন্তু আত্মোৎসর্গই সাধুর লক্ষণ। সাধু পুরুষ যে দোষবিমুক্ত তাহা নহে, তিনি এমন একজন লোক যিনি কিছু না রাখিয়া সম্পূর্ণরূপে আপনাকে ঈশ্বরের হাতে অর্পণ করিয়াছেন।" আমরা অনেক সময় এই কথাটা ভুলিয়া যাই—বিশেষতঃ অপরের সমালোচনাকালে অপরকে আমরা

কঠোর ভাবে সমালোচনা করি; অথচ তাহার ভিতরের প্রকৃত অবস্থা, সে কি প্রকার সংগ্রাম করিতেছে, কি কারণে তাহার পতন ঘটিল, তাহার জন্য সে কত অনুতপ্ত ও ব্যথিত, কত ব্যাকুলভাবে আপনাকে ঈশ্বরের হাতে অর্পণ করিতেছে, আমরা তাহার কিছুই জানি না, কোনও অনুসন্ধানও করি না, সুতরাং তাহাকে ক্ষমা ও সহানুভূতির যোগ্য বলিয়া মনে করি না। আর, আপনার সমস্ত দোষ ত্রুটি বিশেষভাবে জানিয়া বুঝিয়াও, আপনার মধ্যে ক্ষমার্হ সেরূপ কোনও প্রচুর কারণ না দেখিয়াও, অধিকাংশ সময়ই আপনাকে কত কোমলভাবে বিচার করি, কত ক্ষমার চক্ষে দর্শন করি! ইহা যে আমাদের পক্ষে নিতান্ত অনিষ্টকর তাহা বলা বাহুল্য। এ বিষয়ে তো আমাদিগকে বিশেষ সতর্ক ও সাবধান থাকিতে হইবেই। অন্যের মধ্যে যে-সকল দোষ ত্রুটি দেখিয়া নিন্দা করি, আপনার মধ্যে সে সকল যদি উপেক্ষণীয় হয়, তবে আমাদের অবস্থা যে নিতান্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়, সংশোধন বা উন্নতি সাধনের কোনও উপায় থাকে না, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অপরের মধ্যে ক্রোধ, স্বার্থপরতা প্রভৃতি দেখিয়া তীব্র তিক্ত সমালোচনা করি, আর যদি আপনার মধ্যে সে সমস্ত পোষণ করিয়া রাখি, অতি ক্রোধের সহিত যদি ক্রোধের নিন্দা করি, অহংকারে স্ফীত হইয়া, আত্মশ্লাঘায় শতমুখ হইয়া, যদি অপরের ক্ষণিক আত্মপ্রীতির, সামান্য আত্মপ্রশংসার তীব্র সমালোচনা করি, আপনি অতি সামান্য স্বার্থও ত্যাগ করিতে পারি না, আর অপরে একটা গুরুতর স্বার্থত্যাগ করিতে পারিল না বলিয়া যদি তাহাকে অতি হেয় প্রতিপন্ন করিতে যাই, তবে আমাদের সমস্ত সাধন ভজন, উন্নতিসাধনের আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা যে একেবারে ব্যর্থ ও মিথ্যা বলিয়াই প্রমাণিত হয়, তাহা নিশ্চয়ই সকলকে স্বীকার করিতে হইবে। অনেক দোষ ত্রুটি দুর্ব্বলতা থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার সঙ্গে অন্ততঃ এই সংগ্রামটুকু থাকা চাই, জীবনের এই গতিটার পরিবর্ত্তন চাই। আপনার দোষত্রুটি হইতে মুক্ত হইয়া পবিত্রস্বরূপের ইচ্ছানুগত পথে চলিবার আগ্রহ ও চেষ্টা এবং আপনার দুর্ব্বলতা ও ব্যর্থতা অনুভব করিয়া জীবনবিধাতার শরণাপন্ন হওয়া ও তাঁহার হাতে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দেওয়া চাই। তাহা না হইলে, উৎসব নিশ্চয়ই ব্যর্থ মনে করিতে হইবে।

সমস্ত দোষ ত্রুটি দুর্ব্বলতা হইতে মুক্ত হইতে না পারিলেই যে উৎসব ব্যর্থ হইয়াছে, এরূপ মনে করিবার কোনই কারণ নাই। সেরূপ ভাবিয়া নিরাশা ও অবসন্ন হইবার কোনই হেতু নাই। তাহা কখনও কল্যাণকর নহে। কেন না, তাহাতে উন্নতিলাভের বা সংশোধনের চেষ্টা ও ইচ্ছা পর্য্যন্ত চলিয়া যাইতে পারে। সেরূপ অত্যধিক উচ্চ মানদণ্ডের দ্বারা বিচার করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। তাহাতে অনেক সময় বৃথা নিরাশা ও অবসন্নতা উৎপন্ন করিয়া এবং চেষ্টা যত্ন সংগ্রাম হইতে বিরত রাখিয়া, উন্নতির পথে গতিরোধ ও অধঃপতন সাধন করে।

যদি আমরা দেখিতে পাই, সত্যই জীবনের গতি ফিরিয়াছে, হৃদয় মন ঈশ্বরাভিমুখীন হইয়াছে, উদাসীনতা অবহেলা বিদ্রোহিতা পরিত্যাগ করিয়া জীবনবিধাতার ইচ্ছাধীন হইয়া চলিবার জন্য চেষ্টা যত্ন আকাঙ্ক্ষা আগ্রহ জাগিয়াছে, সংগ্রাম চলিয়াছে, পাপ ও সংসারের সঙ্গে সন্ধি করিয়া চলিবার ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি আর নাই, অথবা আপনার দুর্ব্বলতা অক্ষমতা অনুভব করিয়া অনন্যোপায় হইয়া করুণাময়ের শরণাপন্ন হইয়াছি, তাঁহারই হাতে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে অর্পণ করিয়াছি,—তাহা হইলেই জানিতে হইবে উৎসব ব্যর্থ হয় নাই, সার্থকই হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা অধিকতর সার্থকতা যাঁহারা লাভ করিয়াছেন তাঁহারা ত ধন্যই। আমরা যদি অন্ততঃ এইটুকুও লাভ করিয়া থাকি, তবে আমরা এই নিম্নতম অবস্থায় থাকিয়াও ধন্য। এইটুকু না হইলেই সব ব্যর্থ। করুণাময় পিতা কৃপা করিয়া আমাদের সকল জীবনে অন্ততঃ এই টুকু সার্থকতা প্রদান করুন। তাঁহার ইচ্ছাই সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউক, আমাদের প্রতি জীবনে ও সমগ্র সমাজে পূর্ণ হউক।

অপরাহ্ণে বালকবালিকা সম্মিলন। তাহাতে শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু প্রার্থনা করেন এবং শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত বিহারীকৃষ্ণ দেব বালকবালিকাদিগকে গল্প বলিয়া উপদেশ দেন। বাল্যদানভাণ্ডারে প্রদত্ত তাহাদের স্বতঃপ্রবৃত্ত দানও সংগৃহীত হয়। অনন্তর অন্যান্য বৎসরের ন্যায় স্যার নীলরতন সরকারের ব্যয়ে তাহাদিগকে পরিতোষপূর্ব্বক আহার করান হয়।

সায়ংকালে ছাত্রসমাজের উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র "জীবনের সুর ও সঙ্গীত" বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

১৪ই মাঘ (২৭শে জানুয়ারী) শুক্রবার—

প্রাতে উপাসনা; শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। "উৎসবের সফলতা" বিষয়ে তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল:—

উৎসবের সফলতা নব-জীবনের সূচনায়। নব-জীবনের প্রকাশ-ক্ষেত্র দৈনিক জীবন, গৃহ-পরিবার, কর্ম্মক্ষেত্র। আহার নিদ্রা, পান ভোজন, সন্তানপালন, জ্ঞান চর্চ্চা, অর্থ উপার্জ্জন, আমোদ আহ্লাদ, এবং সাধন ভজন—এই সকলের মধ্যে দিয়েই নব-জীবন প্রকাশ পায়।

এই সকল ব্যাপারে নব-জীবন অঙ্কুরিত ও পুষ্ট হ'লে, জন-সমাজে এগিয়ে গিয়ে পূর্ণতা লাভ করে।

ঘরে এবং বাইরে জীবন যদি একটু নবতর না হয়, তা হ'লে উৎসব ব্যর্থ। উৎসবে যে ব্রহ্মকৃপা অবতীর্ণ হয়েছে, সে কৃপার স্পর্শ যে আমরা অনুভব করেছি,—তার সাক্ষ্য জীবনে দিতে হবে। সাক্ষ্য দিতে না পারলে অপরাধ।

কিরূপে সাক্ষ্য দেওয়া যায়? নব সংকল্প এবং নব সাধন গ্রহণের দ্বারা। আমার জীবনে কিছু ছাড়্‌বার এবং কিছু ধর্‌বার আছে তো? নিশ্চয়ই আছে। তা সহজ নয়। ছাড়াও কঠিন, ধরাও কঠিন। সে জন্য সহায় ও সঙ্গী চাই। ঘরে বাইরে

মণ্ডলী চাই। উৎসবকে ঘরে ঘরে, ছোট ছোট মণ্ডলীতে নিয়ে যেতে হবে, ধর্‌তে হবে, সাধন কর্‌তে হবে, জীবনের গতি, রকম সকম বদ্‌লাতে হবে, আরও সংযত শান্ত শুদ্ধ কোমল, অন্তর্মুখীন হ'তে হবে; ছেলেমেয়েসকলকে শ্রেষ্ঠতর ও মিষ্টতর জীবনের সংস্পর্শ দিতে হবে। ভাবোচ্ছ্বাস নয়।

আমরা তো বড় বড় কথা, স্বর্গের কথা বলি। ছেলেমেয়েরা জান্‌তে চায়, তার প্রমাণ কি? সাক্ষ্য কোথায়? যাঁরা বয়স্ক, অগ্রণী, তাঁরা উত্তর দিতে দায়ী, এ সংশয় দূর কর্‌তে দায়ী। জীবন দিয়ে প্রমাণ দেখাতে হবে। সত্য ন্যায় প্রেম শুদ্ধতা সহিষ্ণুতা সংযম বৈরাগ্য যে সত্য বস্তু, তা নবতর স্পষ্টতর সুন্দরতর রূপে দেখাতে হবে।

সাধনের কথা উঠ্‌লেই অনেকে কিছু বিচলিত হ'ন—যে, কাজ হবে কি ক'রে? কত কাজ!—অনেক কাজ। কাজ ও সাধন স্বভাবতঃ পরস্পরবিরোধী নয়। কেবল বাহিরে দৃষ্টি অথবা কেবল অন্তরে দৃষ্টি—দুইই ভ্রান্তি। কাজ তো কর্‌তেই হবে, তাই ব'লে ঘুমোবে না? তেমনি কাজ তো কর্‌তেই হবে, কিন্তু কেমন ক'রে? প্রভুরূপে না ভৃত্যরূপে, নিজেদের সাময়িক ঝোঁক অনুসারে, না ব্রহ্মনিষ্ঠ হ'য়ে? এটা ভাব্‌বার বিষয়। পদে পদে নিজেরা প্রভু হ'য়ে যা-ইচ্ছা তাই করি, ব্রহ্মনিষ্ঠ হওয়া হয় না। অপরাধ হচ্ছে। সাবধান হ'তে হবে।

পরম পিতার সঙ্গে যোগ রক্ষা করা সহজ নয়। আগে প্রীতি, যোগ, তবে তো প্রিয়কার্য্য সম্ভব। আমাদের প্রিয় কার্য্য নয়, পিতার প্রিয় কার্য্য। এ বিষয়ে জীবনে নবীনতা সজীবতা সরসতা আন্‌তে হবে, সম্মিলনের ঔৎসুক্য ও ব্রহ্মনিষ্ঠ কার্য্য-তৎপরতা আন্‌তে হবে। তবেই উৎসব সার্থক হবে।

অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় মেরী কার্পেণ্টার হলে রাবিবাসরীয় নীতি বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ। শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য সভাপতির কার্য্য করেন ও শ্রীমতী সুবালা আচার্য্য পুরস্কার বিতরণ করেন। তাহাতে সম্পাদিকা শ্রীমতী বাসন্তী চক্রবর্ত্তী বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন এবং বালক বালিকাগণ আবৃত্তি প্রভৃতি করিয়া সকলকে বিশেষ আনন্দ দেন।

সায়ংকালে মন্দিরে উপাসনা। তাহাতে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী আচার্য্যের কার্য্য [illegible]রন তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

উপনিষদে ব্রহ্মকে সেতুস্বরূপ বলা হইয়াছে—"স সেতু বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায়"—যাহাতে লোকসকল বিনাশ প্রাপ্ত না হয় সেজন্য পরমাত্মা সেতুস্বরূপ হইয়া রহিয়াছেন।

সেতু শব্দের দুইটি অর্থ। এই দুইটি অর্থ এক সঙ্গে আরোপ না করিলে ব্রহ্ম কিরূপে জগৎকে রক্ষা করিতেছেন তাহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইবে না। মাধ্যাকর্ষণের উপমাদ্বারা কথাটা পরিষ্কার বুঝা যাইবে। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দুই দিক্—কেন্দ্রাভিসারিণী (Centripetal) ও কেন্দ্রাপসারিণী (Centrifugal). ক্ষুদ্র পরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া বৃহৎ জ্যোতিষ্ক পর্য্যন্ত সকল জড়পদার্থের মধ্যে এই দুই শক্তি একই সময়ে কার্য্য করিতেছে। একটাকে ছাড়িয়া আর একটার কার্য্য হয় না। যদি কেবল কেন্দ্রাভিসারিণী শক্তি কার্য্য করে, তবে সকলের মধ্যে সকলে প্রবেশ করিয়া একেবারে এক বিন্দুতে পরিণত হইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। আবার, যদি কেবলমাত্র কেন্দ্রাপসারিণীই থাকে, তবে প্রত্যেকটি পরমাণু পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কোন্ দিক্ দিগন্তে চলিয়া যায় ও বিনষ্ট হয়। দুই শক্তি যে দুই বিভিন্ন দিক্ হইতে এসে কাজ করিতেছে তাহা নহে—সেরূপ কাজের অবসরই নাই। একই শক্তি একই সময়ে এই দুই ভাবে কাজ করিয়াই সৃজন ও রক্ষণ কার্য্য নিষ্পন্ন করে। ইহাকে ভগবানের ইচ্ছাশক্তি—Will of God, বলা যায়। যাহাকে বলি বাহ্য জগৎ, জড় জগৎ—তাহাতে উহা এই দুই ভাবে কাজ করে। জীব জগতে, আত্ম জগতেও ঠিক ঐরূপ দুই ভাবেই কার্য্য হয়। সেখানে উহাকে বলা যায় প্রেম—Love of God. এখানে সেতু শব্দ দ্বারা সেই ভাব প্রকাশ করা হইয়াছে।

সেতু শব্দটীর দুই অর্থ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—(১) সাঁকো, যাহা নদীর দুই বিচ্ছিন্ন পারকে একত্র করে। (২) আ'ল, যাহা দুই ক্ষেত্র যাহাতে এক হ'য়ে না যায় তার বাঁধরূপে ব্যবহৃত হয়। বায়ুমণ্ডল যেমন আমাদের মধ্যে সেতুস্বরূপ আছে বলিয়া আমরা পরস্পরের কথা শুনিতে পাই, তেমনি পরমাত্মা সকল আত্মার মধ্যে সেতুস্বরূপ সূত্রাত্মারূপে বর্ত্তমান আছেন বলিয়াই পরস্পরের মধ্যে ভাব-বিনিময় হয়। তাহাতে যে কেবল আমাদের সমবেত জীবন সম্ভব হয় তাহা নহে, আমাদের ব্যক্তিগত জীবনও উহার উপরেই নির্ভর করে। একজন মানুষকে জন্মমাত্র মনুষ্য সমাজ হইতে দূরে লইয়া রাখিলে, তার ব্যক্তিত্বও গড়িবে না। আবার যদি সেই চির-জীবন্ত জাগ্রত দেবতা বিনিদ্র হ'য়ে আমাদের পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন ক'রে না রাখ্‌তেন, তা হ'লেও আমাদের ব্যক্তিত্ব রক্ষা পেতো না। আ'ল যেমন ক্ষেত্রগুলিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রামের ক্ষেত্র, যদুর ক্ষেত্র এইরূপ বিশিষ্টতা রক্ষা করে, তেমনি পরমাত্মা আমাদের মধ্যে সেতু-স্বরূপ থাকিয়া রাম শ্যাম যদুর ব্যক্তিত্ব রক্ষা করেন। জাগ্রৎ অবস্থায় যেন অহংকারে মত্ত হ'য়ে ভাবি আমি তিনি তুমি স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তা, —সেটাও যে ভ্রান্তি তার উল্লেখ আর এখানে করিলাম না—কিন্তু সুষুপ্তিতে এই ব্যক্তিত্ব বজায় থাকে কিসে? সুষুপ্তিতে যাই কোথায়? ঋষি বলেন—"স যথা সোম্য বয়াংসি বাস-বৃক্ষং সম্প্রতিষ্ঠন্তে। এবং হ বৈ তৎ সর্ব্বং পর আত্মনি সংপ্রতিষ্ঠতে।" পক্ষীরা যেমন বাসবৃক্ষ আশ্রয় করে, তেমনি আত্মা নিদ্রাকালে পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন রাম শ্যাম যদুর আমিত্ব রক্ষা পায় কিসে? সেতুস্বরূপ জাগ্রত থেকে আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বকে রক্ষা করেন যেন গুলিয়ে না যায়, মা যেমন জেগে থেকে সন্তান সকলের পোষাক আহার্য্য খেলানা আলাদা আলাদা ক'রে রাখেন।

সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমানঃ।

সেই দেবতার প্রেম দৃষ্টি আমাদের প্রত্যেকের উপর রহিয়াছে, তাই আমরা জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইতেছি।

সেই অনিমেষ দৃষ্টিই এই স্বজন রক্ষণের মূলে—স সেতুর্বিধৃতি রেষাং লোকানামসম্ভেদায়। কিন্তু এই তত্ত্ব জানিলে বুঝিলেই কি যথেষ্ট হইল? মনে রাখতে হবে, তত্ত্ব ও বস্তু, Philosophy এবং Life এক নয়। বস্তুর সাক্ষাৎকার পাওয়া চাই। Philosophyকে Lifeএ পরিণত করা চাই, ব্রহ্মকে সেতুস্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতে, ব্যক্তিগত ও সমবেত জীবনের মূলরূপে উপলব্ধি করিতে হইবে। তা না হ'লে কিছুই হ'ল না—সব বৃথা হ'ল।

১৩ই মাঘ (২৮শে জানুয়ারী) শনিবার— প্রাতে উপাসনা। তাহাতে শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

মিশর দেশে একজনকে ৪০ বৎসর কারারুদ্ধ ক'রে রাখা হয়েছিল। ৪০ বছর পরে যখন তাকে ছেড়ে দেওয়া হ'ল, তখন জেল হ'তে বেরিয়ে এসে সে মুক্তির আনন্দ ভোগ করতে পারলে না। নির্জ্জন অন্ধকার কারাগারে থেকে তার চোক মুক্ত আলো সহ্য করতে পারলে না,—সে রাস্তা চিনতে পারে না, কেও আপনার লোক কোথাও আছে কি না কিছুই জানে না, কোথায় যাবে, কি খাবে ঠিক করতে পারে না, বড়ই মুস্কিল বোধ করতে লাগল। শেষে সে জেলখানায় ফিরে এলো। বল্লে, আর যে কয়দিন বাঁচব জেলেই আমাকে থাকতে দাও। সংসারে ও বিষয়াসক্তির কারাগারে বাস ক'রে ক'রে আমাদের অন্তরটাও অন্ধকারে অভ্যস্ত হ'য়ে যায়, আমরা আত্মার শোভা, পরমাত্মার মহিমা দেখতে পাই না,—শরীর রাজ্যেই থাকি, আত্মাকে ভু'লে যাই। সংসারকেই সত্য এবং বড় মনে হয়, পরমধনের কথা ভু'লে থাকি। "এষাস্য পরমাসম্পদ্" তা ভু'লে যাই। আমরা যে সেই পরম ধনের অধিকারী—We are all rich in God (আমরা সকলেই সেই পরমধনে ধনী) তা যখন আমরা ভু'লে যাই, তখন আর আমরা মানুষ থাকি না। আমাদের অবস্থাও ঐ কারাবাসীর ন্যায়ই হয়—আমরা বিষয়-বিষে ডুবিয়া সংসারে মজিয়া থাকিতেই চাই, পরমধনের মূল্য বুঝিতে পারি না, তাহা ভাল লাগে না।

উৎসব আমাদিগকে সেই কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে"—We are all rich in God." আমরা যেন ইহা ভুলিয়া আর সংসারের তুচ্ছ ধন মানকে বড় মনে করিয়া পরম ধনকে অগ্রাহ্য না করি, আবার বিষয়ের অভ্যস্ত সেবায় নিযুক্ত না হই।

অপরাহ্ণে লাইব্রেরীর দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। তাহাতে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সভাপতির কার্য্য, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রার্থনা এবং শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য বক্তৃতা করেন।

সায়ংকালে মন্দিরে ইংরেজীতে উপাসনা। পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ আচার্য্যের কার্য্য করেন।

১৬ই মাঘ (২৯শে জানুয়ারী) রবিবার— প্রাতে উপাসনা। শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন অসুস্থ হওয়াতে শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার নিবেদনের মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

পাওয়া অপেক্ষা রক্ষা করা অনেক কঠিন। আমরা সকলেই জীবনে করুণাময়ের কৃপার দান অনেক পাইয়াছি। অনেকেই তাহার অধিকাংশ সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারি নাই,—রাখিতে পারিলে কখনও আমাদের এরূপ দৈন্য দশা ঘটিত না। এই উৎসবেও আমরা অনেক অমূল্য দান পাইয়াছি। সে সমস্ত জীবনে সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হইবে। শুধু পাওয়ার দ্বারা, উপার্জ্জনের দ্বারা, ধনী হওয়া যায় না,—একমাত্র রক্ষার দ্বারা, সঞ্চয়ের দ্বারাই ধনী হওয়া সম্ভবপর। প্রাপ্ত বা উপার্জ্জিত ধন যত প্রচুরই হউক না কেন, অত্যধিক অপব্যয় করিয়া নষ্ট করিলে নিঃশেষিত হইয়া যাইবেই, অচিরে দৈন্য দশা উপস্থিত হইবেই। এই হেতু, যাহা পাই তাহা কেন রাখিতে পারি না, কেন অল্প সময়ের মধ্যেই হারাইয়া ফেলি, এবং কি উপায়ে তাহা জীবনে সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারি, সে কথাটা আজ উৎসবের শেষ দিনে একটু চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক।

এ বিষয়ে প্রথম কথা, মূল্য বোধ—যাহা পাইয়াছি তাহাকে যদি অমূল্য ও দুষ্প্রাপ্য মনে না করিয়া অকিঞ্চিৎকর ও সহজ-লভ্য মনে করি, তবে তাহা রক্ষা করিবার জন্য আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা, চেষ্টা যত্ন থাকিবে কেন? এই পরমধন ব্যতীত আর সমস্তই যে বৃথা, জীবন ব্যর্থ, ইহা যে আমরা ইচ্ছা করিবামাত্রই অথবা শুধু নিজের শক্তিতে পাইতে পারি না, তাহা অনুভব করিলে, আমরা অবশ্যম্ভাবীরূপেই ইহাকে সর্ব্বপ্রযত্নে ধরিয়া রাখিবার জন্য আগ্রহান্বিত ও যত্নশীল হইব,—যাহাতে কোনও প্রকারে ইহা হারাইয়া না ফেলি তাহার জন্য বিশেষ সতর্ক ও সাবধান হইব। অর্থ সঞ্চয় ও রক্ষা সম্বন্ধে শুধু কৃপণগণ নয়, সংসারের সকলেই কত ব্যস্ত ও সতর্ক! যাহারা বায়কুণ্ঠ নহে, তাহারাও দস্যু, তস্কর, পকেটমার যাহাতে তাহা হরণ করিতে না পারে, সে জন্য কত সাবধান ও সতর্ক,—অনেক সময় কত ভয়চকিত। এই সংসারে আমাদের পরমধন হরণ করিতে নিযুক্ত দস্যু তস্কর পকেটমারও অনেক আছে। আমরা সঙ্গীতে গান করি —"হারাই, হারাই সদা ভয় হয়, হারাইয়া ফেলি চকিতে।" কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমরা সর্ব্বদা যে হারাইয়া ফেলবার ভয়ে ভীত, বেশী সময় যে আমাদের প্রাণে সেরূপ ভয় থাকে, তাহা বলিতে পারি না। যদি সেরূপ ভয়ে ভীত হইতাম, তবে নিশ্চয়ই আরো অধিকতর সাবধান ও সতর্ক থাকতাম। চকিতে যে হারাইয়া ফেলি সে কথা অতীব সত্য,—সে অভিজ্ঞতা বোধ হয় আমাদের অনেকেরই জীবনে ঘটিয়াছে। কত চকিতে যে হারাইয়া ফেলি, তাহার একটি দৃষ্টান্ত নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে দিতেছি।

দীক্ষা গ্রহণের অব্যবহিত পরে, নোয়াখালীতে অবস্থান কালে, আমি প্রাতঃ সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে যাইয়া ব্যক্তিগত উপাসনা সম্পন্ন করিতাম। করুণাময়ের কৃপায় সে সময়ে বেশ একটা

ভাল অবস্থাতেই জীবন চলিতেছিল,—প্রতিদিনই উপাসনার মধ্যে সরসতা ও মধুরতা ভোগ করিতেছিলাম। একদিন প্রাতঃকালীন উপাসনা সেভাবেই সম্পন্ন হইল। মধ্যাহ্নে স্নান করিবার সময় একবার হঠাৎ চক্ষু তুলিয়া দেখিতে পাইলাম, পুকুরের অপর পারে একটি ভদ্রলোক পূজা করিতে করিতে একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে কি কথা বলিতেছে। কাজটা একটু বিসদৃশ মনে হইল, কিন্তু সেদিকে বিশেষ কোনও মনোযোগ দিলাম না, অবিলম্বে বাড়ী চলিয়া আসিলাম—একবার মাত্র দৃষ্টিপথে পড়িয়াছিল, পরে তাহা ভুলিয়াও গেলাম। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যার সময় উপাসনা করিতে যাইয়া দেখি, কিছুতেই উপাসনা আর সরস হইতেছে না, সমস্ত শুষ্ক, যেন শূন্যে উড়িয়া যাইতেছে। কোন্ অপরাধে এরূপ ঘটিল তাহা নির্ণয়ের জন্য সমস্ত দিনের ঘটনা তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলাম,—স্বভাবতঃই স্নানের সময়ের ঘটনাটা বার বার বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিলাম, তাহার মধ্যে হৃদয়ের কোনও বিকৃতি খুঁজিয়া পাইলাম না। কোনও একটা বিশেষ পাপপ্রবৃত্তির উদয় হইয়াছিল কি না, তাহাই আমার সূক্ষ্ম বিচারের বিষয় হইয়াছিল। কিন্তু তাহার কোনও পরিচয় পাইলাম না। এই অবস্থায় দুই তিন দিন কাটিয়া গেল। শুধু দুই বেলা উপাসনার সময় নয়, অন্য সময়েও, পথে ঘাটে চলিতে ফিরিতেও, সেই আত্ম-পরীক্ষা ও দুঃখ বেদনা প্রার্থনাদি চলিতে লাগিল। অবশেষে বুঝিতে পারিলাম যে, সেই ভদ্রলোকটির উপরে একটু ঘৃণার ভাব তখন হৃদয়ে জাগিয়াছিল, তৎসঙ্গে লুক্কায়িত ভাবে অহংকারও হয়ত কিছু ছিল। তখন স্বভাবতঃই সেজন্য বিশেষ ভাবে অনুতপ্ত হইলাম, এবং করুণাময়ের কৃপায় আবার পূর্ব্বাবস্থা লাভ করিতে সমর্থ হইলাম। জীবনে এরূপ আরও অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। অতি উচ্চ অবস্থা লাভ করিয়াও যে আমরা তাহাতে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারি না, অতি চকিতেই তাহা হইতে পতিত হই, অলক্ষিতে সমস্তই হারাইয়া ফেলি, সে কথা অধিক করিয়া বলিবার কোনও প্রয়োজন নাই। না হারাইয়া কি প্রকারে ধরিয়া রাখা যায়, তাহাই প্রধান কথা।

এই পরমধনকে কৃপণের ন্যায়ই অতি সতর্ক দৃষ্টিতে রক্ষা করিতে হইবে সত্য, কিন্তু তাহার ন্যায় লোহার সিন্দুকে আবদ্ধ বা মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত করিয়া রাখিলেই কি উহা রক্ষিত হইবে? তাহাতে ত উহা কখনও সুরক্ষিত হইবে না। উহাকে ব্যবহারও করিতে হইবে, বর্দ্ধিতও করিতে হইবে—একমাত্র তাহা হইলেই উহা সুরক্ষিত হইবে, জীবনে সঞ্চিত থাকিবে। যিশু-কথিত দশ মুদ্রার আখ্যায়িকা (Parable of the Ten Talents) আমাদের সকলেরই সুপরিজ্ঞাত,—যে ভৃত্য প্রভুদত্ত মুদ্রা ব্যবহার করিয়া বর্দ্ধিত করিয়াছিল সে আরও পাইল, আর যে উহা মাটির নীচে পুতিয়া রাখিয়াছিল সে তাহা হইতেও বঞ্চিত হইল। কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে, ব্যবহার করিতে হইবে বলিয়াই যে বড় বড় কাজে নিযুক্ত থাকিতে হইবে, ব্যস্ততার সহিত অগ্রসর হইয়া সকল কাজে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে, এমন কোনও কথা নাই। বরং তাহা অনেক সময় অনিষ্টকরও হইতে পারে, অপচয়ের হেতুভূত হইয়া দাঁড়াইতে পারে। নীরবে স্থির ভাবে এক কোণে সকলের পশ্চাতে বসিয়া থাকিলেও কাজ করা যে না হইতে পারে, এমন নহে। কবি মিল্‌টন্ সত্য কথাই বলিয়াছেন—They also serve who only stand and wait—যাহারা শুধু দাঁড়াইয়া (প্রভুর আজ্ঞার জন্য) প্রতীক্ষা করে তাহারাও (প্রভু পরমেশ্বরেরই) সেবা করে। বস্তুতঃ জীবনবিধাতার নির্দ্দেশানুযায়ী পথে চলাই আমাদের একমাত্র কাজ, সেই সেবাই প্রকৃত সেবা। তাঁহার নির্দ্দেশে বিনা কাজে বসিয়া থাকিলেও মহৎ কার্য্য সাধিত হইতে পারে; আর, সেদিকে লক্ষ্য না রাখিয়া, অথবা তাহা অগ্রাহ্য করিয়া, অতি বড় কাজে নিযুক্ত হইলেও, সে কাজ অকাজ হইতে পারে, অকল্যাণ ও অধঃপতনের কারণস্বরূপ হইতে পারে। তাই সর্ব্বাগ্রে তাঁহার নির্দ্দেশের জন্যই সর্ব্বদা প্রতীক্ষা করিতে হইবে। তাহাতেই নিজের ও অপর সকলের উন্নতি ও কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। সত্য জীবনের প্রভাব বাহিরের কাজ ব্যতীতও আপনা আপনি চারিদিকে বিস্তারলাভ করে। সে জন্য ব্যস্ত হইবার কোনও প্রয়োজনই নাই। নিজে উঠিলে, সঙ্গে সঙ্গে অপরেও উঠিবে,—যাহাতে নিজের প্রকৃত কল্যাণ তাহাতে অপর সকলেরও কল্যাণ নিশ্চয় সাধিত হইবে! তাহা ব্যতীত যত কাজই করা যাউক না কেন, সবই ব্যর্থ হইবে, তদ্দ্বারা কাহারও কোনও কল্যাণ সাধিত হইবে না। তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে চলা ভিন্ন অন্য কোনও উপায়েই নিজের বা অপর কাহারও কোনও প্রকার কল্যাণ সাধন করা সম্ভবপর নহে।

এই জন্যই সর্ব্বদা তাঁহার অনুগত জীবন যাপন করিতে হইবে, সকল সময়ে সকল প্রকারে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ যোগে যুক্ত থাকিবার জন্য আকাঙ্ক্ষিত ও চেষ্টিত হইতে হইবে—পথে ঘাটে চলিতে ফিরিতেও প্রার্থনা ও আত্মপরীক্ষায় নিযুক্ত থাকিতে হইবে। এ বিষয়ে রাজর্ষি রামমোহন সম্বন্ধে কুমারী হেয়ার যে সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহা আমরা সকলেই জানি। তাঁহার সেই দৃষ্টান্ত আমাদিগকে অনুসরণ করিতে হইবে। শুধু তত্ত্ব জানিলে বা বলিলে কিছুই হইবে না, তদনুসারে কাজ করিতে হইবে, তাহাকে জীবনে পরিণত করিতে হইবে। সে দিন ধীরেন্দ্র বাবু যে তাঁহার উপদেশে বলিয়াছেন—তত্ত্ব ও বস্তু এক নহে, Philosophy এবং Life এক নয়, সত্য বস্তু পাইতে হইবে, সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে—সে-কথা আমাদিকে বিশেষ ভাবে মনে রাখিতে হইবে। তত্ত্ব জানিবার কোনও প্রয়োজন নাই, এমন কথা কেহ বলিতেছে না। শুধু তত্ত্ব জানিয়া সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না, সাক্ষাৎ ভাবে সত্যরূপে বস্তু লাভ না করিলে সমস্তই বৃথা, এই কথাই বলা হইতেছে। কল্পনার রথে আরোহণ করিয়া সপ্তম স্বর্গে উঠিবার জন্য ব্যস্ত ও চেষ্টিত হইলে কোনই লাভ নাই। তাহা অপেক্ষা নিম্নতম সত্য ভূমির উপর দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে পা পা করিয়া উঠিতে ও চলিতে পারিলেই অধিকতর লাভ—তাহাতেই উন্নতি ও কল্যাণ সুনিশ্চিত।

আমাদিগকে এই ভাবে এক পা করিয়াই চলিতে হইবে, উঠিতে হইবে।

ক্ষুদ্রতমের জন্যও অনন্ত উন্নতি আছে। কাহারই উন্নতির পথ চিরতরে রুদ্ধ নহে। আর, কাহারও পক্ষেই এক লম্ফে উন্নতির উচ্চ শিখরে উপনীত হওয়াও সম্ভবপর নহে। বিধাতা প্রত্যেকের জন্যই কিছু কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, প্রত্যেকেরই করণীয় কাজ কিছু আছে। কোনও কাজ প্রকৃত পক্ষে ক্ষুদ্র নহে, উপেক্ষণীয় নহে। ক্ষুদ্রতম কাজও মহৎভাবে সম্পন্ন করা যায়, আর মহত্তম কাজও অতি ক্ষুদ্র ভাবে সম্পাদিত হইতে পারে। আমরা কি ভাবে আমাদের কাজ করি, কর্ত্তব্য সম্পাদন করি, তাহার উপরই আমাদের উন্নতি অবনতি নির্ভর করে—বিশেষ কোনও কাজের উপরে নহে। আমরা যদি জীবনবিধাতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, তাঁহার নির্দ্দেশ মানিয়া পথ চলিতে পারি, আমাদের কাজগুলি করিয়া যাইতে পারি, তাহা হইলেই জীবন সার্থক হইবে—নিজের ও অপর সকলের কল্যাণ ও উন্নতি পথের সহায়তা অব্যর্থরূপে সাধিত হইবে। আমাদের সে জন্য আর চিন্তা ভাবনা করিতে হইবে না।

আমরা যদি শুধু এইটুকু জীবনে সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারি, তবে আর আমাদের উৎসব কোনও ক্রমেই নিষ্ফল হইবে না, বিশেষ ভাবেই সার্থক হইবে। করুণাময় পিতা কৃপা করুন, আমরা যেন তাঁহার দান সযত্নে রক্ষা করিতে পারি; উদাসীনতা অবহেলাতে বা ক্ষুদ্র সাংসারিকতার হাতে আপনাদিগকে ছাড়িয়া দিয়া পরম ধন হারাইয়া না ফেলি, নিজেদের ও অপরের সর্ব্বনাশ সাধন না করি। তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের প্রত্যেকের জীবনে ও সমগ্র সমাজে জয়যুক্ত হউক। উৎসবের শুভ ফল আমাদের মধ্যে স্থায়ী হউক।

মধ্যাহ্নে উদ্যান-সম্মিলন। তথাকার উপাসনাতে শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করেন। সায়ংকালে মন্দিরে উপাসনায় শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ আচার্য্যের কার্য্য করেন। "ধর্ম্ম—তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক" বিষয়ে তিনি যে উপদেশ প্রদান করেন তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল:—

এবার আমরা শোকের ভার বহন করিয়া মাঘোৎসবের দ্বারে প্রবেশ করিয়াছিলাম। ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহী অক্লান্ত ও একনিষ্ঠ সেবক ভাই হেমচন্দ্র ও ভাই ললিতমোহন অল্প দিন পূর্ব্বে ইহলোক ত্যাগ করিলেন; আমরা উৎসব আরম্ভ হইবার এক সপ্তাহ পূর্ব্বে ভাই হেমচন্দ্রের ও উদ্বোধন-দিবসের প্রাতঃকালে ভাই ললিতমোহনের স্মৃতি-তর্পণ করিলাম। বহু বৎসর ধরিয়া উৎসবে যে দুটী অনুরাগ-দীপ্ত মুখ দেখিয়া আমরা উৎসাহ ও আনন্দ পাইয়াছি, আজ তাহা দৃষ্টিপথের বহির্ভূত। তাঁহাদিগের স্মৃতি ধন্য হউক। আর, যিনি সুদীর্ঘকাল ১১ই মাঘের প্রাতঃ বা সন্ধ্যায় বেদি গ্রহণ করিয়া উপাসকদিগকে তৃপ্তি দিয়া আসিতেছিলেন, সেই পূজনীয় হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের মহাশয় অসুস্থতার জন্য দূরে বাস করিতেছেন, এই বেদনাও আমাদিগকে ব্যথিত করিতেছে। ঈশ্বর তাঁহাকে নিরাময় করুন।

বাল্যকালে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের দুই একটী মহোৎসব দেখিয়াছিলাম। ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উহা হইতে ভিন্ন প্রকৃতির। কলিকাতায় ও তাহার বাহিরে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর মাঘোৎসবে যোগ দিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে। দেখিয়া আসিতেছি, উহাতে ধর্ম্মের জ্ঞানাঙ্গ ও ভাবাঙ্গ দুইই সমভাবে স্থান পাইয়া আসিতেছে। এক দিকে যেমন উপাসনা, সঙ্গীত, সঙ্কীর্ত্তন, শাস্ত্রপাঠ ব্যাকুলাত্মাদিগকে ব্রহ্মোপলব্ধির সাহায্য করিতেছে, তেমনি অপর দিকে বক্তৃতা ও উপদেশের দ্বারা সত্য ধর্ম্মের তত্ত্বসকলও ব্যাখ্যাত ও প্রচারিত হইতেছে।

এবারও তাহাই হইয়াছে। উৎসবের স্বরূপ; সাধনের পঞ্চ তত্ত্ব; উপাসক মণ্ডলীর প্রকৃতি ও প্রয়োজনীয়তা; প্রাণবান্ ধর্ম্মের চারি লক্ষণ—আশা, আনন্দ, নবযুগের উপযোগী আদেশ গ্রহণ এবং আনুগত্য; ধর্ম্মের মধুকোষ; ব্যক্তিগত জীবনে ব্রহ্মকৃপার জাজ্বল্যমান প্রকাশ—এইরূপ আরও কত উপদেশ উপাসকগণের চিত্তে রসধারা ঢালিয়া দিয়াছে, প্রাণকে ধর্ম্মের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার জন্য আকুল করিয়াছে. জীবনের নিত্য নৈমিত্তিক সকল ঘটনায় মায়ের আঁচলধরা শিশুর মত পরমমাতার সঙ্গে থাকিতে হইবে, সাধনের এই গূঢ় কথা বুঝাইয়া দিয়াছে। আবার, কেহ কেহ বক্তৃতায় ও উপদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের দার্শনিক ভিত্তি, ব্রাহ্মসমাজে ভক্তির অভিব্যক্তি, সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রসমস্যা জীবনের পূর্ণতা ও মাধুর্য্য প্রভৃতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ফলতঃ ধর্ম্মের তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক, উভয় দিকেই আমাদিগের দৃষ্টি নূতন করিয়া আকর্ষণ করা হইয়াছে।

যাঁহারা বলেন, ব্রাহ্মধর্ম্মের তত্ত্বালোচনার প্রয়োজন অতীত হইয়াছে, তাঁহাদিগের কথায় সায় দিতে পারিতেছি না। নব প্রকাশিত প্রত্যেক ধর্ম্মকেই অগ্রে নিজের মত ও বিশ্বাস প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। প্রথমে প্রচার, তৎপরে প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠা কার্য্যটী সংগ্রামসাপেক্ষ। বিরোধী মতবাদ খণ্ডন করিয়া স্বীয় মত যুক্তিদ্বারা দার্শনিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে তবে নবধর্ম্ম টিঁকিয়া থাকিতে পারে, নতুবা উহার তিরোধান অনিবার্য্য। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসও ইহাই বলিতেছে। রামমোহন প্রায় ২০ বৎসর ধরিয়া শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা ব্রহ্মোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া পরে ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠিত করেন; তাঁহার অনুবর্ত্তীরা উত্তরকালে ব্রাহ্মধর্ম্মের দার্শনিক ভিত্তি গড়িয়া তুলিবার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। এই তত্ত্বপ্রচার ও তত্ত্ববিচারের কার্য্য দুই এক বৎসরে বা দুই এক যুগে আবদ্ধ থাকিলে ধর্ম্মের সজীবতা রক্ষিত হয় না। কেন না, প্রত্যেক ধর্ম্মকেই যুগে যুগে নূতন নূতন সমস্যার সমাধান করিতে হয়; তাই দেখিতে পাই, প্রায় দুই সহস্র বৎসর পরেও "খৃষ্টধর্ম্মের মূলতত্ত্ব" (The fundamental Ideas of Christianity) ইত্যাকার অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হইতেছে।

অনেকের ধারণা, ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসমূহ এদেশে যথেষ্ট প্রচারিত হইয়াছে, এখন উহার প্রচার নিষ্প্রয়োজন, কেন না, ওগুলি শিক্ষিত সমাজে সুবিদিত হইয়া পড়িয়াছে; উহাতে নূতনত্বের চাক্‌চিক্য কিছুই নাই, এক্ষণে মত ছাড়িয়া জীবনের কথাই বেশী বলা উচিত। ইহার উত্তরে দুইটী কথা বলিবার আছে। প্রথমতঃ, বিশুদ্ধ ধর্ম্মতত্ত্বসমূহ সত্য সত্যই কি দেশ মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে? ব্রহ্ম ও মানবাত্মার স্বরূপ, নিরাকার ব্রহ্মপূজা, ধর্ম্মপ্রভাবে মানবাত্মার সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ, ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্ব—এবং এই বিশ্বাসানুগত পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র—এই সকল তত্ত্ব কি দেশবাসীরা অধিকাংশই বুঝিয়াছে ও মানিয়া লইয়াছে? ব্রাহ্মসমাজের বাহিরের লোকের কথায় কাজ কি? প্রাচীন কর্ম্মীরা যাঁহাদের হাতে ব্রাহ্মসমাজ রাখিয়া একে একে অপসৃত হইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যেই সকলের কি ব্রাহ্মধর্ম্ম জিনিসটা কি, সে সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা আছে? যদি থাকিবে, তবে অনেকেরই ব্রহ্মোপাসনায় রুচি নাই কেন? তবে তাহারা উৎসবের বহিরঙ্গে যে আনন্দ পায়, অন্তরঙ্গসাধনে তাহার শতাংশের একাংশও পায় না কেন? তবে ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরোধী আচার অনুষ্ঠানের প্রতি সর্ব্বত্র সকল সময়ে তাহাদের তীব্র বিরাগ দেখা যায় না কেন? না, এখনও ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে ও বাহিরে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশুদ্ধ মত প্রচারের একান্ত প্রয়োজন বিদ্যমান রহিয়াছে।

কিন্তু ধর্ম্মের তত্ত্বই উহার সবখানি নয়; উহার আর একটী দিক্ আছে, তাহা ব্যবহার। তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক, এই দুইখানি পাখার সাহায্যে ধর্ম্ম চলমান, উন্নতিশীল ও অনুবর্ত্তী-আহরণক্ষম থাকে। তত্ত্ব ও ব্যবহার, এই দুইটীর কোনটিই নিরর্থক ও উপেক্ষণীয় নহে। কেন না, এই উভয়ের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। নির্ম্মল তত্ত্বের আলোকে পথ দেখিতে না পাইলে, ব্যবহার নিষ্কলঙ্ক হয় না। আবার, যে ধর্ম্ম শুধু তত্ত্বেতেই সুষুপ্ত থাকে, যাহা ব্যবহারে আইসে না, কাজে লাগে না, অনুদিন পালিত হয় না, জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে না, তাহা নিষ্ফল ও মৃত।

ধর্ম্মের ব্যবহার বলিতে আমরা বুঝি জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে ধর্ম্মানুবর্ত্তিতা। ঈশ্বর অন্তরে ও বাহিরে সকল সময়ে সমভাবে বিদ্যমান আছেন, এই বিশ্বাস যতদিন চঞ্চল থাকে, ততদিন জীবনে ধর্ম্মানুবর্ত্তিতা স্থায়ী হয় না। ব্যাবহারিক ধর্ম্মেরও দুইটী অঙ্গ—একটী বহিরঙ্গ, অপরটী অন্তরঙ্গ; একটী বাহ্য, অপরটী ...ক একটী ধর্ম্মের বহিঃপ্রকোষ্ঠ, জনসমাজের স... আদানপ্রদানের কক্ষ; অপরটী অন্তঃপ্রকোষ্ঠ, জীবনদেবতার প্রকাশমন্দির, মানবাত্মার যোগভূমি; তথায় "তুমি আর আমি, মাঝে কেহ নাই।"

যে ধর্ম্মের ব্যাবহারিক প্রভাব যত অধিক, তাহা তত উত্তরোত্তর প্রবর্দ্ধমান গতিবেগে দেশে দেশে প্রসারিত হয়। খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারের প্রথম দুই শতাব্দীর ইতিহাস হইতে ইহার দৃষ্টান্ত গ্রহণ করি। খৃষ্টধর্ম্ম ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের বিবরণে তিন বিষয়ে ঐক্য আছে। প্রথমতঃ, খৃষ্টধর্ম্মও ব্রাহ্মধর্ম্মের ন্যায় অগ্রে নগরে নগরে প্রচারিত ও গৃহীত হইয়াছিল; উহা অনেক বিলম্বে গ্রামে ও জনপদে প্রবেশ করে। ব্রাহ্মধর্ম্মও প্রথম শতাব্দীতে প্রধানতঃ নগরেই আবদ্ধ রহিয়াছে; গ্রামে গ্রামে উহার বার্ত্তা অল্পই পঁহুছিয়াছে। তৎপরে বিপুল রোমক সাম্রাজ্যের শান্তি ও সুশাসন খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকগণের দূর দূরান্তরে ভ্রমণের পথ সুগম করিয়া দিয়াছিল; বৃটিশ সাম্রাজ্যের শান্তি ও সুশাসনও তেমনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকগণের পরিব্রজ্যা সহজসাধ্য করিয়া রাখিয়াছে। একটী পার্থক্য এই, রোমক সম্রাটেরা খৃষ্টধর্ম্মের বিরোধী ছিলেন, তাঁহারা নিগ্রহ দ্বারা পুনঃ পুনঃ তাহার উচ্ছেদসাধনের প্রয়াস পাইয়াছেন; বৃটিশ সাম্রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষ ধর্ম্মবিষয়ে নিরপেক্ষ; তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের প্রতিকূলতা করেন না, বিশেষ আনুকূল্যও করেন না। পরিশেষে এই দুই ধর্ম্মের ব্যাবহারিক প্রভাবের কথা বলা যাইতেছে।

প্রথম যুগে খৃষ্টধর্ম্মের বিরোধীরা উহাকে জনসমাজে হেয় করিবার জন্য বলিতেন, যে যত মুচি, তাঁতি, চামড়ার কারিগর, অশিক্ষিত ও ভব্যতাবর্জ্জিত লোকই ঐ ধর্ম্মের উৎসাহী প্রচারক, এবং স্ত্রীলোক ও বালক বালিকারাই তাহাদিগের প্রথম ও প্রধান প্রচারক্ষেত্র। অথচ এই শ্রেণীর লোকের প্রচেষ্টাতেই খৃষ্টধর্ম্ম ধীরে ধীরে রোমকসাম্রাজ্যে পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল। ইহার কারণ কি? কারণ, ঐ ধর্ম্ম অনুবর্ত্তীদিগকে সত্য সত্যই নবজীবন দান করিত। অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন ও যাদুমন্ত্র উহার প্রচারে স্থান না পাইয়াছিল, তাহা নয়; কিন্তু উহার উপরে জোর দিলে খ্রীষ্টধর্ম্মের অন্তঃপ্রকৃতি বুঝিতে ভুল হইবে। সেকালে দেবোপাসকগণের মধ্যে কুসংস্কার বড় প্রবল ছিল; বহু নরনারী আপনাদিগকে ভূতাবিষ্ট ভাবিয়া ঘোরতর দুঃখে নিমগ্ন থাকিত। এই সকল লোক আর্ত্তত্রাণ পরিত্রাতা ঈশার শরণ লইয়া এবং তাঁহার শিষ্যদিগের সহিত পূজা ও প্রার্থনা করিয়া প্রাণে শান্তি পাইত; তাহাদিগের অন্তরের দুর্দ্দম সংগ্রাম থামিয়া যাইত। যাহারা এই নবধর্ম্মের আশ্রয় লইত, ঈশ্বরের কৃপা অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগের সমগ্র প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত করিয়া দিত। ঈশ্বরের শক্তি যেমন তাহাদিগের আত্মিক জীবনে প্রভাব বিস্তার করিত, তেমনি প্রত্যেকের পারিবারিক ও সামাজিক ব্যবহারে উহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাইয়া দেবোপাসকেরা মুগ্ধ হইয়া যাইত। তাহারা দেখিত, দেশব্যাপী পাপাচার ও দুর্নীতির মধ্যে বাস করিয়াও ঈশপন্থীরা ধর্ম্মপথ হইতে রেখামাত্র চ্যুত হয় না; সর্ব্বজনীন স্বার্থপরতা ও অবিশ্বাসের মধ্যেও তাহারা পরস্পর মরণজয়ী প্রেমে একসূত্রে গ্রথিত; নির্ব্বীর্য্য বিলাসিতার যুগে তাহাদিগের ধর্ম্মোৎসাহ জীবনে অপরিসীম বল সঞ্চয় করিতেছে; বীরোচিত জলন্ত বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহারা অকুণ্ঠিতচিত্তে অবর্ণনীয় দৈহিক যন্ত্রণা পদদলিত করিয়া ধর্ম্মের জন্য আপনাদিগকে আহুতি দিতেছে। একজন লিখিয়াছেন, 'তোমরা আমাদিগের সমাজে অনেক অজ্ঞ লোক শ্রমজীবী ও বৃদ্ধা নারী দেখিতে পাইবে। তাহারা কথাদ্বারা আপনাদের ধর্ম্মের জীবনপ্রদশক্তি সপ্রমাণ করিতে পারিবে না, তাহাদিগের সৎকর্ম্মই উহার

পাবনীশক্তির প্রভাব প্রদর্শন করিতেছে। তাহারা বাক্য কণ্ঠস্থ করে না, কিন্তু শোভন কর্ম্ম প্রকটিত করে; আঘাত পাইলে তাহারা প্রতি আঘাত করে না; ধন অপহৃত হইলে তাহারা রাজদ্বারে অভিযোগ করে না; তাহারা প্রার্থীকে দান করে ও প্রতিবেশীকে আত্মবৎ ভালবাসে। খৃষ্টধর্ম্মের এই ব্যাবহারিক প্রভাবেই কত কত পরিবার জননী ও পত্নীদিগের দ্বারা নবধর্ম্মের আশ্রয়ে আনীত হইয়াছিল। "জীবন হইতেই জীবন সঞ্চারিত হয়" ইহার শত শত দৃষ্টান্ত এই ধর্ম্মের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। ভক্তিভাজন শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখে প্রাথমিক সময়ের ইহার একটি দৃষ্টান্ত শুনিয়াছিলাম। এক খৃষ্টীয় দাস জনতার তাড়নায় প্রাণভয়ে দৌড়াইতে দৌড়াইতে একজন সম্ভ্রান্ত রোমক ভদ্রলোকের বাসবাটির প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করে। তিনি তাহাকে বিপন্ন দেখিয়া গৃহে লুকাইয়া রাখেন। সে ওই গৃহে সপ্তাহ কাল বাস করিয়াছিল। তাহার জীবনের সুগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া সমগ্র পরিবারটি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে।

আপনারা যদি বৃহতের সহিত ক্ষুদ্রের তুলনায় দোষ না ধরেন. তবে বলিতে পারি, প্রথম শতাব্দীতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের ইতিহাসও অনেকটা এই প্রকার। কে না জানে, ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাবে কত পাপী নবজীবন লাভ করিয়াছে—মদ্যপায়ী মদ ছাড়িয়াছে, ব্যভিচারী নির্ম্মল চরিত্রের অধিকারী হইয়াছে, উৎকোচগ্রাহী উৎকোচার্জ্জিত সমুদায় ধন বিলাইয়া দিয়াছে, যে ব্যক্তি ভুলেও সত্য কথা বলিত না, সে সত্যের জন্য সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে নাই। এমন সময় ছিল, যখন ব্রাহ্মকে দেখিলেই লোকে চিনিতে পারিত; যখন সে বিবেকানুগত্যের জন্য লঘুপ্রকৃতি মানুষের বিদ্রূপের পাত্র ছিল; যখন সে ধর্ম্মের খাতিরে অকাতরে পৈত্রিক সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া রিক্ততা বরণ করিত। লোকব্যবহারে ব্রাহ্মের জীবনে ধর্ম্মের লক্ষণ ফুটিয়া উঠিত বলিয়াই প্রাচীন সমাজ হইতে দলে দলে লোক আসিয়া নবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। যে সকল শিক্ষিত লোক মুখে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেন, তাঁহারাও অন্তরে অন্তরে ব্রাহ্মদিগকে শ্রদ্ধার চক্ষুতে দেখিতেন!

কিন্তু ইহাও বাহ্য। ইহারও আগে কহিবার কিছু আছে। তাহা এই যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম নরনারী সাধারণের পক্ষে সাক্ষাৎ ব্রহ্মযোগ সাধ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে, এবং বহুজীবনে তাহা সাধিতও হইয়াছে। "ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মধ্যান ব্রহ্মানন্দরসপান" ব্রাহ্মের আদর্শ; কাহারও জীবনে এই আদর্শ উজ্জ্বল রূপে প্রতিফলিত হইয়াছে, কেহ উহা হইতে অনেক দূরে রহিয়াছেন; কিন্তু সকলেরই লক্ষ্য এক। সাধনপথে কতজন বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন; কাহারও কাহারও যাত্রা সবে আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু অগ্র পশ্চাৎ সকলেই সহযাত্রী, সকলেরই কাম্যবস্তু সাক্ষাৎ ব্রহ্মানুভূতি, ব্রহ্মানুগত জীবন, ব্রহ্মস্বভাব লাভ। এসকলেরই তারতম্য আছে, অল্প ও অধিক আছে; উজ্জ্বলতা ও নিষ্প্রভতা আছে; কিন্তু আমরা বলি, সে ধর্ম্ম ধর্ম্মই নহে, যাহা দুর্ব্বল ও সবল, ক্ষীণ বিশ্বাসী ও অটল বিশ্বাসী, ভক্ত ও অভক্ত, পাপী ও পুণ্যবান্, সকলকেই সমভাবে উপাস্যকে উপাসকের পিতা মাতা সখা ও বন্ধুরূপে জানিবার ও পাইবার শিক্ষা না দেয়। ধর্ম্মের প্রধান কার্য্য তাপিত জনকে শান্তি দেওয়া, দুর্ব্বলকে তুলিয়া ধরা, পতিতের উদ্ধার সাধন, উপাসককে ভূমানন্দের আস্বাদন দান। পরমাত্মা ও জীবাত্মার অপরোক্ষ ও অব্যবহিত সম্বন্ধের উপলব্ধি ব্যতিরেকে ধর্ম্মের এই নিগূঢ় ক্রিয়াটী সম্পন্ন হইতে পারে না। ধর্ম্মের অন্তরঙ্গ সাধনে আমরা কত দরিদ্র! কিন্তু ব্রহ্ম যে আমাদের প্রত্যেকের জীবনে নিত্য কত কৃপার ধারা বর্ষণ করিতেছেন, তাহা কি অস্বীকার করিতে পারি? তিনি প্রাণে কথা বলেন, শোকে সান্ত্বনা দেন, ভয়ে অভয়বাণী শুনাইয়া প্রাণে বলের সঞ্চার করেন, জীবনের সকল অন্ধকার অশান্তি ও উদ্বেগের মধ্যে মায়ের মত আমাদিগকে স্নেহাঞ্চলে ঘিরিয়া রাখেন—আজ কি আমরা এই সাক্ষ্য দিতে সঙ্কুচিত হইব? ১০ই মাঘ রাত্রিতে আচার্য্য স্বীয় জীবনে ব্রহ্মকৃপার কয়েকটি মনোহর দৃষ্টান্ত দিলেন। আমাদের প্রত্যেকের জীবনই কি পূর্ব্বাপর ব্রহ্মকৃপার প্রবহমান কাহিনী নয়? হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে জীবনদেবতার চরণতলে বসিয়া তাঁহার নীরব বাণী শুনিয়া, তাঁহার ইঙ্গিত পাইয়া, তাঁহার স্নেহসুধায় সিক্ত হইয়া, তাঁহার মৃতসঞ্জীবন স্পর্শে ঘোর বিষাদের মধ্যে আশা ও উৎসাহ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, আমাদিগের মধ্যে এমন ব্যক্তি কি একান্তই বিরল? বৈষ্ণব শাস্ত্রে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের সাধন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। আমরা জ্ঞাতসারে ঠিক ঐ ক্রম অনুসরণ করি না বটে, কিন্তু আমাদিগকেও দাসরূপে পরম প্রভুর আদেশ জানিতে ও বহন করিতে হয়; আমাদের কত সঙ্গীতে তিনি সখা বলিয়া সম্বোধিত হইয়াছেন; নির্জ্জন উপাসনায় ও উৎসবে, অন্তরে ও বিশ্বভুবনে তিনি পুনঃ পুনঃ মধুররূপে প্রাণ মন মুগ্ধ করিতেছেন। যৌবনের উষাকাল হইতে জীবনের অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত পরম পিতার মহিমা-প্রকাশক যত সঙ্গীত গাহিয়াছি, যত ভাবে পরম মাতার স্নেহ উপলব্ধি করিবার প্রয়াস পাইয়াছি, যত ভাষায় অনাথনাথের নিকটে মনোবেদনা নিবেদন করিয়াছি; বয়স, শিক্ষা ও অবস্থাভেদে হয় তো তাহার গভীরতার প্রভেদ হইয়াছে, কিন্তু কোনটীই নিরর্থক হয় নাই। বন্ধুর সহিত কথা বলিবার অধিকারে বঞ্চিত হইয়া গাহিয়াছিলাম—"কত ভালবাস থেকে আড়ালে।" বসন্তে প্রকৃতির সুরম্য শোভা দেখিয়া প্রাণ স্বতঃই বলিয়া উঠিয়াছিল—"তোমারি মধুররূপে ভরেছ ভুবন", পত্নীহারা হইয়া "জানিহে যবে প্রভাত হবে", এই গান গাহিয়া কত সান্ত্বনা পাইয়াছি!

ব্রাহ্মধর্ম্মের ইহাই বিশেষত্ব—ইহা সর্ব্বকালোপযোগী, বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্যে সমভাবে সাধনীয়। উৎসবের মধ্য দিয়া ঈশ্বরের সহিত উপাসকের ব্যক্তিগত সম্বন্ধের দিকটাই উজ্জ্বলতররূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ইহাতেই উৎসবের সার্থকতা।

অনন্তর কিছু সময় সংকীর্ত্তন হইয়া এ বৎসরের উৎসবের কার্য্য শেষ হইল, সকলে প্রণাম আলিঙ্গনাদি করিয়া গৃহে ফিরিলেন।

আমরা অতি অসম্পূর্ণ ভাবেই উৎসবের বিবরণ দিতে সমর্থ হইলাম। আমাদের ক্রটি অনেক। বিস্তৃত ভাবে সকল বিবরণ ও উপদেশের মর্ম্ম লিখিবার যথোচিত ব্যবস্থা আমরা করিতে পারি নাই। কেহ কেহ অনুগ্রহ করিয়া পরে আপনাদের উপদেশের মর্ম্ম লিখিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ। আমরা অল্প সংখ্যক কয়েকটি উপদেশের মর্ম্ম লিখিবার বন্দোবস্ত করিতে পারিয়াছিলাম। যাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া সে ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদেরও নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। দুঃখের বিষয় তাঁহাদের কাহার কাহারও নিকট হইতে এখন পর্য্যন্ত তাহা পাওয়া গেল না। আর যে পাওয়া যাইবে তাহার আশাও খুবই অল্প। আমাদের অযোগ্যতা ও ক্রটির জন্য সকলের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। যাঁহারা উৎসবে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাঁহারা ইহা হইতে যাহাতে অন্ততঃ কিছু উপকার লাভ করিতে পারেন করুণাময় পিতা সে আশীর্ব্বাদ করুন। তাঁহার ইচ্ছাই সর্ব্বোপরি পূর্ণ হউক।

ব্রাহ্মধর্ম্ম

আজ ১১ই মাঘ, ১৮৩০ শালের ২৩শে জানুয়ারি এই দিন মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক ব্রহ্মোপাসনার জন্য মন্দির-প্রতিষ্ঠার দিবস একটী স্মরণীয় দিন। এই ঘটনা ব্রাহ্ম সমাজের ইতিহাসে নব-যুগের সূচনা করিয়াছিল। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, ইহার পূর্ব্বে ১৮২৮ সালের ২০শে আগষ্ট ইহা অপেক্ষাও মহত্তর একটী ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। সেই ঘটনা জোড়াসাঁকোর রামকমল বসুর গৃহে ব্রহ্মোপাসনাপ্রবর্ত্তনপূর্ব্বক ব্রাহ্মসমাজ-প্রতিষ্ঠা। ইহা সমগ্র পৃথিবীর ধর্ম্মের ইতিহাসে একটী যুগান্তর-নির্দ্দেশক ঘটনা।

বর্ত্তমান মাঘোৎসবের সময়ে সেই ঘটনার মর্ম্ম আমাদের বিশেষ ভাবে অনুধাবন করা কর্ত্তব্য। রামমোহনের জীবনের অন্য সর্ব্ববিধ ঘটনা অপেক্ষা এই ঘটনাই তাঁহার একেশ্বর-বাদের প্রতি অত্যধিক অনুরাগের বিশেষ পরিচায়ক, এবং এই ঘটনা তাঁহাকে শুধু একজন মহা সংস্কারক রূপে নয়, বিশ্বজনীন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক রূপে, অমর করিয়া রাখিয়াছে।

রামমোহন অনেক কাল পূর্ব্ব হইতেই বিবিধ প্রয়োজনীয় কার্য্যে ইংলণ্ড গমনের কথা ভাবিতেছিলেন, কিন্তু ব্রহ্মমন্দির-প্রতিষ্ঠার জন্য আগ্রহাতিশয় সহকারে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন বলিয়া সেইটী না হওয়া পর্য্যন্ত ইংলণ্ড গমন স্থগিত রাখিয়াছিলেন।

তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ আছে এবং ইহা বাস্তবিকই সত্য যে, তাঁহার জীবনের ভিত্তি ছিল ধর্ম্ম এবং সর্ব্বোপরি তিনি একজন মহা ধার্ম্মিক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার সমগ্র জীবনব্যাপী কার্য্যাবলীর মূলসূত্রও ইহা হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ধর্ম্মই ছিল তাঁহার সমুদয় সংস্কার এবং বহুবিধ ও বহুধারায় প্রবাহিত কর্ম্মাবলীর কীলকস্বরূপ। ইহা অতীব সত্য যে তাঁহার অন্তর্নিহিত বহুফলপ্রসূ শক্তি যে দূরদূরান্তপ্রসারী শাখাপ্রশাখাসমূহ বিস্তার করিয়াছিল, সেই সমস্তই ছিল এক উদ্দেশ্যমূলক, এবং সেই উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম্ম। স্বদেশে এবং বিদেশে তিনি যে সকল মহৎকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, শুধু তাহাই নহে, তাঁহার জীবনে অনুষ্ঠিত সমুদয় কর্ম্মসমষ্টি একই কারণপ্রসূত ছিল, সেই কারণ আর কিছুই নহে, তাঁহার প্রখর ও প্রগাঢ় ধর্ম্মানুরাগের তাড়না।

তিনি যে সময় জন্মগ্রহণ করেন, সেই সময়ে ভারতের ধর্ম্ম ও সমাজতন্ত্র নানা প্রকার গুরুতর দোষদুষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। অতীত ও ভবিষ্যৎ এই দুই অনন্ত কালধারার সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া তিনি সত্যদর্শী ঋষির ন্যায় তাঁহার অসাধারণ প্রতিভাবলে অতীতকে পর্য্যবেক্ষণ এবং জনন্যসাধারণ সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও প্রজ্ঞাবলে ভবিষ্যৎকে সন্দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবর্ষ বহু দেবদেবীসৃষ্টির একটী উর্ব্বরক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অগণিত দেবতার আবির্ভাবে এবং সেই সকলের পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষ্যাদ্বেষ, হিংসাপিশুন ও বিবাদকলহ প্রভৃতিতে দেশ অতি শোচনীয় দশাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই সমুদয় দেবতার উপাসকগণ নিজ নিজ উপাস্যের উৎকর্ষ ও প্রাধান্য প্রতিপাদন ও প্রতিষ্ঠার জন্য পরস্পরের দেবতাকে গর্হিতভাবে বিদ্রূপ ও কুৎসা করিতেও কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিত না। বহুদেববাদ এবং ভূতপ্রেতাদির পূজা ও তজ্জাতীয় নানা প্রকার অপপূজার প্রচলন দেশময় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। অজ্ঞতা ও কুসংস্কারে দেশ তখন সমাচ্ছন্ন। সমগ্রদেশব্যাপী এবং অনেক স্থলে অতি বীভৎস আকারের মূর্ত্তিপূজা, বহুবিবাহ, শিশুহত্যা, বঙ্গনারী-গণের দুঃখ দুর্গতি ও তাঁহাদের প্রতি অবিরত অত্যাচার এবং সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ সতীদাহ, এমন কি রাজধানী কলিকাতার উপকণ্ঠে প্রায়শঃ সতীর চিতাবহ্নিপ্রজ্বলন, এবং পুরোহিত ও পণ্ডিতদের এই অমানুষিক দুষ্কার্য্যের সমর্থন ও প্রশংসাবাদ প্রভৃতিতে দেশের অবস্থা তখন কিরূপ শোচনীয় ও ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছিল তাহা সহজেই বুঝা যায়।

এই সমুদয় বিভীষিকা ও নিষ্ঠুরতাতে রামমোহনের অন্তর নিরতিশয় ব্যথিত হইল এবং দেশকে এইরূপ অধঃপাত হইতে নির্ম্মুক্ত করিবার জন্য তিনি কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি বুঝিলেন হিন্দুসমাজের সর্ব্ববিধ দুর্গতির মূল কারণ মূর্ত্তিপূজা, এবং ইহার বিনাশসাধনই তাঁহার প্রথম লক্ষ্য হইল। কিন্তু তাঁহার কর্ম্মশীলতা শুধু এই এক বিষয়েই আবদ্ধ ছিল না। তাঁহার ব্যাকুল ও সচকিত মন সমসাময়িক সমাজ ও ধর্ম্মজীবনের

(১১ই মাঘ অপরাহ্ন কালীন ইংরেজী উপাসনায় শ্রীযুক্ত শ্রীশ চন্দ্র রায় প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম।)

সমুদয় ক্ষেত্রে বিচরণ করিত এবং ইহার প্রত্যেক বিভাগে তাঁহার ব্যক্তিত্বের ছাপ তিনি চিরদিনের জন্য মুদ্রিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্ম, রাজনীতি, সাহিত্য ও মানব-প্রীতি এই সমুদয় বিষয়ে তিনি যে অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা বর্ত্তমান ভারতের গঠনকল্পে অতীব সফল প্রয়াস করিয়া গিয়াছেন, জাতিবর্ণ নির্বিশেষে তাঁহার স্বদেশবাসিগণ এখন কৃতজ্ঞতার সহিত তাহা স্বীকার করিতেছে।

যদিও স্বদেশের পুনরুজ্জীবনকার্য্যেই তিনি সাক্ষাৎভাবে ব্যাপৃত ছিলেন, তাঁহার ঋষি দৃষ্টি ইহাকে অতিক্রম করিয়া বহু দূরে প্রসারিত ছিল, সমগ্র জগতের পুনরুজ্জীবন এবং মানব জাতির বিকাশ সেই দৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি আমেরিকা দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন এবং ফরাসী বিপ্লবের প্রগতি ও পর্য্যবসান অবহিতচিত্তে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। মানুষের জীবন ও কর্ম্মক্ষেত্র হইতে ঈশ্বরকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলে কিরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা ও ধ্বংস-লীলার অবতারণা হইতে পারে, এবং পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা, ধর্ম্মাবহ ন্যায়বান ঈশ্বরে অটল বিশ্বাসের অভাবে সাম্য, স্বাধীনতা ও মৈত্রীর মহাভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াও একটী জাতি কেমন করিয়া বিশেষ মহৎকার্য্য সংসাধন করিতে সমর্থ হয় নাই, তিনি ইহাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

এই সমুদয়ের ফলে তিনি পরিষ্কার রূপে বুঝিয়াছিলেন যে মানুষের উচ্ছৃঙ্খল ও উন্মার্গগামী হওয়ার পথ রোধ করিবার জন্য এমন কোন নিয়ামক বিধি বা শক্তির প্রয়োগ একান্ত অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে যাহার অন্তর্নিহিত তাড়না তাহার অধোগতির পথে সম্যক্ বাধাপ্রদানে সক্ষম হয়। তাঁহার লক্ষ্য ছিল উন্নতি, সামঞ্জস্য ও একতানতা; তাঁহার লক্ষ্য ছিল বিকাশ, বিবর্ত্ত ও সর্ব্ব বন্ধনমুক্তি; কিন্তু নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচার ও উৎকট স্বদেশপ্রীতির অবশ্যম্ভাবী ফল যে বিপ্লব, যাহা সমুদয় শৃঙ্খলা ও সুব্যবস্থাকে উলটপালট করিয়া ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত করে, —তিনি তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। ন্যায় ও ধর্ম্মই যে জাতীয় উন্নতির মুখ্য কারণ এবং জাতীয়তা ও অন্তর্জাতীয়তা এই উভয়েরই ধ্রুব ও পূর্ণ চরিতার্থতা যে কেবল ইহাতেই, তিনি এই সত্য সর্ব্বতোভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন এবং অতি বিশ্বস্ততার সহিত আজীবন এই আদর্শের অনুসরণ করিয়াছিলেন।

আমার যতদূর স্মরণ আছে, তাঁহার ইংলণ্ডে অবস্থান কালে কোন এক ব্যক্তি তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁহাতে মূর্ত্তিমান হইয়াছে। আমার কিন্তু ইহা অপেক্ষাও বেশী বলিতে ইচ্ছা হইতেছে যে, শুধু ভারতের অন্তর্নিহিত সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র আশা ও আকাঙ্ক্ষা সকল নয়, পৃথিবীর পুনরুজ্জীবনের জন্য সমগ্র মানবজাতির শ্রেষ্ঠ আদর্শসমূহ তাঁহার মধ্যে বিশেষ ভাবে ও জাজ্বল্যমানরূপে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। আমরা সকলেই অবগত আছি ইতিহাসবিশ্রুত একটি মল-ভূয়িষ্ঠ অশ্বশালাকে আবর্জ্জনাশূন্য করিতে হার্‌কিউলিসের ন্যায় অমিতশক্তি পুরুষের প্রয়োজন হইয়াছিল এবং ইউলিসিসের ন্যায় শক্তিশালী পুরুষ ভিন্ন অন্য কেহই সিসিলি দ্বীপের বেলাভূমিবাসিনী কুহকিনী সমুদ্রাঙ্গনা-গণের সঙ্গীতের মোহকরী শক্তি হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। সেইরূপ যুগযুগান্তের সঞ্চিত অন্যায় ও পাপরাশির সহিত সংগ্রাম ও তাহা দূরীকরণের জন্য, সাক্ষাৎভাবে তাঁহার স্বদেশের ও গৌণ ভাবে সমগ্র পৃথিবীর উন্নয়ন কল্পে পরীক্ষায় ব্যর্থফল কোন বিশেষ মতবাদের বা বিশেষ জাতির ধর্ম্মের উপরে তাঁহার জীবনের সমুদয় শ্রম ও কর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত না করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম রূপ বিশ্বজনীন ধর্ম্মের প্রস্তর-ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠা করার ভার জগদীশ্বর তাঁহার ন্যায় একজন অতিমানুষের উপরেই অর্পণ করিয়াছিলেন। এবং ভারতের পুনরুজ্জীবন ও উন্নয়ন পাছে পণ্ড হইয়া যায়, এই জন্য ইংলণ্ডাভিমুখে প্রস্থান করার পূর্ব্বেই একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া ব্রহ্মপূজা ও ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুশীলনের জন্য তিনি স্বদেশে একটি বিশেষ পুণ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া গেলেন।

এইস্থলে প্রসঙ্গক্রমে সাইমনের প্রতি যীশুর একটী প্রসিদ্ধ উক্তির কথা মনে পড়িতেছে। বাইবেল গ্রন্থে মথিলিখিত সুসমাচারে এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে—যীশু সাইমনকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "এবং আমি তোমাকে বলিতেছি তুমি পিটার (অর্থ-প্রস্তর), এবং আমি এই প্রস্তরের উপরে আমার ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মাণ করিব, আর নরকের দ্বার ইহার বিরুদ্ধে বলবৎ হইতে পারিবে না এবং আমি তোমাকে স্বর্গরাজ্যের চাবি প্রদান করিব", ইত্যাদি। রামমোহনও তাঁহার আদর্শ সংসিদ্ধ করিবার জন্য অখণ্ড ব্রহ্মপ্রেম ও অখণ্ড মানবপ্রেমের উদার ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত স্বীয় ধর্ম্মরূপ অক্ষয় প্রস্তরের উপর অচল-প্রতিষ্ঠ হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

মানবপ্রীতি, বিশ্বমানবের একত্ব, এবং বহুকে নিয়া যিনি এক সেই ঈশ্বরে প্রীতি ও তাঁহার সেবা, ইহাই এই ধর্ম্মের মহান্ আদর্শ, এবং প্রত্যেক মানবজীবন ইহারই উদাত্ত সুরে বাজিয়া উঠা একান্ত আবশ্যক। কেবল মাত্র ইহাতেই মানব মনের সমুদয় বিক্ষেপ ও বিক্ষোভ এবং মানবপ্রকৃতিনিহিত প্রচ্ছন্ন উদ্দাম প্রবৃত্তি সমূহ—যাহা সময় সময় প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া পড়ে—এই সকলের চিরনির্ব্বাণ সম্ভব।

সত্যকে কেহ আবৃত বা অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না, এবং ইহার কণ্ঠরোধ করে এমন কাহারও সাধ্য নাই। সত্য তাহার অভ্রান্ত বাণী কোটী কণ্ঠে ও বজ্রনিনাদে নির্ঘোষিত করে। নিখিল বিশ্বের বায়ুপ্রবাহ এই বজ্রনির্ঘোষকে জগন্ময় বিস্তৃত করিবেই করিবে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

খৃষ্টীয়জগৎ পৃথিবীতে শান্তি ও মানবের প্রতি শুভেচ্ছা তূর্য্যধ্বনিতে ঘোষণা করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রতীচ্য খৃষ্টান জাতি-সমূহ এই ঘোষণার সত্যতা পালন বা প্রমাণ করিতে সমর্থ হন নাই। এই অসমর্থতা বা স্খলনকে বাক্‌চাতুর্য্যের দ্বারা ঢাকিবার কিম্বা অন্যরূপে ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াসে বিরাম নাই। এখনো সেই ঘোষণা চলিয়াছে এবং তাঁহারা যে খাঁটি খৃষ্টানরূপে ইহার সত্যতা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন সেই কথাও পুনঃ পুনঃ ঘোষিত হইতেছে। অথচ তাঁহাদের দ্বারা নরশোণিতপাত

প্রভৃতি কত লোমহর্ষণ ব্যাপারের ভীষণ দৃশ্যই না অভিনীত হইতেছে এবং তাঁহারা সেই সকল দৃশ্য অবিচলিত ভাবে দর্শন করিতেছেন, এমন কি দর্শন করিয়া তৃপ্তি ও আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। আর, ধর্ম্মের নামে ভারতবর্ষেও কি না অনুষ্ঠিত হইয়াছে? এখানে অস্পৃশ্যতা আছে, অশ্রাব্যতা আছে, অদৃশ্যতা আছে, এবং কোন কোন শ্রেণীর মানুষকে স্মরণ করা পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইহা অপেক্ষাও অমানুষিক এবং ভীষণ ও ভীষণতর আরো কত কি না আছে! ব্রাহ্মধর্ম্ম এই সমুদয়ের চিরবিরতি ও বিলয় ঘোষণা করিতেছেন।

প্রাচ্যেই আলোকের জন্ম। এক সময়ে এইরূপ মনে হইয়াছিল আলোক বুঝি দিক্‌পরিবর্ত্তন করিয়া প্রতীচ্য হইতে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু এখন এমন সময় উপস্থিত, যখন ব্রাহ্মধর্ম্মের জ্যোতিঃ প্রভাবে সত্যের প্রখরতর ও উজ্জ্বলতর আলোক জগতের অজ্ঞানতা, অপ্রেম ও অন্যায়-অবিচারের ঘন অন্ধকার দূরীভূত করিবার জন্য তাহার দীপ্তরশ্মি বিকীর্ণ করিতে করিতে পুনরায় এই প্রাচ্য হইতেই শুভ যাত্রায় নিষ্ক্রমণ করিয়াছে। পৃথিবী যুগযুগান্ত ধরিয়া ধর্ম্মের অত্যাচার অনাচারের গুরুভারে আর্ত্তনাদ করিতেছে এবং সকাতরে ইহা হইতে নির্মুক্তি ভিক্ষা করিতেছে। পরম কারুণিক পরমেশ্বর গোপনে আর্ত্তজগতের সেই কাতর ক্রন্দন শ্রবণ করিয়াছেন এবং তাহার অশ্রুজল মুছাইবার জন্য তিনি প্রকাশ্যে এই জগন্মঙ্গল ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার আশীর্ব্বাদে ইহার মুক্তিপ্রদ বাণী গৃহে গৃহে সঞ্চরণ করিয়া সকল নরনারীর প্রাণে আশ্বস্তি প্রদান করুক। তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা জগতের সর্ব্বত্র জয়যুক্ত হউক।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ

ব্রাহ্মসমাজ

পারলৌকিক—বিগত ১৫ই মার্চ্চ গিরিধি নগরীতে পরলোকগত মহেশচন্দ্র ভৌমিকের আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য, শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত শাস্ত্রপাঠ ও জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান সুধীন্দ্রকুমার ভৌমিক জীবনী পাঠ করেন। এই উপলক্ষে পুত্র কন্যাগণ গিরিধি ব্রাহ্মসমাজে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অনিলকুমার বসুও এই উপলক্ষে উক্ত সমাজে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন। শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাকে চির শান্তিতে রাখুন।

দান—শ্রীমতী সুরবালা দত্ত পুত্র রথীন্দ্রনাথের প্রথম বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে দরিদ্র ব্রাহ্ম ছাত্রদের জন্য ৩৲ ও সাধনাশ্রমে ২৲ দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দত্ত পত্নীর বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে দাতব্যবিভাগে ১৲ দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় মাতার প্রথম বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে সাধারণ বিভাগে ১০৲, ও ভবানীপুর ব্রাহ্মসম্মিলন সমাজে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন। এই সমস্ত দান সার্থক হউক এবং পরলোকগত আত্মাসকল চিরশান্তি লাভ করুন।

NOTICE.

The First Quarterly Meeting of the General Committee of the Sadharan Brahmo Samaj will be held on Saturday the 29th April 1933 at 7 P.M. in the Prayer Hall of the Samaj.

Members are earnestly requested to be present.

AGENDA :—

1. The first quarterly report of the Executive Committee.
2. Election of a member of the Executive Committee in place of Babu Sisirkumar Dutta, appointed Treasurer of the Sadharan Brahmo Samaj.
3. Miscellaneous.

S. B. Samaj Office
211, Cornwallis street
Calcutta.
The 2nd April 1933.

Annadacharan Sen
Secretary.
S. B. Samaj.

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাগ কর্ত্তৃক ২১শে চৈত্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত।—সম্পাদক শ্রীবরদাকান্ত বসু, বি-এ